মাসুদুল হক

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সিআইএ

RAW & CIA

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY
UNITED STATES OF AMERICA

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে
'র' এবং সিআইএ

www.pathagar.com

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সিআইএ

মাসুদুল হক

প্রচিন্তা প্রকাশনী

www.pathagar.com

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সিআইএ
মাসুদুল হক

প্রকাশক : ফিরোজ আহসান, প্রচিন্তা প্রকাশনী, রূপনগর আ/এ, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬। প্রচ্ছদ : সুখেন দাস। বর্ণবিন্যাস : আবির কম্পিউটার। মুদ্রণ : মহব্বত প্রিন্টিং প্রেস, কাঁটাবন, ঢাকা। গ্রন্থস্বত্ব : লেখক। প্রকাশকাল : প্রথম প্রকাশ ১৯৯০। চতুর্থ সংস্করণ ও প্রচিন্তা প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১০।

একমাত্র পরিবেশক
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ

মূল্য : ২৫০.০০ টাকা মাত্র।

RAW AND CIA : LIBRATION WAR OF BANGLADESH by : Masudul Huq. Published by : Firoz Ahashan, Prachinta Prakashani, Rupnagar H/A, Mirpur, Dhaka-1216. Cover desing : Sukhen Das. Copyritght : Author. Date of Published : Fourth Edition February 2010

Price : Tk. 250.00, US $ 7.00

ISBN : 984-70000-012

www.pathagar.com

আমার মরহুম মা
বেগম সফুরননেছা
যাঁর দু'টি চোখ,–স্বাধীনতা যুদ্ধের
সেই ভয়াল ন'মাস আমাকে
সর্বদা
প্রহরা দিয়ে ফিরতো
তাঁর স্মরণে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পঞ্চম সংস্করণ নিয়ে

'র' অওর সিআইএ : মাশরেকি পাকিস্তান ছে বাংলাদেশ তক-এই নামেই কেবল পাকিস্তানে অনূদিত হয়নি, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সিআইএ ওয়েবসাইটে এসেছে এই বইয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে অনেকগুলো নিবন্ধ। স্ক্যানিশ ভাষায় লেখা একটি নিবন্ধে এসেছে এ বইয়ের উদ্ধৃতি। উদ্ধৃতিটা এসেছে প্রয়াত স্পিকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী বর্ণিত প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার ও ভারতের মধ্যে গোপন সাত দফা চুক্তিটি নিয়ে। বাংলাদেশের জন্মের ইতিহাসে অপরিসীম গুরুত্ববহ এই চুক্তি সংক্রান্ত প্রয়াত হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর নিজ হাতের স্বাক্ষরসহ লেখককে দেয়া তার সাক্ষাৎকারটি এই মুদ্রণে সংযোজিত হলো।

১ ফেব্রুয়ারি ২০১১ মাসুদুল হক

www.pathagar.com

প্রথম সংস্করণ নিয়ে

বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই গ্রন্থ ইতিহাস নয়—ইতিহাসের উপাদান মাত্র। তাই রচনাকালে আমি যথাসম্ভব নির্মোহ থাকার চেষ্টা করেছি এবং ঘটনা ও তথ্যের উপস্থাপন করেছি একজন নিরপেক্ষ সাংবাদিকের দৃষ্টিকোণ থেকে। কেননা, আমি বিশ্বাস করি, কোন ব্যক্তিত্ব একজন সাংবাদিককে প্রভাবিত করতে পারে না। তাকে প্রভাবিত করে ঘটনা এবং তথ্য, যেমন প্রভাবিত করে একজন ইতিহাসবেত্তাকে অথবা ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহে প্রয়াসী ব্যক্তিকে।

এই গ্রন্থ রচনায় আমাকে সাহায্য সহযোগিতা নিতে হয়েছে অনেকের। তবে যাঁর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়, তিনি মার্কসবাদী রাজনীতিক-অর্থনীতিবিদ আমার শিক্ষাগুরু ডা. সইফ-উদ-দাহার। বইয়ের প্রতি ছত্রে রয়েছে তাঁর উপদেশ। উৎসাহ যুগিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন দৈনিক *ইত্তেফাক*-এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক আখতার-উল-আলম, বার্তা সম্পাদক গোলাম সারওয়ার, আমার বন্ধু অধ্যাপক কাজী ফারুক আহমদ, আমার সহকর্মী বন্ধু সাপ্তাহিক *পূর্বাণী*র প্রধান প্রতিবেদক রফিকুজ্জামান। নিবিড় সহযোগিতার জন্য ঋণী অধ্যাপিকা বেগম নূরুন নাহার ও দৈনিক ইত্তেফাক-এর কূটনৈতিক প্রতিবেদক মতিউর রহমান চৌধুরীর কাছে।

আমাকে স্মরণ করতে হয় বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগের (বাকশাল) সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ-ইনু) সাধারণ সম্পাদক হাসানুল হক ইনু এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শরীফ নূরুল আম্বিয়ার কথা। স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ ও মুজিব বাহিনীর ওপর তথ্য প্রদানে তারা যে সহযোগিতা দিয়েছেন, তা এই গ্রন্থের সমৃদ্ধি ঘটিয়েছে। স্মরণ করতে হয় এই গ্রন্থের প্রথম প্রকাশে চিত্রতারকা মাহমুদ কলির আগ্রহের কথা।

মাসুদুল হক
১ মে, ১৯৯০

চতুর্থ সংস্করণ প্রসঙ্গে

পাঠকের কাছে বিপুলভাবে সমাদৃত হওয়ায় *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সিআইএ'র* চতুর্থ সংস্করণ বের করা হলো। এ সংস্করণে ১৯৭৪ সালের অক্টোবর মাসে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদকে মন্ত্রীপদ থেকে ইস্তফা দেয়ার আহ্বান সংবলিত তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা চিঠি এবং তার জবাবে তাজউদ্দিন আহমদের ইস্তফা পত্রটি সংযোজিত হয়েছে। এছাড়া মন্ত্রিসভা থেকে সরে আসার পর তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারের বাংলাদেশ সফর নিয়ে দুই ভারতীয় সাংবাদিককে তিনি যা বলেন সে সব কথা এবং ঢাকায় *ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউর* সাংবাদিক ল্যারী লিপৎসুলজ এবং ফ্রি ল্যান্স রিলিফকর্মী পিটার কাসটার্স সম্পর্কে নতুন কয়েকটি তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। আমার বিশ্বাস এই যোগ এই বইয়ের সমৃদ্ধি ঘটিয়েছে।

এ বই বিদেশে—পাকিস্তানেও সাড়া জাগিয়েছে। সেখানে *'র' আউর সিআইএ : মাশরেকি পাকিস্তান ছে বাংলাদেশ* তক নামে উর্দুতে অনূদিত হয়েছে। প্রকাশ করেছে লাহোরের গৌতম পাবলিশার্স।

মাসুদুল হক

www.pathagar.com

সূচি

অবতারণা : ১১
চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধ, সিআইএ এবং ভারতীয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা : ১৩
সিআইএ'র সামরিক চাপ : ২১
সিআইএ'র রাজনৈতিক চাপ : ২৮
ছাত্র সমাজে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ : ৩৪
১৯৬৮-'৬৯ সালের গণআন্দোলন ও স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ : ৩৯
১৯৭০ সালের নির্বাচন, শেখ মুজিব এবং সামরিক জান্তার ষড়যন্ত্র : ৫০
২৫ মার্চ হামলার পর 'র' এবং সিআইএ : ৭৫
'র' এবং মুজিব বাহিনী : ৮২
সিআইএ-ও তৎপরতা : ৯০
জেনারেল উবানের ভাষ্যে মুজিব বাহিনী : ৯২
মুজিব বাহিনীর যুদ্ধ : ১০৫
শেখ মুজিবের রাজনৈতিক অস্থিরতা : 'র'–সিআইএ মুখোমুখি : ১১১
রক্ষী বাহিনী ও গণবাহিনীর যুদ্ধ : ১৩৪
উপসংহার : ১৩৮
পরিশিষ্ট : ১৩৯
মুজিব বাহিনীর সনদপত্র : ১৭১
গ্রন্থপঞ্জি : ১৭৫

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অবতারণা

মানিব জাতির ইতিহাসে যতো গণহত্যার ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়কার হত্যাযজ্ঞ ভয়াবহতার দিক দিয়ে নিঃসন্দেহে জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড। স্বল্পতম সময়ে বাংলাদেশে বাংলাদেশের মতো এতো ব্যাপক নরহত্যাযজ্ঞ বিশ্বেও আর কোন দেশে সংঘটিত হয় নি। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত দৈনিক গড়ে ৬ থেকে ১২ হাজার লোক প্রাণ হারিয়েছেন। হত্যা করেছে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী এবং তার এদেশীয় দালালরা—রাজাকার, আলবদর, আলশামস, জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ এবং শান্তি কমিটির ঘাতকরা। মানব জাতির ইতিহাসে গণহত্যাযজ্ঞের খতিয়ানে দৈনিক গড় নিহতের সংখ্যায় এটাই সর্বোচ্চ। এ রিপোর্ট জাতিসংঘের। ১৯৮১ সালের ডিসেম্বর মাসে সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার তেত্রিশতম বার্ষিকীতে জাতিসংঘ এই রিপোর্ট প্রকাশ করে। তাতে নিহতদের সংখ্যা সর্বনিম্ন অন্তত পনের লক্ষ বলে উল্লেখ করা হয়।

নতুন প্রজন্মের নাগরিক যারা, বয়স যাদের আঠারো, বিশ কিংবা বাইশ; সেই ন'মাসের ভয়ঙ্কর বিভীষিকার ভয়াবহতা কোনক্রমেই তাদের উপলব্ধিতে আসতে পারে না। মৃত্যু এবং মৃত্যু, লাশ এবং লাশ হয়ে যাওয়া, এই ছিল সেসব দিনের রোজনামচা। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম ভাষার সকল শব্দ উজাড় করে দিলেও নব প্রজন্মের বোধের তন্ত্রীতে সেই দুঃস্বপ্নময় অসাড় করা দিন-রাত্রির চিত্র তুল ধরা যাবে না। ছয়শ' বছর পর এই বাংলার সবুজ মাটিতে কবর থেকে ওঠে আসে যেন তৈমুরের প্রেতাত্মারা। নির্বিচারে হত্যা করে নারী-পুরুষ-শিশু-যুবা-বৃদ্ধা। জান্তব হিংস্রতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঙালি নারীর ওপর। জ্বালিয়ে দেয় কৃষকের পর্ণ কুটির। লুণ্ঠন করে গরিব কৃষক-শ্রমিক মেহনতি মানুষের সঞ্চিত সম্পদ। 'কাফের' আখ্যায়িত করে মসজিদ থেকে টেনে এনে হত্যা করে ইমামকে, হত্যা করে মুসল্লিকে। যেমন করে দিল্লীর জামে মসজিদে ঢুকে তৈমুর হত্যা করেছিলেন মুসল্লিদের; প্রাণভয়ে ভীত দিল্লীর নিরীহ মানুষদের। আর সেই নারকীয় হত্যালীলার যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য তৈমুর যেমন বলেছিলেন— যা ঘটেছে তা আল্লাহর নির্দেশেই, আমার কোন হাত নেই। ঠিক একই সুর ধ্বনিত হয় ছয়শ' বছর পর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর স্যাঙ্গাত মুসলিম লীগ, জামায়াত ইসলামীর ঘাতকদের কণ্ঠে, "কোন দেশ তার নিজের দেশের লোকদের দ্বারা শাসিত হলেই আজাদ হবে, সাধারণ আজাদীর এই সংজ্ঞা ইসলাম স্বীকার করে না। বাংলাদেশ বাঙালিদের দ্বারা শাসিত হবে এ মতবাদ শেখ মুজিব বা শ্রী তাজউদ্দীনের। কিন্তু

www.pathagar.com

মুসলমান আল্লাহর হুকুম পালন করার সুযোগ লাভকেই সত্যিকারের আজাদী মনে করে। এ ভিত্তিতে শাসক নিজের দেশের হোক বা বিদেশী হোক, তা লক্ষণীয় নয়।"[১] এই তৈমুরীয় মুসলমানরা তাদের আল্লাহর হুকুম পালনে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নির্বিচার হত্যা, লুণ্ঠন ও নারী ধর্ষণে সহায়তা করে। তৈমুরীয় ভাষায় লুণ্ঠনের মাল জায়েজ করে 'মাল-এ-গণিমত (যুদ্ধলব্ধ মাল)' ফতোয়া দিয়ে।[২]

১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তার দোসরদের এই বর্বরতা এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। ১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধের পর উপমহাদেশের রাজনীতিতে যে পরিবর্তন সূচিত হয়, তারই পরিণতি এটা। যুদ্ধের পর পরাশক্তি রাজনীতি অর্থাৎ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতি এবং ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী তৎপরতা নতুন প্রেক্ষাপট জন্ম দেয়। এই প্রেক্ষাপট হচ্ছে ১৯৬২ সাল থেকে উপমহাদেশের রাজনীতিতে সিআইএ (মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা) এবং ভারতীয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার (পরে ১৯৬৮ সাল থেকে রিসার্চ এ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং- সংক্ষেপে 'র') কার্যকলাপের ইতিহাস। সে ইতিহাস পর্দার আড়ালের ইতিহাস। অর্থাৎ ১৯৬২ সালের চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধের পর থেকে শুরু করে ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ এবং ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে এই দুই গোয়েন্দা সংস্থা যে ষড়যন্ত্র করে, তারই ইতিহাস। এবং আজ পর্যন্ত যেটা পর্দার আড়ালেই রয়ে গেছে। বাংলাদেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বর্বরতা এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সঠিক ইতিহাস অনুসন্ধানে একজন ইতিহাসের ছাত্রকে তাই এদের ষড়যন্ত্রকে জানতে হয়। জানতে তাকে আসতে হয় ১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধে, ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে সিআইএ এবং ভারতীয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা তথা 'র'-এর ষড়যন্ত্রের কাহিনীতে— যা রচিত হয় পর্দার আড়ালে। আমরা সেই কাজটিই করার চেষ্টা করবো।

---

১. ১৯৭১ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের ২৫তম আজাদী দিবস উপলক্ষে জমিয়তে তালবায়ে আরাবিয়া আয়োজিত ইসলামিক একাডেমিতে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় জামায়েতে ইসলামী পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক কমিটির আমীর গোলাম আজমের ভাষণ। (দৈনিক *সংগ্রাম* : ১৬ আগস্ট ১৯৭১)

২. শর্ষিণার পীর আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহর দালালি সম্পর্কে দৈনিক *পূর্বদেশ*-এ প্রকাশিত একটি চিঠি "এই ভণ্ডপীর হিন্দুদের মাল-সম্পত্তি এমনকি হিন্দু মেয়েদেরও (মাল-এ-গণিমত) যুদ্ধলব্ধ মাল হিসেবে ফতোয়া দেয়।" একাত্তরের ঘাতক দালালরা কে কোথায় পৃঃ ৯৩-৯৪

www.pathagar.com

চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধ : সিআইএ এবং ভারতীয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা

১৯৬২ সালের চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধ উপমহাদেশীয় রাজনৈতিক দৃশ্যপটে এক গুণগত পরিবর্তন সূচিত করে। সেটা হচ্ছে এই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইউব খানকে উৎখাতের সিদ্ধান্ত নেয় মার্কিন প্রশাসন। পরিকল্পনা রচনার দায়িত্ব পড়ে সিআইএ-র ওপর। আর ভারত পরিকল্পনা নেয় পাস্তিানের অঙ্গহানি ঘটাবার— পূর্ব পাকিস্তানকে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত করার। পরিকল্পনা তৈরির দায়িত্ব অর্পিত হয় ভারতীয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার ওপর। আমরা প্রথমে মার্কিন প্রশাসন তথা সিআইএ-'র আইউব উৎখাত পরিকল্পনায় আসতে পারি। তবে সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আইউবের সঙ্গে মার্কিন প্রশাসনের বিরোধ বিষয়ক আলোচনায় আসতে হয় আগে।

আইউব খান পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা দখল করেন ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে। অথচ দেখা গেল, এক সময় মার্কিন প্রশাসন তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আইউব খান বঞ্চিত হয়ে গেছেন মার্কিনী বন্ধুতা থেকে। কেন এ রকমটি ঘটে? চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধই আনে এই পরিবর্তন। অপরদিকে, যে ভারতকে একদা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম অগ্রদূত মনে করা হতো ওই যুদ্ধ দৃশ্যত সেই ভারতকে সাম্রাজ্যবাদের নেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষপুটে অধিকমাত্রায় ঠেলে দেয়। ভারতের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে আসে গুণগত পরিবর্তন। চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধের পর ভারতের ক্ষেত্রে মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গিতে কতটা পরিবর্তন সূচিত হয়, তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্টের ভ্রাম্যমান রাষ্ট্রদূত এভারেল হ্যারিম্যানের ভাষ্য থেকে। ১৯৬৩ সালের গোড়ার দিকে প্রেসিডেন্ট জন এফ, কেনেডি তার ভ্রাম্যমান রাষ্ট্রদূত এভারেল হ্যারিম্যানকে পাঠান ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহেরুর সমাজতন্ত্র সম্পর্কে ধারণা নিতে। দিল্লীতে কয়েকদিন কাটানোর পর ওয়াশিংটন ফেরার পথে পালাম বিমান বন্দরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, কমিউনিজমের বিস্তার রোধে পণ্ডিত নেহেরুর সমাজতন্ত্র কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সমর্থন দিয়ে যাবে।

চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে বিতর্কিত ম্যাকমোহন লাইন নিয়ে। ১৯৬২ সালের ১৩ অক্টোবর চীন ভারতকে কাশ্মীর এলাকার লাদাখ সীমান্ত থেকে তার

www.pathagar.com

সৈন্য সরিয়ে নিতে বলে। ভারত চীনের এই দাবি অগ্রাহ্য করায় এক সপ্তাহ পর ২০ অক্টোবর দু' দেশের সশস্ত্র বাহিনী সর্বাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ২০ নভেম্বরের মধ্যে কাশ্মীরের লাদাখ এলাকার দু'হাজার বর্গমাইল এবং তিব্বত সীমান্তের নেফা (উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এলাকা) এলাকার দেড় হাজার বর্গমাইল ভারতীয় ভূখণ্ড চীনের দখলে চলে আসে এবং ২১ নভেম্বর চীন একক যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে দখলীকৃত সমগ্র এলাকা থেকে সৈন্য অপসারণ করে ম্যাকমোহন লাইনের ওপারে চলে যায়।

যুদ্ধ চলাকালীন ২৮ অক্টোবর মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ. কেনেডি এক চিঠিতে কমিউনিস্ট চীনকে রুখতে ভারতের সহায়তায় এগিয়ে আসতে অনুরোধ জানান আইউব খানকে। চিঠিতে প্রেসিডেন্ট কেনেডি কাশ্মীর সমস্যাকে আঞ্চলিক সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, সমস্যার গুরুত্ব তিনি অনুধাবন করেন এবং বিষয়টিকে মোটেই হালকাভাবে নিচ্ছেন না। তবে এই মুহূর্তে চৈনিক আগ্রাসনকে রুখে দাঁড়ানোই মুখ্য বিষয়। তিনি বলেন, আগ্রাসন রোধে বাইরে থেকে ভারতের জন্য সাহায্য প্রেরণ করা যেতে পারে। কিন্তু আঞ্চলিক সহায়তা তার চেয়ে হবে অধিকতর কার্যকর।

প্রেসিডেন্ট কেনেডি এই চিঠিতে চীনের বিরুদ্ধে প্রকারান্তরে পাকিস্তানকে ভারতের সঙ্গে এক শান্তি চুক্তিতে আসতে বলেন যা সামরিক চুক্তিরই নামান্তর। আইউব খান সে প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। ফলে মার্কিন প্রশাসন তার ওপর ক্ষুব্ধ হয়।

এ ঘটনার তিন বছর আগেই আইউব খান মার্কিন সরকারের বিরাগভাজন হয়ে পড়েন চীনের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার কারণে। তার সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ নেন আইউব ১৯৫৯ সালে। চীন-পাকিস্তান সীমান্ত চিহ্নিতকরণের মধ্য দিয়ে এ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এর বদলে পাকিস্তান জাতিসংঘের চীনের সদস্য পদ লাভের বিষয়টি সমর্থন করে। জাতিসংঘের দরোজা তখন চীনের জন্য ছিল রুদ্ধ এবং তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশ-নীতির অন্যতম দিক ছিল কমিউনিস্ট চীনকে জাতিসংঘে ঢুকতে না দেয়া। চীনের পক্ষে এই ভূমিকায় আইউবের প্রতি বিশেষভাবে নাখোশ হয় মার্কিন প্রশাসন। কেননা, মার্কিনীদের শত্রু তালিকায় মাও সেতুং-এর চীন ছিল শীর্ষে এবং পাকিস্তান-চীন সীমান্ত চিহ্নিতকরণের পর থেকেই চীন দিনে দিনে হয়ে যায় পাকিস্তানের পয়লা নম্বরের বন্ধু। ওই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সকল কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল কমিউনিজমকে রোখা; দুই বৃহৎ কমিউনিস্ট রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের প্রভাব বলয়কে সংকুচিত করে তাদেরকে এক ঘরে করে রাখা। সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক থাকলেও চীনের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন সম্পর্কই ছিল না। ১৯৪৯ সালে মাও সেতুংয়ের নেতৃত্বে কামিউনিস্ট বিপ্লবের পর থেকে ১৯৭১ সালে প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিকসনের নিরাপত্তা বিষয়ক সহকারী পরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারের সফরের আগ পর্যন্ত চীন নামক দেশটি ছিল মার্কিন প্রশাসনের কাছে একটি 'নিষিদ্ধ দেশ'। অতএব, এহেন চীনের সঙ্গে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় পাকিস্তানি প্রয়াসকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বভাবতই সুনজরে দেখতে পারে না। আর এই নিষিদ্ধ দেশটির সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে যে ব্যক্তিটি বিশেষ তৎপরতা দেখাবেন, তিনিও একই কারণে মার্কিন

www.pathagar.com

প্রশাসনের কালো তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবেন। চীনের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে বিশেষ তৎপরতা গ্রহণে আইউবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো মার্কিন প্রশাসনের কাছে বিরক্তিভাজন ব্যক্তিতে পরিণত হন। তাকে সরিয়ে দেয়ার চাপ প্রয়োগ করে তৎকালীন মার্কিন সরকার। কিন্তু আইউব খান মার্কিনী চাপ প্রতিহত করে জুলফিকার আলী ভুট্টোকে স্বপদে বহাল রাখেন। এ বিষয়টিও তার সম্পর্কে মার্কিন প্রশাসনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়।

আর যে সোভিয়েট ইউনিয়ন ছিল মার্কিনীদের সুবাদে পাকিস্তানের 'দুশমন' তার প্রতিও আইউব খান বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করেন পাকিস্তানে সিআইএ-'র গোপন সামরিক ঘাঁটি তুলে দিয়ে। ষাট দশকের গোড়াতে পাকিস্তান ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্ক ছিল পারস্পরিক অবিশ্বাস ও তিক্ততা পর্যায়ের। এ সময় পেশোয়ারের বাটাভের এলাকায় ছিল সিআইএ-'র গোপন সামরিক ঘাঁটি। এ ঘাঁটি থেকে সিআইএ ইউ-২ গোয়েন্দা বিমান পাঠায় সোভিয়েতের অভ্যন্তরে। সোভিয়েত মিসাইল পাইলট গ্যারী পাওয়ারসহ ইউ-২ অপারেশন বিমান নামিয়ে আনে ভূমিতে এবং তৎকালীন রুশ প্রধানমন্ত্রী নিকিতা ক্রুশ্চভ পাকিস্তানকে এই বলে হুঁশিয়ার করে দেন যে পেশোয়ারের বাটাভের রুশ মিসাইলের নাগালের মধ্যেই আছে। অতএব, আইউবকে মার্কিনীদের নাখোশ করেই বাটাভেরের সিআইএ-'র গোপন অপারেশন ঘাঁটি দিতে হয় বন্ধ করে। এ ঘটনার পরই আইউবকে সরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় মার্কিন প্রশাসন। আইউবের বিদেশ-নীতিতে সোভিয়েট ইউনিয়নের ব্যাপারে সূচিত হয় পরিবর্তনের ধারা।

এখানে প্রাসঙ্গিক কারণেই প্রশ্ন এসে যায় যে, মার্কিনীদের সহায়তায় ১৯৫৮ সালে আইউব আসেন পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায়, সেই আইউব মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে অর্থাৎ ১৯৬১ সালের শুরু থেকেই তার মদদদানকারী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন কেন?

পঞ্চাশ দশকের শেষপাদ থেকে পাকিস্তানের উদীয়মান ধনিক শ্রেণীর ভিত গড়ে উঠতে থাকে। কিন্তু তার বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া পুঁজি। পাকিস্তান তার উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোকে তাদের বাজার উন্মুক্ত করে দেয়ার দাবি জানায়। উপরন্তু দ্রুত শিল্পায়নের জন্য অপরিহার্য যে ভারি শিল্প, তা গড়ে তোলার পদক্ষেপে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ওই সাম্রাজ্যবাদী লগ্নি পুঁজি। আইউব খান যেহেতু পাকিস্তানের উদীয়মান ধনিক শ্রেণীর প্রতিনিধি, নিজ শ্রেণী স্বার্থেই সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংঘাত তার অনিবার্য হয়ে ওঠে। আইউব খানের ভাষায়, "যদি উন্নত দেশগুলো আমাদের সঙ্গে বাণিজ্য করতে না চায়, আমরা কি করবো? আমাদের বৈদেশিক পণ্যের চাহিদা মেটানো দূরে থাক, তাদের দেয়া ঋণ পরিশোধ করবো কিভাবে? প্রদত্ত ঋণের সুদই বা মেটাবো কি করে? এই পরস্পর বিরোধী স্বার্থ নিয়ে বিশ্বব্যাপী একটা বড় রকমের সংঘাত একদিন লেগেই যাবে। আমি মনে করি, পরিণামে ধনবাদী দেশগুলো একদিন দেখবে যে তারা একঘরে হয়ে গেছে। যদি তারা আমাদের জন্য তাদের বাজার উন্মুক্ত করে না দেয়, তাদের শিল্পের কাঠামোগত দিকের তেমন পরিবর্তন না আনে, যাতে ছোট ছোট দেশগুলোর

www.pathagar.com

জন্য পণ্য উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং তারা আংশিক প্রক্রিয়াজাত কম উন্নতমানের জিনিস তৈরি করতে পারে। ...দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমেরিকানরা সবাই আশা করে এবং অনুমতি দিয়েছে যে পাকিস্তান তাদের দেশে বছরে ২৫ মিলিয়ন গজ কাপড় রফতানি করতে পারবে। এটা পরিমাণের দিক দিয়ে অতি নগণ্য এবং হাস্যকর পরিমাণও বটে। কাপড় পাকিস্তানের একটি অন্যতম প্রধান রফতানিযোগ্য পণ্য। অন্যান্য পণ্যের বেলায় একই নীতিমালা প্রয়োগ করা হয়েছে। ... কয়েক বছর আগেও ব্রিটেনের সঙ্গে আমাদের কোন লেনদেন সমস্যা ছিল না। অথচ পাস্তিান থেকে সুতা ও সুতী কাপড় আমদানির ওপর কোটা আরোপ করে। ১৯৬২ সালে বিষয়টি ব্রিটেনের কমনওয়েলথ সচিব মি. ডানকান স্যান্ডসের কাছে উত্থাপন করি। তিনি জানান, ম্যানচেস্টারের বস্ত্রশিল্প দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং সরকারকে ম্যানচেস্টারবাসীদের ভোটের কথা ভাবতে হয়েছে। বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলানকে জানালে তিনি বলেন, 'এই ভোটের ব্যবসার ধরনই আলাদ। আমরা তাদেরকে (ভোটার) উপেক্ষা করতে পারি না।' ... তাহলে কেন আমরা শুধু ইউরোপ এবং আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যিক গিটে বাঁধা থাকব? যাদের সঙ্গে সম্ভব, তাদের সাথেই বাণিজ্যিক বন্ধনে আবদ্ধ হবো এবং এমন ব্যবস্থা আমরা অবলম্বন করবো যাতে আমাদের উৎপাদিত পণ্য নিয়ে তাদের সঙ্গে বাণিজ্য করতে পারি। ... এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ কারণে আমি আফ্রো-এশীয় দেশগুলোর দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রতি দৃঢ় সমর্থন জানিয়েছি।"[১]

আফ্রো-এশীয় দেশসমূহের দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। আইউব খান সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রতি দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করলেও ওই মাসে সম্মেলন আর হতে পারে নি।। সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলেও তার পক্ষে তাতে যোগদান করাও ছিল দুঃস্বপ্নের সামিল। কেননা, সম্মেলনের আগেই সেপ্টেম্বর মাসের ৬ তারিখে সিআইএ-'র আঘাত আসে তার ওপর। সিআইএ-'র সে আঘাত মোকাবেলায় তিনি তখন ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে।

অনুষ্ঠেয় আফ্রো-এশীয় দ্বিতীয় সম্মেলনের ব্যাপারে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইউব যে ভূমিকা নেন, তাতে তার ওপর মার্কিন প্রশাসনের আগ্রহ থাকার কারণ আর বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। এই সম্মেলনে মালয়েশিয়ার অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতায় দাঁড়িয়ে যান আইউব খান। আর তার অন্তর্ভুক্তির পক্ষে নামেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু।

১৯৬৩ সালে তৎকালীন মালয় প্রধানমন্ত্রী টুংকু আবদুর রহমানের মালয়েশিয়া ফেডারেশন গঠনে সারা ইন্দোনেশিয়া প্রচণ্ড রোষে ফেটে পড়ে। ওই বছর আগস্ট মাসে মালয় এবং ব্রিটিশ সরকার সারাওয়াক ও উত্তর বোর্নিওর (সাবাহ) মালয় অংশ এবং ব্রিটিশ আশ্রিত অঞ্চল নিয়ে মালয়েশিয়া ফেডারেশন গঠনের পরিকল্পনা ঘোষণা করে।

---

১. মোহাম্মদ আইউব খান: ফ্রেন্ডস নট মাস্টারস্ পৃষ্ঠা–১৮৪–১৮৫

www.pathagar.com

ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়া এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করে এই অভিযোগে যে, সেখানকার জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই ফেডারেশন গঠন করা হবে। ফলে ফেডারেশন গঠন পরিকল্পনা স্থগিত রাখা হয় এবং পরে জাতিসংঘ মহাসচিব প্রেরিত একটি মিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে মালয়েশিয়া ফেডারেশনের জন্ম হয় ওই বছর সেপ্টেম্বর মাসে। ইন্দোনেশীয় প্রেসিডেন্ট সুকার্নো মালয়েশিয়া গঠনকে ওই এলাকার জনগণের বিরুদ্ধে একটি সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত বলে ঘোষণা করেন এবং ১৯৬৪ সালে মালয়েশিয়ার ভূখণ্ডে নেমে যায় ইন্দোনেশীয় সৈন্য। সুকার্নোর পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর সুবান্দ্রিও একুশ লাখ সদস্য সংগ্রহ করেন 'ক্রাশ মালয়েশিয়া—মালয়েশিয়াকে খতম কর' কার্যক্রমে। অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনে নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য পদে মালয়েশিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করলে প্রেসিডেন্ট সুকার্নো জাতিসংঘ থেকে বেরিয়ে আসেন। ঘোষণা দেন, জাতিসংঘ সাম্রাজ্যবাদীদের দাবার ঘুঁটি। তিনি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর জাতিসংঘ গড়ে তোলার আহবান জানান এবং দ্বিতীয় আফ্রো-এশীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি কার্যক্রম হাতে নেন।

১৯৬৫ সালের জুলাই মাসে দ্বিতীয় আফ্রো-এশীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং আলজিরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সকে সম্মেলন স্থান করা হয়। কিন্তু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার কয়েকমাস আগে এক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে প্রেসিডেন্ট বেন বেল্লাকে অপসারণ করে ক্ষমতায় আসেন হুয়ারি বুমেদিন। ফলে দ্বিতীয় আফ্রো-এশীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের বিষয়টি দোদুল্যমানতার মধ্যে নিপতিত হয়। কিন্তু প্রেসিডেন্ট বুমেদিন সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে স্থির প্রতিজ্ঞ থাকেন। ওই বছর জুলাইয়ের পরিবর্তে সেপ্টেম্বর মাসে সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সম্মেলনে সোভিয়েত রাশিয়ার অন্তর্ভুক্তির সমর্থন এবং মালয়েশিয়ার অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতার সিদ্ধান্ত নেন আইউব। আর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহেরু নেন উল্টো ভূমিকা। তিনি দাঁড়িয়ে যান মালয়েশিয়ার অন্তর্ভুক্তির সমর্থনে।

এরপরও একজন রাজনীতি সচেতন ব্যক্তিকে আর ব্যাখ্যা করে বলে দেয়ার অপেক্ষা রাখে না যে, দিনে দিনে আইউব খান মার্কিনী প্রশাসনের কাছে কি ধরনের অপাংক্তেয় ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে পড়েন। কি ধরনের অপাংক্তেয়,— সে সম্পর্কে আমাদের ধারণা দিচ্ছেন জি ডবলিউ চৌধুরী তাঁর *দ্য লাস্ট ডেজ অব ইউনাইটেড পাকিস্তান* গ্রন্থে।

১৯৬৫ সালের ৩ এপ্রিলে মস্কো সফরে যান আইউব খান। সেখান থেকে সরাসরি ওয়াশিংটন সফরের পরিকল্পনা ছিল তার। আইউব ওই সফরের মাধ্যমে মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে একটি সমঝোতায় আসতে চেয়েছিলেন। তার ওই সফর পরিকল্পনাকে অত্যন্ত "অভদ্রোচিতভাবে"[২] প্রত্যাখ্যান করে তৎকালীন মার্কিন প্রশাসন। "প্রেসিডেন্ট লিন্ডন জনসন জানিয়ে দেন যে আইউব খানকে ওয়াশিংটনে অভ্যর্থনা জানানো হবে

২. জি ডবলিউ চৌধুরী : *দ্য লাস্ট ডেজ অব ইউনাইটেড পাকিস্তান* পৃষ্ঠা–১৭

www.pathagar.com

না।"[৩] অতএব, এটা পরিষ্কার যে ওয়াশিংটনের কাছে আইউবের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায় অনেক আগেই এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যক্তিতে পরিণত হবার মুহূর্ত থেকেই আইউবের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়। মার্কিন প্রশাসন সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় আইউবকে 'যেতে হবে।' সিদ্ধান্ত মোতাবেক আইউব উৎখাতের পরিকল্পনা তৈরিতে নেমে পড়ে সিআইএ—একটি সামরিক, অপরটি রাজনৈতিক চাপ। সামরিক চাপ ব্যর্থ হলে শুরু করা হবে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির প্রক্রিয়া। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধই হচ্ছে সিআইএ-'র সেই সামরিক চাপ—আর ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারিতে লাহোরে অনুষ্ঠিত ডানপন্থী পাঁচ দলীয় জাতীয় সম্মেলনে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক কমিটির সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান উত্থাপিত ছয় দফা প্রস্তাব সেই রাজনৈতিক চাপ।

আইউবের ওপর মার্কিন প্রশাসন তথা সিআইএ-'র যে চাপ আসছে, পাকিস্তানি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা তা জানতে পায় এমন সময় যখন আইউবকে নেমে পড়তে হয় যুদ্ধের ময়দানে—সিআইএ পরিকল্পিত বাইরের চাপ মোকাবেলায়।

পাকিস্তান কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এ তথ্য জানতে পায় হল্যান্ডে তাদের এক বিশ্বস্ত সূত্রের মাধ্যমে। ওই সূত্রটি হচ্ছে হল্যান্ডে তৎকালীন পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত কুদরত উল্লাহ শেহাব। এর আগে তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা সচিব। এই ব্যক্তি চীনের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন বলে আইউবকে মার্কিন চাপে তাকে প্রশাসন থেকে সরাতে হয় এবং হল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত করে পাঠানো হয়। রাষ্ট্রদূত শেহাবের সঙ্গে ন্যাটোর (উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা) এক পদস্থ সামরিক কর্মকর্তা, যিনি ছিলেন জেনারেলের পদমর্যাদাসম্পন্ন, তার সঙ্গে ছিল বন্ধুত্ব। ন্যাটোর ওই জেনারেল ছিলেন হল্যান্ডের অধিবাসী। তিনি পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতকে জানান যে চলতি বছর (১৯৬৫) সেপ্টেম্বর মাসে এশিয়ার দুটো দেশ—ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্তানে সিআইএ আঘাত হানতে যাচ্ছে। পাকিস্তানের ব্যাপারে তিনি শুধু এইটুকুই বলতে পারেন যে আইউব উৎখাতে বাইরে থেকে একটি চাপ দেয়ার চেষ্টা হবে এবং সেটা সামরিক ধরনের। এটা ব্যর্থ হলে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগের প্রক্রিয়ায় নামা হবে এবং সে চাপ পূর্ব পাকিস্তান থেকেই শুরু করা হতে পারে। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধই হচ্ছে সেই সামরিক চাপ আর পূর্ব পাকিস্তান থেকে উত্থাপিত ছয় দফা প্রস্তাব অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সেই রাজনৈতিক চাপ।

ভারতীয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার পরিকল্পনা

১৯৬২ সালের চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধে আইউব খানের ভূমিকায় পাকিস্তান সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে ভারত। পাকিস্তানকে দুর্বল করার লক্ষ্যে সে পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে আলাদা রাষ্ট্রে পরিণত করার পরিকল্পনা নেয়। ভারতীয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার ওপর সে পরিকল্পনা তৈরির দায়িত্ব অর্পিত হয়।

---

৩. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

১৯৬২ সালে তৎকালীন পাকিস্তান কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (Director of Intelligence Bureau : D.I.B.) জানতে পায় যে কলকাতার ভবানীপুর এলাকার একটি বাড়িতে, যা ছিল ভারতীয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার অপারেশনাল সদর দফতর, সেখানে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ নামে একটি গোপন সংগঠন সক্রিয় রয়েছে। তার উদ্দেশ্য, পাকিস্তান রাষ্ট্র থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত করা। পাকিস্তান কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এও জানতে পায় যে চিত্তরঞ্জন সুতার[৪] ও কালিদাস বৈদ্য[৫] নামক দুই পাকিস্তানি নাগরিকের সঙ্গে এই গোপন সংগঠনের যোগাযোগ রয়েছে। তাদেরকে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ভারতীয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার এজেন্ট বলে মনে করতো। গোয়েন্দা সংস্থা আরো জানতে পায়, স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ নামক সংগঠনটি সংখ্যালঘিষ্ঠ এলাকায় বিশেষ করে ফরিদপুরের সংখ্যালঘিষ্ঠ অঞ্চলে তৎপর রয়েছে। ছাত্রদের মধ্যে ওই সংগঠনটি কিভাবে এবং কি পরিমাণে জড়িত ছিল, পাকিস্তান কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সেটা আবিষ্কার করতে পারে নি।

পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থা জানতে পারে নি ঠিকই, তবে ওই সময়ই ছাত্রদের মধ্যে ভারতীয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার অনুপ্রবেশ ঘটে যায় এবং স্বাধীন বাংলাদেশের দাবি সংবলিত লিফলেট ভারতীয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা তার গোপন সংগঠন স্বাধীন বংলা বিপ্লবী পরিষদের মাধ্যমে বিলি করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের তৎকালীন নেতা পরবর্তীকালে মুজিব বাহিনীর অন্যতম সংগঠক আবদুর রাজ্জাক আমাকে দেয়া এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে জানান, তিনিও ১৯৬২ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবি সংবলিত লিফলেট পেয়েছিলেন। ওই সময় খুলনার বিভিন্ন অঞ্চলে একই ধরনের

---

৪. **চিত্তরঞ্জন সুতার :** বাড়ি পিরোপুর জেলার নাজিরপুর উপজেলায় বাটনাতলা গ্রামে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর করতেন পাকিস্তান কংগ্রেস। বিয়ে করেন বরিশালের তৎকালীন কংগ্রেস নেতা প্রাণকুমার সেনের কন্যাকে। ১৯৫৪ সালে কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে পিরোজপুর নির্বাচনী এলাকায় তফশিলীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থেকে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৯ সালে ডা. কালিদাস বৈদ্য, কণিকা বিশ্বাস ও গোপালগঞ্জ-সাতপাড় কলেজের বীরেন বিশ্বাসকে নিয়ে করেন গণমুক্তি পার্টি।

চিত্তরঞ্জন সুতার ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের টিকিটে পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হতেই তিনি ভারতে চলে যান। ১৯৭৩ সালে তিনি আওয়ামী লীগের টিকিটে সংসদ সদস্য হন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিব নিহত হবার পরপরই তিনি আবার ভারতে চলে যান।

৫. **কালিদাস বৈদ্য :** পেশায় ডাক্তার। বাড়ি পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর উপজেলায়। প্র্যাকটিস করতেন ঢাকায় শাঁখারি বাজারে। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্তিকালে পড়তেন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে। দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন তখন। পাকিস্তান সৃষ্টির কিছুদিন পর চলে আসেন ঢাকায় এবং ভর্তি হন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে গণমুক্তি পার্টির প্রার্থী হয়ে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হেরে যান। তার রাজনৈতিক দর্শন ছিল, 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' যদি না-ই থাকে, তবে সীমান্ত থাকবে কেন? ডাক্তার কালিদাস বৈদ্য ও চিত্তরঞ্জন সুতার দুজনেই তথাকথিত স্বাধীন বঙ্গভূমির প্রবক্তা।

www.pathagar.com

লিফলেট পাওয়া যায়। ওই লিফলেট যাদের হস্তগত হয়, তারা কেউই জানতে পায় না কে বা কারা এসব বিলি করছে। খুলনার পিকচার প্যালেস সিনেমা হলে কিছু লিফলেট পাওয়া যায়। শো শুরু হবার আগ মুহূর্তে হলের বাতি নিভে যাবার সঙ্গে সঙ্গে লিফলেট দর্শকের মাঝে ছুঁড়ে মারা হয়।

১৯৬৮ সালে ভারতীয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে পুনর্গঠিত করা হয় এবং নামকরণ করা হয় 'রিসার্স অ্যান্ড অ্যানাল্যাসিস উইং' সংক্ষেপে 'র' (Research and Analyses Wing : Raw)। 'র' গঠিত হবার পর পূর্ব পাকিস্তানে পূর্বতন ভারতীয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সৃষ্ট স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ ছাত্রদের মধ্যে অধিকমাত্রায় সক্রিয় হয়ে ওঠে।

www.pathagar.com

সিআইএ'র সামরিক চাপ

১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারিতে আইউব খান তার আবিষ্কৃত মৌলিক গণতন্ত্রভিত্তিক প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রার্থী পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ-অনুজা মিস ফাতেমা জিন্নাহকে পরাজিত করে নিজ অবস্থান আরো সুদৃঢ় করেন। এই নির্বাচন অন্তত কিছুদিনের জন্য হলেও আইউব বিরোধী আন্দোলনকে থিতিয়ে দেয়। আর আইউবের স্তাবকরা নির্বাচনে বিজয়ী আইউবের স্তুতিতে স্তুতিবাদের ক্ষেত্রে এক নতুন রেকর্ড স্থাপন করে। তাকে বানিয়ে ফেলে 'এশিয়ান দ্য গল'। এই স্তুতি উচ্চাভিলাষী আইউবের আকাঙ্ক্ষাকে আরো উত্তুঙ্গ করে তোলে। দক্ষিণ এশিয়ার নেতা হবার উদগ্র বাসনা তাকে পেয়ে বসে। সিআইএ তক্কে তক্কেই ছিল। দক্ষিণ এশিয়ার নেতা হবার তার বাসনাকে আরো খুঁচিয়ে তোলে এবং সেটাকেই টোপ হিসেবে ব্যবহার করে। আইউব আগ-পিছ না ভেবেই গিলে ফেলেন সিআইএ-র টোপ। অন্যদিকে সিআইএ তৈরি করে রেখেছিল তার শিখণ্ডী। পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর কালাবাগের আমির মোহাম্মদ খান সেই শিখণ্ডী। আইউব খতম হলেই পরিকল্পনা মোতাবেক তিনি গিয়ে বসবেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের গদিতে।

আইউব সিআইএর টোপ গলাধঃকরণ করেন অন্য কারণে। যদিও প্রেসিডেন্ট লিন্ডন জনসন তার আমেরিকা সফরসূচি প্রত্যাখ্যান করেন তথাপি পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বলে তিনি মার্কিনী সাহায্যের ব্যাপারে ছিলেন আস্থাবান। বিপদের দিনে মার্কিনীরা সমর সম্ভার নিয়ে তার পাশে এসে দাঁড়াবে, এ বিশ্বাস ছিল তার দৃঢ়।

পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি অনুযায়ী ওই সময় পাকিস্তানের সমরনীতি পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত ছিল মার্কিন সমর বিভাগের হাতে। যে সংস্থার মাধ্যমে পেন্টাগন পাকিস্তানের সমরনীতির ওপর খবরদারি করতো, সেটা 'মিলিটারি অ্যাসিসট্যান্স অ্যাডভাইজারি গ্রুপ (Military Assistance Advisory Group) সংক্ষেপে 'ম্যাগ'। রাওয়ালপিণ্ডির সেনা সদর দফতরই ছিল ম্যাগ-এর দফতর। আর ম্যাগের পরিচালনায় ছিলেন মার্কিন সেনাবাহিনী কর্মকর্তারা। সুতরাং তখনো পর্যন্ত মার্কিনীদের প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করার কোন কারণ দেখা দেয় নি আইউবের মনে।

ওই বছর অর্থাৎ ১৯৬৫ সালের ৬ আগস্টে কাশ্মীর ন্যাশনাল কনফারেন্স তাদের নেতা শেখ আবদুল্লাহর গ্রেফতার দিবস পালনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ওই দিনে শ্রীনগরে বড় রকমের গোলযোগ হতে পারে বলে পাকিস্তান সরকার ধারণা করে। সিআইএ দিনটিকে সামনে রেখে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়।

www.pathagar.com

ম্যাগ আইউব খানকে পরামর্শ দেয় যে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে শ্রীনগরের সম্ভাব্য গোলযোগ চরম বিশৃংখলা পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারলে তা থেকে কাশ্মীর দখল পরিকল্পনাকে অধিকতর সুবিধাজনক অবস্থানে নিয়ে আসা যাবে। কাশ্মীর দখল সহজসাধ্য ব্যাপারে পরিণত হবে।

আইউব খান ম্যাগের পরামর্শ তিনটি প্রেক্ষিতে যাচাই করেন। **এক,** ওই বছর অর্থাৎ ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে কচ্ছের জলাভূমির অধিকার নিয়ে পাক-ভারত সংঘর্ষে পাকিস্তান যে ক্ষুদ্র বিজয় অর্জন করে, তা থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর উৎকর্ষ এবং যোগ্যতা সম্পর্কে তার মনে এক ভ্রান্ত ধারণার জন্ম দেয়। ভারতীয় সেনাবাহিনী থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী শ্রেষ্ঠতর এ ধারণা তার মনে দৃঢ়ভাবে শেকড় গেড়ে বসে। ওই ভ্রান্ত ধারণা ম্যাগের পরিকল্পনায় তার সামনে কাশ্মীর দখলের উজ্জ্বল সম্ভাবনা তুলে ধরে। **দুই,** কাশ্মীর বিজয় মানেই দক্ষিণ এশিয়ার নেতা হবার সুপ্ত বাসনার বাস্তবায়ন। **তিন,** যেহেতু পরামর্শ ম্যাগের সেহেতু বড় রকম বিপদ দেখা দিলে অনিবার্য কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এগিয়ে আসবে সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করে। অতএব, আইউব খান সানন্দে গ্রহণ করেন ম্যাগের পরামর্শ এবং গর্তে পা ফেলেন অবধারিতভাবে ডুবে যাওয়ার জন্য।

ম্যাগ পরিকল্পনা তৈরি করে পেশ করলো আইউবের কাছে। ৫ আগস্টের চার-পাঁচদিন আগ থেকে অস্ত্র-শস্ত্র ও খাদ্য সম্ভারসহ কয়েক হাজার লোকের অনুপ্রবেশ ঘটাতে হবে কাশ্মীরের উরি-পুঞ্চ এলাকায়। এখান থেকে হাঁটা পথ রয়েছে শ্রীনগরে যাবার। অনুপ্রবেশ ঘটাবার জন্যে এর চেয়ে উত্তম স্থান আর নেই। কেননা, ভারতীয়রা এলাকাটিকে বিপজ্জনক এলাকা মনে করে না। তাই সেখানে প্রহরার কোন ব্যবস্থাও রাখে নি তারা। এখান থেকে পায়ে হেঁটে অনুপ্রবেশকারীরা ৪ আগস্ট রাতের অন্ধকারে ঢুকে পড়বে শ্রীনগর শহরে। দিনের আলো ফুটতে পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী সময়মত নেমে পড়বে শেখ আবদুল্লাহর সমর্থনে। গোলযোগ চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত করাতে পারলে পরবর্তী কর্মসূচি বাস্তবায়নে এগিয়ে যাওয়া হবে। অনুপ্রবশকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা হবে গোপন বেতার মারফত। পরিকল্পনায় উরি-পুঞ্চ এলাকায় গোপন এয়ার ড্রপিংয়ের মাধ্যমে অনুপ্রবেশ ঘটাবার কথা বলা হয়। আইউব খান ম্যাগের পরিকল্পনা অনুমোদন করেন এবং তৎকালীন বিমান বাহিনী প্রধান নূর খানকে ম্যাগের পরিকল্পনা কার্যকর করতে নির্দেশ দেন।

অনুপ্রবেশ ঘটাবার জন্য লোক সংগ্রহ করা হয় উপজাতীয় এলাকা থেকে। হালকা অস্ত্র-শস্ত্র এবং খাদ্য সম্ভার দিয়ে পাকিস্তান বিমান বাহিনী গোপনে আকাশ পথে কয়েক হাজার উপজাতীয়কে উরি-পুঞ্চ এলাকায় নামিয়ে দেয় ৫ আগস্টের দিন পাঁচেক আগে। শ্রীনগরে ঢোকার আগের রাতে অনুপ্রবেশকারীদের দেখে ফেলে এক রাখাল বালক। দেখা মাত্রই সে ধরে নেয় এরাই সেই 'কাবালি লোক।' এই 'কাবালি লোক' কারা?

১৯৪৮ সালের কথা। খান আবদুল কাইউম খান তখন পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। ওই সময় তিনি বিপুল সংখ্যক উপজাতীয় লোক কাশ্মীরে

www.pathagar.com

ঢুকিয়ে দেন গোলযোগ পাকাবার লক্ষ্যে। অনুপ্রবেশকারী উপজাতীয়রা ভারতীয় এলাকায় বেপরোয়া লুটপাট চালায়। ওই অনুপ্রবেশের কারণেই বেধে যায় পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে প্রথমবারের মতো যুদ্ধ। উপজাতীয়দের লুটতরাজের কাহিনী বয়োজ্যেষ্ঠদের মুখে ফিরতো সর্বদা। দিনের পর দিন শুনতে শুনতে ওই লুটেরা উপজাতীয়দের পোশাক-আশাক, চেহারা-সুরত সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে বয়োকনিষ্ঠদের মনে। রাখাল বালক অনুপ্রবেশকারী উপজাতীয়দের পোশাক-আশাক দেখেই বুঝে ফেলে এরাই সেই 'কাবালি লোগ' মানে লুটেরার দল,—আবার এসেছে লুটপাটের জন্যে। মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে সে নিজের লোকজনদের গিয়ে খবর দেয় 'উও কাবালি লোগ ফের আ গিয়া' অর্থাৎ লুটেরারা আবার এসে গেছে। স্থানীয় লোকজন দৌড়ে গিয়ে খবর দেয় নিকটতম পুলিশ স্টেশনে। সেখান থেকে মুহূর্তে খবর চলে যায় শ্রীনগরে—কাশ্মীর সরকারের কাছে এবং শ্রীনগর থেকে দিল্লীতে। কেন্দ্রীয় সরকার দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ভারতীয় সেনাবাহিনী পেছন থেকে এসে ঘেরাও করে ফেলে পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারীদের। গোপন বেতার মারফত এ খবর পৌঁছে যায় পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের কাছে। এমন অঘটন ঘটবে, আশা করেন নি আইউব খান। ম্যাগের কাছে জানতে চাইলেন, এখন কি করা হবে? উপজাতীয়দের ফিরিয়ে আনা হবে কিভাবে? ম্যাগ পরামর্শ দেয় চাম্ব সেক্টর দিয়ে সেনাবাহিনীর নিয়মিত ইউনিট ঢুকিয়ে দিতে।

ম্যাগের পরামর্শে আইউব খান একটি প্রচলিত যুদ্ধের (Conventional War) সম্ভাবনা দেখতে পান। তাতে বিপদের মাত্র বাড়বে বৈ কমবে না। আইউব দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েন চাম্ব সেক্টর দিয়ে সেনাবাহিনীর নিয়মিত ইউনিট প্রেরণের ব্যাপারে। কিন্তু ম্যাগ তাকে আশ্বস্ত করে এই বলে যে যেহেতু কাশ্মীর একটি বিতর্কিত অঞ্চল, সংঘর্ষ কাশ্মীর সীমানার মধ্যেই সীমিত থাকবে। এই সংঘর্ষ আন্তর্জাতিক সীমান্তে সম্প্রসারিত হবার সুযোগ নেই। তাছাড়া ভারতীয়রা অতটা ঝুঁকিও নিতে চাইবে না। আইউব খানকে ম্যাগের পরামর্শ গ্রহণ করতে হয়। কেননা, তখন পেছানোর পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে।

ম্যাগের পরামর্শ কার্যকর করা হলো। মেজর জেনারেল আখতার হোসেন মালিকের অধিনায়কত্বে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিয়মিত ইউনিট জম্মু-কাশ্মীর সীমান্ত অতিক্রম করে এবং সূচিত হয় ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত সর্বাত্মক যুদ্ধের। ভারতীয় সেনাবাহিনী নিজেদের এলাকায় ঢুকে পড়া পাকিস্তানি বাহিনীকে বাধা দেয় বটে, কিন্তু পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রচণ্ড আঘাতের মুখে পিছু হটতে হয়। আখনুর ও জারিয়ান দখলে এসে যায় পাকিস্তান বাহিনীর। এরপর তারা লক্ষ্য স্থির করে জম্মুর দিকে।

নিজের সেনাবাহিনীর এ তথাকথিত সাফল্যে আইউব খান অতিমাত্রায় উৎসাহিত হয়ে ওঠেন এবং ম্যাগের পরবর্তী ফাঁদে পা ঢোকান। ম্যাগ শ্রীনগর দখলের পরামর্শ দেয়। আইউব ম্যাগের এই পরামর্শের মধ্যে তার কাশ্মীর বিজয়ী বীর হবার সুপ্ত বাসনা বাস্তবায়নের ইঙ্গিত দেখতে পান। পরামর্শ অনুযায়ী আইউব খান তার সেনাবাহিনীর

www.pathagar.com

বেশিরভাগ অংশকে শ্রীনগরের দিকে ধাবিত হবার নির্দেশ দেন। এমন কী লাহোরের দিক থেকে ভারতীয়দের সম্ভাব্য পাল্টা আক্রমণ মোকাবিলার জন্য এই সেক্টরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সেনা ইউনিটও রাখেন না। কেননা, ম্যাগের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে একটি বিতর্কিত এলাকার সংঘর্ষকে ভারত আন্তর্জাতিক সীমান্তে সম্প্রসারিত করবে না। সিআইএ এবার তার শেষ চালটি চালে। দিল্লীকে পরামর্শ দেয় খেমকারান সেক্টর দিয়ে অরক্ষিত লাহোরে ঢুকে পড়তে এবং ৬ সেপ্টেম্বর শুরু হয়ে যায় দ্বিতীয় পাক-ভারত সর্বাত্মক যুদ্ধ। ৫ আগস্ট শ্রীনগরকে সামনে রেখে সিআইএ যে চক্রান্ত রচনা করে, ৬ সেপ্টেম্বর তা চূড়ান্ত পরিণতিতে পৌঁছে দেয়।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর শক্তি, সামর্থ্য এবং যোগ্যতা সম্পর্কে সিআইএ'র সম্যক ধারণ ছিল। তাই পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মুখোমুখি করানোই ছিল তার চক্রান্তের লক্ষ্য এবং ধরেই নেয় যুদ্ধে পাকিস্তানের পরাজয় অবধারিত। আর কোন পরাজিত সেনাবাহিনীর নেতার পক্ষে ক্ষমতায় আসীন থাকা সম্ভব নয়। তাকে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াতে হবে। স্বেচ্ছায় সরতে না চাইলে বলপূর্বক সরানো হবে। সরিয়ে দেবার পক্ষে যুদ্ধে হেরে যাবার গ্লানি আর অবমাননাকে জোরালো যুক্তি হিসেবে খাড়া করা হবে। আইউব খানের অপসারণের পর যাকে ক্ষমতায় বসানো হবে, সারা পাকিস্তানব্যাপী তার একটা ভাবমূর্তি ইতোমধ্যে তৈরি করে ফেলে সিআইএ। তিনি তৈরি হয়েই ছিলেন। যুদ্ধটা শেষ হতেই তিনি প্রেসিডেন্টের গদিতে গিয়ে বসবেন। আগেই তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর কালাবাগের আমির মোহাম্মদ খান,—মার্কিনীদের বিশেষ প্রীতিভাজন ব্যক্তি।

৬ সেপ্টেম্বর খেমকারান সেক্টর দিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী আক্রমণ পরিচালনা করতেই হকচকিয়ে যান আইউব। বুঝতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় না কি এক ভয়ঙ্কর ফাঁদে তিনি পা গলিয়েছেন। ওই সন্ধ্যায় তিনি পাকিস্তানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ম্যাকনোগিকে ডেকে পাঠান।

মার্কিন দূতাবাস তখন ছিল করাচিতে। কিন্তু ৬ সেপ্টেম্বরের দিন কয়েক আগেই রাষ্ট্রদূত ম্যাকনোগি এসে আসন গেড়ে বসেন রাওয়ালপিন্ডিতে। সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট ভবনে গিয়ে তিনি আইউব খানকে যুদ্ধ সম্পর্কে মার্কিনী মহলের রিপোর্ট প্রদান করেন এবং ভবিষ্যৎ ফলাফল সম্পর্কে আগাম মতামত ব্যক্ত করে বলেন, "Mr. President, the Indians have caught you by neck, If you want us, we can help in releasing the grip." ("মি. প্রেসিডেন্ট, ভারতীয়রা এখন আপনার গলা টিপে চেপে ধরেছে। আপনি যদি চান, আমরা আপনাকে চাপমুক্ত করতে পারি।")

আইউব খান ম্যাকনোগির এ কথায় রীতিমত ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং বলেন : "Who has caught whom by the neck we will see and we will fight it out ." ("কে কার গলা চিপে ধরেছে, আমরা তা দেখে নেব)।" আইউব খান ওই মুহূর্তে ম্যাগনোগিকে প্রেসিডেন্ট ভবন ত্যাগ করতে নির্দেশ দিলেন। শুধু প্রেসিডেন্ট ভবন নয়, পরদিনই ম্যাগনোগি রাওয়ালপিন্ডি ছেড়ে করাচি চলে যান।

www.pathagar.com

ওই রাতেই আইউব খান ম্যাগকে অপসারণ করে সেনাবাহিনীর কমান্ড নিজ হাতে তুলে নেন এবং শ্রীনগর অভিমুখী সেনা ইউনিটকে মুখ ঘুরিয়ে খেমকারান সেক্টরে এসে ভারতীয় আক্রমণ প্রতিহত করার আদেশ দেন। শ্রীনগর অভিমুখী সেনা ইউনিটের সর্বপশ্চাৎ অংশ ছিল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট। মুখ ঘুরানোতে সর্বপশ্চাৎ অংশ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেনা ইউনিটের অগ্রবর্তী অংশ হয়ে যায় এবং সর্বাগ্রে ভারতীয় বাহিনীর মুখোমুখি হতে হয় এদেরকেই। যুদ্ধের ইতিহাসে খেমকারান সেক্টরে—বাঙালি তৈরি করে এক অমিত বিক্রম সাহসের দৃষ্টান্ত। তাদের প্রচণ্ড প্রতিরোধের মুখে লাহোরের উপকণ্ঠে এসে স্তব্ধ হয়ে গেল ভারতীয় বাহিনীর অগ্রযাত্রা। আইউব খান এবার সাহায্যের জন্য পিকিংয়ের প্রতি অনুরোধই শুধু জানান না; মস্কোর দিকেও মুখ ফেরান।

সেনাবাহিনীর কমান্ড হাতে নেবার পর পরই প্রেসিডেন্ট আইউব পাকিস্তানে অবস্থানরত প্রতিটি মার্কিনীর গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখতে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে নির্দেশ দেন। আরো আদেশ করেন, কোন আমেরিকান যদি কোন পাকিস্তানি কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করে, ওই পাকিস্তানি কর্মকর্তা, তা তিনি মন্ত্রীও যদি হন,—তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে।

যুদ্ধ চলাকালীন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এম এ শোয়েবের সঙ্গে দেখা করেন এক মার্কিনী কূটনীতিক। পরদিন পাকিস্তান কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার তৎকালীন প্রধান এ বি আওয়ান শোয়েবের অফিসে গিয়ে হাজির হন এবং আমেরিকান কূটনীতিকের সঙ্গে কি বিষয় নিয়ে তার আলাপ হয়েছে, জানতে চান। মন্ত্রী এম এ শোয়েব পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থার প্রধানের এহেন প্রশ্নে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। জানতে চান কোন অধিকার বলে তিনি এই স্পর্ধা দেখাতে সাহসী হয়েছেন। গোয়েন্দা প্রধান শোয়েবকে প্রেসিডেন্টের গোপন নির্দেশনামা দেখাতে তিনি যারপরনাই নরম হয়ে যান এবং আমেরিকান কূটনীতিকের সঙ্গে তার আলোচনার অনুপুঙ্খ বর্ণনা দেন। যুদ্ধের পর আইউব শোয়েবকে মন্ত্রিসভা থেকে বিতাড়িত করেন।

পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর কালাবাগের আমির মোহাম্মদ খান সম্পর্কে আগে থেকেই প্রশ্নবোধক চিহ্ন ছিল পাকিস্তান কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার। যুদ্ধ যখন চলছিল তখন হঠাৎ করে তার লাহোর থেকে করাচি রওনা হওয়ায় সতর্ক হয়ে ওঠে তারা। আমির মোহাম্মদ খান তখনো জানতে পাননি প্রেসিডেন্টের নির্দেশনামার খবর। এমন কি জানতে পাননি অর্থমন্ত্রীর জিজ্ঞাসাবাদের বিষয়টিও।

করাচিতে আমির মোহাম্মদ খান গিয়ে ওঠেন ওয়েস্ট পাকিস্তান হাউজে। গভীর রাতে দেখা গেল হাউজ থেকে বেরিয়ে আসছে কালাবাগের আমিরের গাড়ি। আরোহী মাত্র দুজন— তিনি এবং ড্রাইভার। অন্যদিকে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ম্যাকনোগির বাড়ির প্রতি নজর রাখার ডিউটিতে ছিলেন পাকিস্তান কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার একজন পদস্থ কর্মকর্তা। ওই কর্মকর্তাটি বাঙালি,—নাম এ বি এস সফদার। তাকে টেলিফোনে

www.pathagar.com

জানান দেয়া হয় গভর্নরের গাড়ি ওয়েস্ট পাকিস্তান হাউজ থেকে বেরিয়ে গেছে। তিনি নড়ে চড়ে বসেন। শ্যেন পক্ষীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন রাষ্ট্রদূত ম্যাকনোগির বাড়ির দিকে। খানিক পর দেখেন গভর্নরের গাড়ি ঢুকছে রাষ্ট্রদূতের বাসভবনের গেট দিয়ে। যতক্ষণ গভর্নর বেরিয়ে না আসেন ততক্ষণ তিনি পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। ঘণ্টা দেড়েক পর আমীর মোহাম্মদ খান বেরিয়ে আসেন ম্যাকনোগির বাসভবন থেকে।

গোয়েন্দা কর্মকর্তা এবিএস সফদার ওই রাতেই রাওয়ালপিন্ডিতে তার প্রধান এবি আওয়ানের কাছে এই বার্তাটি পাঠিয়ে দেন 'এক্সট্রা অর্ডিনারি টপ সিক্রেট' মার্ক করে। পরদিন সকাল হতেই এ বি আওয়ান প্রেসিডেন্টের টেবিলে পাঠিয়ে দেন বার্তাটি এবং আইউব খান পরের দিনই আমির মোহাম্মদ খানকে ডেকে পাঠান রাওয়ালপিন্ডিতে। আইউব খান তাকে কি বলেছিলেন জানা যায় নি। তবে যুদ্ধ শেষ হবার মাস তিনেক পর প্রবল প্রতাপশালী কালাবাগের আমির মোহাম্মদ খান আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারান।

দুই প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেলে মস্কোর কি ভূমিকা হতে পারে, তারও একটা হিসেব ছিল সিআইএ-র। সিআইএ-র হিসেব কষে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে পাকিস্তান অধিকমাত্রায় পিকিংয়ের সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। সেক্ষেত্রে মস্কো নীরব দর্শকের ভূমিকা নেবে। তাতে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সিআইএ-র পক্ষে অধিকতর সুবিধাজনক অবস্থার সৃষ্টি হবে। কিন্তু রুশ নেতৃবৃন্দের যুদ্ধ বিরতির আহবানে সাড়া দিতেই অবাক হয়ে যায় মার্কিন প্রশাসন। দৌড়ের শেষ মাথায় এসে মস্কো তাদের সকল পরিকল্পনা এমনভাবে ভণ্ডুল করে দেবে, কল্পনাও করে নি সিআইএ কর্মকর্তারা। রুশ প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিনের সরাসরি হস্তক্ষেপে ১৭ সেপ্টেম্বর যুদ্ধরত দু'পক্ষ যুদ্ধ বিরতি করে এবং ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি মাসে কোসিগিনের মধ্যস্থতায় অনুষ্ঠিত পাক-ভারত শীর্ষ সম্মেলনে আইউব খান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী মুখোমুখি বসেন তাসখন্দে। সম্মেলন ভাঙতে ভাঙতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত কোসিগিনের চেষ্টায় দু' নেতা এক শান্তি চুক্তিতে আসেন।

যুদ্ধ বিরতি এবং তাসখন্দ চুক্তি সেনাবাহিনীর মধ্যে আইউবের ভাবমূর্তিকে বিপর্যয়ের মুখোমুখি এনে দাঁড় করায় না শুধু, সারা পাকিস্তানব্যাপী তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভের রোষ ধীরে ধীরে জমাট বাঁধতে থাকে। বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৬৮ সালের ৬ নভেম্বর। ওইদিন রাওয়ালপিণ্ডির বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা এক প্রতিবাদী মিছিল বার করে। মিছিলে পুলিশের গুলিতে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের একজন ছাত্র নিহত হয়। আর ১৩ নভেম্বর পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভূট্টো এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ওয়ালি) সভাপতি ওয়ালি খানকে আটক করা হয়। এবার সারা পশ্চিম পাকিস্তান আইউবের বিরুদ্ধে ফেটে পড়ে।

অপরদিকে ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানি জনগণকে নতুন উপলব্ধিতে সমৃদ্ধ করে। পশ্চিম পাকিস্তানে ভারতীয় আক্রমণের মুখে পূর্ব পাকিস্তানি

www.pathagar.com

জনগণ নিজেদেরকে নিতান্ত অসহায় ভাবতে থাকে। 'পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তা পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শক্তির ওপর নির্ভরশীল,'—পাকিস্তানি জেনারেলদের এই তথাকথিত রণকৌশল একটি স্পষ্ট প্রতারণা হিসেবে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে বাঙালি জনগোষ্ঠীর প্রতি পাকিস্তান সরকারের বঞ্চনার আরেকটি দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়ায় ১৯৬৫ সালের যুদ্ধ। ফলে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে পূর্ব বাংলার জনগণ। উপরন্তু যুদ্ধ জীবনযাত্রার ব্যয় দেয় বাড়িয়ে। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি সাধারণ জনজীবনকে করে দেয় বিপর্যস্ত। অতএব, মস্কোর হস্তক্ষেপের দরুণ আইউব উৎখাত চক্রান্ত ভণ্ডুল হয়ে গেলেও যুদ্ধ পরবর্তী জন-অসন্তোষের সুযোগ নেয় সিআইএ। তার দ্বিতীয় প্রকল্প অর্থাৎ রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগের পরিকল্পনা,—সেটা নিয়ে মাঠে নামে। ছয় দফাই সেই রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির প্রকল্প।

www.pathagar.com

সিআইএ'র রাজনৈতিক চাপ

ছয় দফা প্রণয়ন এবং লাহোরে অনুষ্ঠিত ডানপন্থী পাঁচ পার্টির জাতীয় সম্মেলনে এর উপস্থাপনা নিয়ে একটি রহস্য দানা বেঁধে ওঠে। রহস্য সৃষ্টি করেন এর উপস্থাপক তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক কমিটির সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান। কারণ, উপস্থাপনার আগ পর্যন্ত সম্মেলনে যোগদানকারী প্রাদেশিক কমিটির প্রতিনিধিদলের কেউই জানতেন না যে শেখ মুজিবর রহমান এ ধরনের একটি প্রস্তাব সম্মেলনে তুলবেন।

আইউব বিরোধী একটি একক ডানপন্থী বিরোধীদলীয় মোর্চা গঠনের লক্ষ্যে লাহোরে ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি এক জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে নূরুল আমিনের ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (এনডিএফ) কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম ও আওয়ামী লীগ অংশগ্রহণ করে। আওয়ামী লীগের পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক কমিটির পক্ষ থেকে যে প্রতিনিধি দল সম্মেলনে যোগদান করে, তার নেতৃত্ব দেন শেখ মুজিবর রহমান। ওই প্রতিনিধি দলের সদস্যরা ছিলেন : জহির উদ্দিন, নুরুল ইসলাম চৌধুরী, হাফেজ হাবিবুর রহমান, তাজউদ্দীন আহমদ, আবদুল মালেক উকিল, মিজানুর রহমান চৌধুরী, ইউসুফ আলী, এএইচএম কামরুজ্জামান ও এবিএম নুরুল ইসলাম। এই সম্মেলনেই শেখ মুজিব সর্বপ্রথম ছয় দফা উত্থাপন করেন। অথচ সম্মেলন কক্ষে প্রবেশের আগ মুহূর্তেও এ সম্পর্কে তার মুখে একটি বাক্যও উচ্চারিত হয় নি। এমন কি তার প্রতিনিধি দলের সদস্যদেরকেও ছিটেফোঁটাও জানান নি। আমাকে দেয়া এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে তৎকালীন পাকিস্তান আওয়ামী লীগের পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক এবং প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য মিজানুর রহমান চৌধুরী[১] বলেন : "লাহোর যাত্রার প্রাক্কালে ঢাকাতে এমনকি লাহোরে গিয়েও এ সম্পর্কে তিনি আমাদের সঙ্গে কোন আলাপ-আলোচনা করেন নি। আমরা জানতামই না শেখ মুজিব এ ধরনের একটি প্রস্তাব উত্থাপন করবেন।" ফলে সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক কমিটির প্রতিনিধিরাই শুধু বিস্মিত হন নি, অবাক করে দেয় সম্মেলনে উপস্থিত ডানপন্থী পাঁচ দলীয় নেতৃবৃন্দকেও। সম্মেলনে যোগদানের জন্য লাহোরের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে শেখ মুজিব ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ সালে এক বিবৃতিতে

১. পরবর্তীতে মুজিব সরকারের মন্ত্রী এবং এরশাদ শাসনামলে প্রধানমন্ত্রী।

www.pathagar.com

বলেন : "একমাত্র ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্বারা এবং অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও দেশরক্ষার দিক হইতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বয়ংসম্পূর্ণতা বিধানের দ্বারাই দেশের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখা যাইতে পারে।"[২] করাচি পৌঁছে তিনি আরেকটি বিবৃতি দেন। সেটা একই তারিখের দৈনিক *আজাদ* এ প্রকাশিত হয়। বিবৃতিতে বলা হয় : '১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে তিনি (শেখ মুজিব) পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানান। অথচ সম্মেলন কক্ষে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের কথা না তুলে ছয় দফা প্রস্তাব তোলেন।"

লাহোরের পাঁচ দলীয় জাতীয় সম্মেলন তার ছয় দফা প্রস্তাবকে এক প্রকার উপেক্ষা করে এবং এ নিয়ে শেখ মুজিবকে আলোচনার কোন সুযোগই দেয়া হয় না। তাই সম্মেলন শেষে সারা পাকিস্তানের বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তানি জনগণের সামনে ছয় দফাকে তুলে ধরার জন্য তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সেখানে তিনি তার প্রস্তাবের দফাওয়ারি ব্যাখ্যা দেন।

লাহোর থেকে ঢাকায় ফিরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন : "সম্মেলনের একটি বিশেষ কোটারি যুদ্ধের প্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের অনুকূলে ছয় দফাভিত্তিক একটি প্রোগ্রাম বিবেচনা তো নয়ই, এমন কি আলোচনা করিতে পর্যন্ত অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়াছে।" তিনি সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন : "পাকিস্তান আওয়ামী লীগের পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক কমিটি কর্মসূচির সাথে একমত না হইতে পারিয়া সম্মেলনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে।"[৩]

লাহোরে অনুষ্ঠিত পাঁচ দলীয় জাতীয় সম্মেলনে গুরুত্ব না পাওয়ায় শেখ মুজিব ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ সালে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক কমিটির ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে ছয় দফা অনুমোদন করিয়ে নেন। পরের মাসে ১৯ মার্চ থেকে অনুষ্ঠিত ৩ দিনব্যাপী প্রাদেশিক কমিটির কাউন্সিল অধিবেশনেও ছয় দফা অনুমোদিত হয়ে যায়। প্রাদেশিক কমিটির সভাপতি মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ অসুস্থ থাকায় কাউন্সিল অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন প্রাদেশিক কমিটির সহসভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। কাউন্সিল অধিবেশনে ছয় দফা অনুমোদিত হয়ে যাবার পর থেকেই নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ দু'টুকরো হয়ে যায়। দু' দুটো কমিটিতে অনুমোদিত হয়ে যাবার পরও একটি বিষয় সবার অজ্ঞাত থেকে যায়। তাহলো, এর প্রণেতা কে বা কারা? শেখ মুজিব দুটো অধিবেশনের কোনটাতেই এ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আভাস দেন না। তার এই নীরবতা ছয় দফার প্রণয়ন নিয়ে তৎকালীন পাকিস্তানে বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (পিকিংপন্থী) অভ্যন্তরে বামপন্থীরা এই প্রস্তাবকে সিআইএ-র একটি চক্রান্ত বলে অভিহিত করে ছয় দফার বিরোধিতায় নামে। কিন্তু এই বক্তব্যের পেছনে তারা কোন

২. দৈনিক *আজাদ*, ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬।

৩. দৈনিক *আজাদ*, ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬।

www.pathagar.com

যুক্তিও প্রদর্শন করে না। অবশ্য পাকিস্তান কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এটাকে আইউব উৎখাতে সিআইএ-র রাজনৈতিক চাপ শুরুর প্রক্রিয়া বলে মন করে হল্যান্ডে পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত কুদরত উল্লাহ শেহাবের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের আলোকে। তাদের ধারণা দৃঢ় হয় ঢাকায় তৎকালীন মার্কিন কনসাল জেনারেল ব্রাউন ও কনস্যুলেটের আরেক কর্মকর্তা কর্নেল চিশহোমের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে।

পাকিস্তান কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা জানতে পায় যে ব্রাউন কনসাল জেনারেলের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সিআইএ-র স্টেশন চিফেরও দায়িত্ব পালন করেছেন এবং তার সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের একাংশেরও কিছু রাজনৈতিক নেতার যোগাযোগ রয়েছে। পাকিস্তান কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এও জানতে পায়, কর্নেল চিশহোমের বাসভবনে মাঝে মাঝে পার্টি দেয়া হয়। এইসব পার্টিতে বাছাই করা কিছু রাজনৈতিক নেতা, ছাত্রনেতা এবং পদস্থ সরকারি বাঙালি কর্মকর্তা উপস্থিত থাকেন। গোয়েন্দা সংস্থা অনুমান করে যে, ছয় দফার ধারণা কর্নেল চিশহোমের পার্টি থেকেই এসেছে। পরে কর্নেল চিশহোমকে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ঘোষণা করে পাকিস্তান থেকে বহিষ্কার করা হয়।

তৎকালীন পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থার এক পদস্থ কর্মকর্তা এবিএস সফদার আমাকে জানান : "শেখ মুজিব তাকে ওই সময় বলেছিলেন যে তেজগাঁও বিমান বন্দরে লাহোরগামী বিমানে ওঠার আগে ছয় দফা প্রস্তাবের একটি টাইপ করা কপি রুহুল কুদ্দস তার হাতে তুলে দেন। তিনি ছিলেন শেখ মুজিবের একটি ইনার সার্কেল।" তার ভাষ্যের সত্যতা প্রতিপাদিত হয় প্রয়াত আওয়ামী লীগ নেতা এবং লাহোরে অনুষ্ঠিত ডানপন্থী পাঁচ দলীয় সম্মেলনে যোগদানকারী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য আবদুল মালেক উকিলের কথায়। সাপ্তাহিক *মেঘনা*-র ১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৫ সালের সংখ্যায় দেয়া এক সাক্ষাৎকারে আবদুল মালেক উকিল বলেন : "ছয় দফা তিনি প্রথম দেখেন একটা টাইপ করা কাগজে শেখ সাহেবের পকেটে ১৯৬৬ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় কনভেনশনে যাবার পথে।"

ছয় দফা নির্মাণ এবং এর নির্মাতা সম্পর্কে সম্মেলনে যোগদানকারী প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য মিজানুর রহমান চৌধুরী আমাকে দেয়া সাক্ষাৎকারে বলেন : "লাহোর সম্মেলনে পেশ করার আগ মুহূর্তেও ছয় দফা সম্পর্কে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির কেউই এ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। পরে এ নিয়ে তাঁকে আমরা প্রশ্ন করিনি— কেন তিনি আমাদেরকে জ্ঞাত না করে এই প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। কেননা, প্রাদেশিক কমিটির দেয়া ক্ষমতাবলে যে কোন প্রস্তাব তৈরির অথবা সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার শেখ মুজিবের ছিল। তাই কোন প্রশ্ন না তুলেই ওয়ার্কিং কমিটি সম্মেলনে পেশকৃত ছয় দফাকে অনুমোদন দিয়ে দেয়।

মিজানুর রহমান চৌধুরী বলেন : "প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বাইরে শেখ মুজিবের একটি ইনার সার্কেল ছিল। কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে তিনি ওই ইনার সার্কেলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন বলে আমরা ধারণা করতাম।

www.pathagar.com

রুহুল কুদ্দুস ও আহমেদ ফজলুর রহমান (দুজনেই সিএসপি এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত আসামী) ছিলেন তার ওই 'ইনার সার্কেল'-এর লোক। আমার ধারণা, এই দুজনেই ছয় দফা তৈরি করেন।"

যেহেতু ছয় দফার প্রণয়ন সম্পর্কে শেখ মুজিব নীরব ছিলেন, সে কারণে এর প্রণেতা সম্পর্কে তৎকালীন পাকিস্তানে একটি বিভ্রান্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। যে যার নিজের মতো একেক জনকে প্রণেতা বলে বয়ান দিতে থাকেন। আইউবের বিশ্বস্ত অনুচর এবং তৎকালীন কেন্দ্রীয় তথ্য সচিব আলতাফ গওহরের নাম উল্লেখ করেছেন জি ডবলিউ চৌধুরী তার দ্য লাস্ট ডেজ অব ইউনাইটেড পাকিস্তান গ্রন্থে। তিনি বলেছেন :"এই রকম গুজব রটান হয়ে যে, এর প্রণেতা আলতাফ গওহর— যিনি আইউবের সবচেয়ে বিশ্বস্ত এবং প্রশাসনে তার ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তি। কোন কোন বিশেষ মহল থেকে এই রকম ইঙ্গিত দেয়া হয়, আইউব নিজেই আলতাফ গওহরকে এ কর্মটি সম্পাদন করতে বলেন, যখন তাসখন্দ চুক্তি নিয়ে সারা পশ্চিম পাকিস্তান জুড়ে সৃষ্টি হয় প্রবল অসন্তোষ। আইউব চাইছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের দৃষ্টি পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদের দিকে ঠেলে দিতে।"[৪] দৈনিক ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ১৯৬৬ সালের ৪ মার্চে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত 'বাস্তবতার আলোকে ৬-দফা নিবন্ধে শেখ মুজিবকে ছয় দফার প্রণেতা বলেছেন।[৫]

জি ডবলিউ চৌধুরী আইউবের তথ্য সচিব আলতাফ গওহরের নাম উল্লেখ করে যে যুক্তি খাড়া করেছেন, সেটাকে মেনে নেয়া যায় না। তিনি যে মহল থেকে আলতাফ গওহরের নাম পেয়েছিলেন, তারা সম্ভবত এই ধারণা থেকে বলেছেন যে ছয় দফা ঘোষণার পর পর আলতাফ গওহর তার প্রভূ আইউব খানকে তাসখন্দ চুক্তি উদ্ভূত বিপর্যয় থেকে বাঁচাবার জন্য যে কৌশলে এটাকে ব্যবহার করেন তা থেকেই। আলতাফ গওহর তৎকালীন পাকিস্তানের সকল পত্রিকা সম্পাদককে ছয় দফার ব্যাপক প্রচারের গোপন নির্দেশ দেন। তাতে তাসখন্দ চুক্তি সম্পাদনে আইউব খানের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানি জনগণের মধ্যে যে অসন্তোষ দানা বাঁধে, তা থেকে পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদের মতো একটি আতঙ্কজনক বিষয়ের প্রতি তাদের দৃষ্টি অতি সহজেই টেনে আনা যাবে। আইউব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবেন। আলতাফ গওহরের এ কূটকৌশল শেখ মুজিব এবং তার ঘনিষ্ঠজনকে হতবাক করে দেয়। অন্যদিকে প্রাপ্ত তথ্য তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার বক্তব্যকেও সমর্থন করে না।

ছয় দফা নির্মাণ সম্পর্কে শেখ মুজিব সর্বপ্রথম মুখ খোলেন ১৯৭৩ সালে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে যাবার পথে বিমানে বসে। তিনি সাংবাদিক আবদুল গফফার চৌধুরীকে বলেন : "ছ'দফার কথা বলি। একজন তাজউদ্দিন এবং অন্যজন রুহুল কুদ্দুস। অত্যন্ত গোপনে আমরা এ কাজ সেরেছি। প্রথমে ছিল এগার দফা। পরে সেটাকে কাটছাঁট করা হয়। হানিফকে তোমরা চেন।

৪. দ্য লাস্ট ডেজ অব ইউনাইটেড পাকিস্তান, পৃষ্ঠা-১৩৪

৫. *নির্বাচিত ভাষণ ও নিবন্ধ* : তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, পৃষ্ঠা-৫৭

www.pathagar.com

এখন আমার সঙ্গে আছে। আমার প্রতি ওদের আনুগত্য ও ভালোবাসার কথা আমি ভুলতে পারি না। এই হানিফকে দিয়েই প্রথমে ছ'দফার খসড়া টাইপ করান হয়েছিল।"[৬]

ছয় দফার প্রণয়ন নিয়ে রুহুল কুদ্দস[৭] আমাকে দেয়া এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে বলেন : ছয় দফার শতকরা একশত ভাগ আমারই তৈরি। প্রথমে ছিল সাত দফা। খসড়া তৈরির পর আমি সেটা দেখাই তাজউদ্দীন আহমদকে। এরপর শেখ মুজিবসহ আমাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার পর একটি দফা বাদ দেয়া হয়। ওই দফাটিতে ছিল, প্রাদেশিক গভর্নরের নিযুক্তি হবে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের ভোটে। কপিটি আমি টাইপ করাই তৎকালীন ইউনাইটেড ব্যাংক অব পাকিস্তানের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট আমার বন্ধু খায়রুল কবিরের[৮] অফিস থেকে। আমি তখন কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের ফাইন্যান্স ডাইরেক্টর।"

খায়রুল কবির আমাকে দেয়া এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে বলেন : রুহুল কুদ্দুসই ছয় দফা তৈরি করেন। আমাকে খসড়াটি তিনি দেখান এবং টাইপ করিয়ে দিতে বলেন। টাইপ করতে দেয়ার সময় তাৎক্ষণিকভাবে প্রাদেশিক গভর্নরের নিযুক্তির প্রস্তাবটি আমার মাথায় এসে যায় এবং সেটা ঢুকিয়ে দেই। ছয় দফার ওই খসড়া কপিটি টাইপ করেন আমার ব্যক্তিগত সহকারী আজিম। তিনি অবাঙালি। আমার প্রতি তিনি অত্যন্ত বিশ্বস্ত ছিলেন। বিষয়টি তিনি গোপন রাখেন। টাইপ করতে দেয়ার আগে মোতাহার হোসেন সিদ্দিকী আমার অফিসে আসেন। কেবল গভর্নর নিযুক্তির প্রস্তাবটি নিয়ে তার সাথে আলোচনা করি।" মোতাহার হোসেন সিদ্দিকী[৯] আমাকে দেয়া সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেন যে খায়রুল কবির তার সঙ্গে ওই প্রস্তাবটি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।

অতএব, এটা স্পষ্ট যে ছয় দফা তৈরি করেন রুহুল কুদ্দস। পরে শেখ মুজিবের ইনার সার্কেলে এটা আলোচিত হয়ে চূড়ান্ত হয়। অন্যদিকে শেখ মুজিব হানিফকে দিয়ে টাইপ করানোর কথা বলেছেন। তিনি হয়তো তাকে দিয়ে আরেকটি টাইপ করিয়ে নিয়ে থাকতে পারেন।

---

৬. দৈনিক জনপদ, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩

৭. প্রক্তন সিএসপি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত আসামী, প্রবাসী বাংলঅদেশ সরকার এবং স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকারের মুখ্য সচিব।

৮. খায়রুল কবির : প্রথম জীবনে ছিলেন সাংবাদিক। কলকাতায় ১৯৪৪ সালে দৈনিক আজাদ দিয়ে কর্মজীবনের শুরু। উপমহাদেশ বিভক্তির পর ঢাকায় দৈনিক আজাদ-এর বার্তা সম্পাদক হয়ে আসেন। এরপর করাচি চলে যা। এসোসিয়েট প্রেস অব পাকিস্তানের সাংবাদিক হয়ে। কিছুকাল পর চাকনি ছেড়ে ঢাকায় চলে আসেন এবং দৈনিক সংবাদ-এর বার্তা সম্পাদক হন। তিনি জাতীয় প্রেস ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ১৯৫৪ সালে সরকারি চাকরি নেন। চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনের প্রথম ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও পাকিস্তান সেন্সর বোর্ডের প্রথম চেয়ারম্যান তিনি। পরে প্রাদেশিক তথ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব। ১৯৬৩ সালে সরকারি চাকরি ছেড়ে দেন। ১৯৬৪ সালে যোগদান করেন ইউনাইটেড ব্যাংক অব পাকিস্তানে। স্বাধীনতার পর জনতা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হন।

৯. মোতাহার হোসেন সিদ্দিকী : পরবর্তীতে ইংরেজি দৈনিক নিউনেশন-এর সম্পাদক।

www.pathagar.com

লাহোর সম্মেলন থেকে ফিরে শেখ মুজিব ওই বছরই ১৯৬৬ সালের ৭ জুনকে ছয় দফা দিবস ঘোষণা করেন এবং ছয় দফা বাস্তবায়নের দাবিতে সারা পূর্ব বাংলায় হরতাল পালনের আহবান জানান।

১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বরে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ লাগিয়ে সামরিক চাপ প্রয়াগরে মাধ্যমে আইউব উৎখাতে ব্যর্থ হয়ে মার্কিন প্রশাসন ছয় দফার মাধ্যমে রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগের লক্ষ্যে মাঠে নামে। আদতে ছয় দফা ছিল এমন একটি ফর্মুলা যাতে পূর্ব পকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের আধিপত্য অবসান ও স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা হয় চমকপ্রদভাবে। পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে আলাদা রাষ্ট্র সৃষ্টির কথা এতে বলা হয় না। "১৯৭০ সালের নির্বাচনের সময় ছয় দফা ছিল একটি আপোসকামী ফর্মুলা। এখন অনেকে অনেক কথা বলেন কিন্তু '৭০-এর নির্বাচনে আমরা আলাদা রাষ্ট্র চাইনি। কিন্তু পাকিস্তানিরা আপোসকামী ফর্মুলায় না গিয়ে গণহত্যা শুরু করে, যার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।"[১০] এবং মার্কিন প্রশাসনও চায়নি পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ নামে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হয়ে উঠুক। তারা মূলত যা চেয়েছিল তা হল, পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানের আধিপত্য অবসান ও স্বায়ত্তশাসনের মতো একটি গণ-আকাঙ্ক্ষিত ইস্যুকে আইউব উৎখাতের পরিকল্পনায় ব্যবহার করতে। কিন্তু ভারতীয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এই আপোসমূলক ফর্মুলাকে নিজ লক্ষ্যে ব্যবহারের পরিকল্পনা নেয়। পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে আলাদা রাষ্ট্র করার লক্ষ্যে সে তার গোপন সংগঠন স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের মাধ্যমে ছাত্র সমাজ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে দ্রুতগতিতে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু করে এবং সাধারণ ছাত্র জনতার নিখাদ দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, সততা ও সংগ্রামী চেতনাকে পর্দার অন্তরালে থেকে সুকৌশলে হাতিয়ার করে লক্ষ সিদ্ধিতে অগ্রসর হয়।

১০. মিজানুর রহমান চৌধুরী : দৈনিক *দিনকাল*, ৬ ডিসেম্বর, ১৯৮৫। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ওপর স্মারক ডাকটিকিট উদ্বোধনকালে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণ।

www.pathagar.com

ছাত্রসমাজে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ভেতর দিয়ে যে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে, ১৯৬৬ সালে ছয় দফা প্রস্তাব পেশ করে শেখ মুজিবর রহমান ধাপে ধাপে সেই বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে চূড়ান্ত শীর্ষে উপনীত করেন এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ পুরুষ হিসেবে তিনি আবির্ভূত হন বটে, কিন্তু ছয় দফার ফাঁদেও আটকে যান। তারই নেতৃত্বের ছায়ায় নিখাদ জাতীয়তাবাদী চেতনায় সিক্ত হয়ে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠা স্বাধীনতাকামী এক দফা পন্থীদের সরাসরি মুখোমুখি হন তিনি—যখন ১৯৭১ সালের ১ মার্চ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত সংক্রান্ত বার্তাটি রাওয়ালপিণ্ডি থেকে পাবার পর শেখ মুজিবকে জানানোর জন্য পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর এস এম আহসান ১৯৭১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় তাকে গভর্নমেন্ট হাউজে ডেকে পাঠান। গভর্নমেন্ট হাউজে গভর্নর আহসান শেখ মুজিবকে রাওয়ালপিন্ডির বার্তাটি জানিয়ে দেন। আলাপ আলোচনা শেষে গভর্নমেন্ট হাউজ থেকে বেরিয়ে আসার আগ মুহূর্তে শেখ মুজিব গভর্নরের সামরিক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীকে বলেন : "আমার অবস্থা দুপাশে আগুন, মাঝখানে আমি দাঁড়িয়ে। হয় সেনাবাহিনী আমাকে মেরে ফেলবে, না হয় আমার দলের ভেতরকার চরমপন্থীরা আমাকে হত্যা করবে। কেন আপনারা আমাকে গ্রেফতার করছেন না? টেলিফোন করলেই আমি চলে আসব।"[১]

শেখ মুজিব যাদেরকে চরমপন্থী বলেছেন তারাই এক দফাপন্থী, তার দলেরই ভেতরকার দ্বিতীয় স্তরের ব্যাপক অংশ— জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ এবং শোষণহীণ সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের ব্যাপক তরুণ সমাজ। এরাই নেয় সশস্ত্র প্রতিরাধ সংগঠনের প্রস্তুতি। তাই আজ এই স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে যারা উচ্চকণ্ঠে বলেন, আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব একাত্তরের সশস্ত্র প্রতিরোধে প্রস্তুতি নিয়েছিল, সেই উচ্চকণ্ঠ নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। কেননা, আওয়ামী লীগের শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যই তাকে সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ থেকে সরিয়ে আনে। মূলত আওয়ামী লীগ ছিল তৎকালীন উদীয়মান বাঙালি ধনিক শ্রেণীর প্রতিনিধি। আর ছয় দফা ছিল সেই উদীয়মান ধনিক শ্রেণীর

---

১. লেখক অনূদিত সিদ্দিক সালিকের *নিয়াজির আত্মসমর্পণের দলিল*, পৃষ্ঠা-৫৬

www.pathagar.com

বিকাশের সনদ। তাই আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের রাজনীতি ছিল ছয় দফার মাধ্যমে ভোট যুদ্ধে জিতে ক্ষমতায় যাওয়া।

আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব সশস্ত্র প্রতিরোধ না চাইলেও দলগত ক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থা তাদের অনুকূলে ছিল না। নানান মতের সমাবেশ ঘটেছিল আওয়ামী লীগের ভেতর। বিভিন্ন মতধারার মাঝে ছিল দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্বের স্পষ্ট প্রকাশ ঘটে পাকিস্তানের সঙ্গে একত্রে থাকার প্রশ্নে। দ্বিতীয় স্তরের ব্যাপক অংশ যাদের নেতৃত্বে ছিল একদল তরুণ, তারা পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাইছিল। পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামো থেকে বেরিয়ে আসার প্রশ্নে এরা ছিল অনমনীয়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই মতধারার অনুসারীরা ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগের ভেতর এমন শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে তাদের পুরোপুরি উপেক্ষা করা আওয়ামী লীগ সর্বোচ্চ নেতৃত্বের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমনকি শেখ মুজিবের পক্ষেও এদের শক্ত ভিত নড়ানো দুষ্কর ছিল। শেখ মুজিব কথিত এই চরমপন্থীরা ছাত্র লীগের অভ্যন্তরে সংগঠিত হয় স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের গোপন নেতৃত্বে। যদিও ভারতীয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা পরিচালিত চিত্তরঞ্জন সুতার ও কালিদাস বৈদ্যের স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের তৎপরতা শুরু হয় ১৯৬২ সালে, ছাত্রসমাজের মধ্যে এই সংগঠনটি গড়ে ওঠে ১৯৬৪ সালে। ওই বছর জুলাই মাসে আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের অভ্যন্তরে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ মূলত গঠিত হয় সিরাজুল আলম খানের[২] নেতৃত্বে। তিনি তখন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক। আবদুর রাজ্জাক[৩] তখন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সহ-সাধারণ সম্পাদক। তাকে এবং তৎকালীন ছাত্রলীগের অন্যতম নেতা কাজী আরেফ আহমেদকে[৪] নিয়ে গঠিত হয় স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের তিন সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় সেল। স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের কেন্দ্রীয় সেল তৈরি সম্পর্কে আবদুর রাজ্জাক আমাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন :"তিনি (সিরাজুল আলম খান) প্রস্তাবটি প্রথম উত্থাপন করেন। বলেন, এস আমরা একটা কিছু করি। আমরা আলাপ-আলোচনা করতাম ইকবাল হলের[৫] মাঠে বসে। তো সেখানেই আমাদের মধ্যে আলাপ হত যে, সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া স্বাধীনতা আসবে না। সেইজন্য আমরা নিজেদেরকে সংগঠিত করি। এই চিন্তা নিয়ে আমরা শুরু করি এবং চিন্তা-ভাবনা করি পরবর্তী লোক কাকে নেব। ঠিক করি কাজী আরেফকে আমরা সঙ্গে নিতে পারি। কাজী আরেফের সঙ্গে আগেই তার (সিরাজুল আলম খান) আলাপ হয়েছিল। অবশেষে তাকে নিয়ে নেয়া হয়।" তিনজনের এই কমিটি গোপনে স্বাধীনতার লক্ষ্যকে সামনে

---

২. পরবর্তীতে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের নেতা, এ দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং স্বাধীনতা যুদ্ধকালে মুজিব বাহিনী নেতা চতুষ্টয়ের অন্যতম।

৩. পরবর্তীতে শেখ মুজিবের সময় জাতীয় সংসদ সদস্য। শেখ মুজিবের মৃত্যুর পর বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মুজিব বাহিনী নেতা চতুষ্ঠয়ের অন্যতম।

৪. পরবর্তীতে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের নেতা।

৫. পরবর্তীতে সার্জেন্ট জহুরুল হক হল।

www.pathagar.com

রেখে কাজ শুরু করে। কমিটি তার আরম্ভকাল থেকে স্বাধীনতার আগ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের ছত্রছায়ায় কাজ করে এসেছে বলে এর অস্তিত্ব লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে যায়। আর এ কারণেই পাকিস্তান কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এ সংগঠনের খবরা-খবর কিছুই জানতে পায়নি। অবশ্য চিত্তরঞ্জন সুতার ও কালিদাস বৈদ্যের স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের খবর তাদের অজানা ছিল না।

স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ কেন্দ্রীয় সেলের তিন সদস্য নিজেদের মধ্যে কাজ ভাগ করে নেন এইভাবে, সিরাজুল আলম খান, শ্রমিক ফ্রন্ট; আবদুর রাজ্জাক,—শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের মধ্যে যোগাযোগ এবং কাজী আরেফ আহমেদ,—ছাত্রফ্রন্ট ও ছাত্রলীগ। কেন্দ্রীয় সেল কর্মী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ধাপে ধাপে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং কাজ শুরু করে দেয় স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। কাজে নামার পরই তাদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চেতনা বিকাশ লাভ করে ধীরে ধীরে। অবশ্যি মুজিব বাহিনী নেতা চতুষ্টয়ের অন্যতম তোফায়েল আহমদ স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করেছেন। আমাকে দেয়া ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন :"স্বাধীন বাংলা পরিষদ নামে কোন কিছুই গঠন করা হয় নি।...যারা এ সম্পর্কে ইন্টারভিউ দিয়েছেন তারা ছাড়া এদেশের কেউই এই সংগঠনটির অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছুই জানতেন না।" তোফায়েল আহমদ কেন, মুজিব বাহিনী নেতা চতুষ্টয়ের আরেকজন শেখ ফজলুল হক মণি,— তিনিও জানতেন না এ সংগঠনটির খবর। কারণ, তাদেরকে আস্থায় আনতে পারেন নি স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ নেতৃবৃন্দ। আবদুর রাজ্জাক যিনি ছিলেন মুজিব বাহিনী নেতা চতুষ্টয়ের অন্যতম, আমাকে বলেন : "না, জানতেন না। জানানো হয়নি। ...কেননা, এটা তো আমাদের সংগঠন ছিল, গোপন সংগঠন। তাদের সঙ্গে আমরা আলাপ করিনি বিভিন্ন কারণে। যেমন শেখ ফজলুল হক মণি ও সিরাজুল আলম খানের মধ্যে একটা ঠাণ্ডা লড়াই ছিল। সেটা অতীত থেকে চলে আসছিল। তোফায়েল আহমদের তখনো অতোটা পরিপক্বতা আসেনি।" আবদুর রাজ্জাক যে কথা অনুক্ত রেখেছেন, তা হলো, শেখ ফজলুল হক মণি ও তোফায়েল আহমদকে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি মতাদর্শগত কারণে। মতাদর্শগত বিরোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে ১৯৭০ সালের অগাস্ট মাসে,—যখন ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটি স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশের প্রস্তাব গ্রহণ করে। শেখ মুজিব এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। শেখ ফজলুল হক মণি ও তোফায়েল আহমদ শেখ মুজিবকেই সমর্থন করেন।

১৯৬৪ সালের জুলাই মাসে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ গঠনকালে কেন্দ্রীয় সেলের লক্ষ্য ছিল সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার। কর্মী সংগ্রহে নেমে কেন্দ্রীয় সেলকে প্রথম যে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় – সেটা হল, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের পর কি হবে? শুধু পতাকা বদলে সাধারণ মানুষের ভাগ্যে পরিবর্তন ঘটতে পারে না। পাকিস্তানি একচেটিয়া পুঁজির শোষণ ও নিপীড়ন উৎখাত করে বাঙালি পুঁজির শোষণ ও নির্যাতনকে বহাল করার জন্য অযুত প্রাণের বলিদান হতে পারে না। পাকিস্তানি শাসন ও শোষণের চব্বিশ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকেই

www.pathagar.com

এ প্রশ্নটি ওঠে আসে কর্মীদের সামনে। আর এ প্রশ্নই স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের কর্মকাণ্ডে নতুন মাত্রা যুক্ত করে ও শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক বাংলা চেতনার উন্মেষ ঘটায়। এবং যে সময় থেকে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক বাংলার পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ, তখন থেকেই তার কর্মী সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় এক গুণগত পরিবর্তন সূচিত হয়। তীব্র স্বদেশ প্রেম উদ্বুদ্ধ এবং শোষণমুক্ত বাংলার স্বপ্নে লালিত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের একাংশের অমিততেজা তরুণরা এর পতাকাতলে এসে সমবেত হতে থাকে। কেন্দ্রীয় সেল সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের দীক্ষা দিতে থাকে এই তরুণদের।

এ কথা এখানে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় যে, ১৯৬৮–১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের আগ পর্যন্ত স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের বিস্তৃতি তেমন ব্যাপক হতে পারেনি। সশস্ত্র যুদ্ধের প্রোগ্রাম থাকলেও অস্ত্র সংগ্রহ ও ট্রেনিংয়ের বিষয়টি তেমন জরুরি হয়ে ওঠেনি তখনো। এ বিষয়টি আসে আরো পরে। অথচ স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের নেতা কাজী আরেফ ছাত্রলীগের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে ১৯৮৯ সালের ১৪ এপ্রিলের পাক্ষিক *তারকালোকে* বলেন :'৬৫ সালে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের ৪০ জন সদস্যকে বিদেশে সামরিক ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই ৪০ জন সদস্যকে নির্বাচিত করে ইন্দোনেশিয়ায় পাঠাবার কথা ছিল। এ ব্যবস্থা শেখ মুজিব আমাদের কর্মীদের জন্য করেছিলেন। এই ৪০ জন সদস্যকে পাঠানোর সমস্ত প্রস্তুতি শেষ হয়েছিল। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই ইন্দোনেশিয়ায় ক্ষমতার পট পরিবর্তন ঘটেছিল। সুকার্নোকে ক্ষমতাচ্যুত করে সুহার্তো ক্ষমতা দখল করে। তাই ট্রেনিংয়ে পাঠানো বন্ধ করে দেওয়া হয়। সম্ভবত শেখ মুজিব সে সময় জাকার্তায় নিযুক্ত বাঙালি কূটনীতিক শামসুর রহমান খানকে দিয়ে ব্যবস্থা করেছিলেন।" কাজী আরেফ বর্ণিত কূটনীতিক হলেন সিএসপি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী শামসুর রহমান খান। তার সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলি। তিনি আমাকে দেয়া ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে বলেন : "১৯৬৫ সালে জাকার্তায় আমি ছিলাম না। জাকার্তায় যাই ১৯৬৭ সালে ইন্দোনেশিয়া-পাকিস্তান ইকনমিক কালচারাল কো-অপারেশনের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল হয়ে, কূটনীতিক হিসেবে নয়।"

ওই বছর ইন্দোনেশিয়া-পাকিস্তান ইকনমিক কালাচারাল কো-অপারেশন নামে দু'দেশ বন্ধুত্ব ও সহযোগিতামূলক একটি সংস্থা গঠন করে। সংস্থার বিধিবদ্ধ গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রথম তিন বছরের জন্য সেক্রেটারি জেনারেল হবে ইন্দোনেশিয়া এবং পরের তিন বছর হবে পাকিস্তান। পাকিস্তান সরকার শামসুর রহমান খানকে ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল করে পাঠায়।

তাছাড়া ১৯৬৯ সালের আগ পর্যন্ত শেখ মুজিব স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের অস্তিত্বের কথা জানতেন না। তাকে জানানো হয়নি। আবদুর রাজ্জাক বলেন : "১৯৬৯ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান আইউবের জেল থেকে বেরিয়ে এলে আমি আর সিরাজুল আলম খান

www.pathagar.com

তার সঙ্গে দেখা করি। আমাদের পরিকল্পনা তাকে খুলে বলি। স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের অস্তিত্বের কথা তখনই তাকে জানাই। তাকে বলি আপনি আমাদের সর্বাধিনায়ক।" অতএব, এটা পরিষ্কার যে শেখ মুজিব ১৯৬৫ সালে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের অস্তিত্বের কথা জানতেনই না। সুতরাং ইন্দোনেশিয়ায় সামরিক ট্রেনিংয়ের জন্য শেখ মুজিব লোক পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলেন বলে কাজী আরেফ যে কথা বলেছেন, সেটা তার মনগড়া। তাছাড়া, সে সময় ইন্দোনেশিয়া এবং পাকিস্তানের মধ্যে যে বন্ধুতা বিরাজমান ছিল তার প্রেক্ষিতে বলতেই হয়, তৎকালীন প্রেসিডেন্ট সুকার্নো ইন্দোনেশিয়ার মাটিতে পাকিস্তান ভাঙার জন্য পূর্ব পাকিস্তানি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণদানের অনুমতি দেবেন, এ কোনভাবেই বিশ্বাস্য নয়।

১৯৬৪ সালে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ *বিপ্লবী বাংলা* নামে সাইক্লোস্টাইল করা একটি গোপন পত্রিকা বের করে। পরপর তিনটি সংখ্যা বের করার পর এটি বন্ধ হয়ে যায়। এরপর তারা আর কোন পত্রিকা বের করেনি। কিন্তু কর্মী সংগ্রহের কাজ চলতে থাকে।

১৯৬৬ সালে শেখ মুজিব ছয় দফা প্রস্তাব উত্থাপন করলে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ তার লক্ষ্য স্থির করে ফেলে। তারা ছয় দফাকে এক দফায় পরিণত করার তৎপরতায় নেমে পড়ে। কিন্তু ১৯৬৮-১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের আগ পর্যন্ত তাদের তেমন অগ্রগতি সাধিত হয় না। গণআন্দোলনের সময়কালেই পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের ব্যাপক অংশ স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের নেতৃত্বাধীনে চলে আসে।

স্বাধীনতার পক্ষে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের ব্যাপক অংশের ঝুঁকে পড়া স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের নিরবচ্ছিন্ন কর্মতৎপরতার ফল যদিও, কিন্তু সংগঠন বহির্ভূত রাজনৈতিক প্রভাব স্বাধীনতার প্রতি তাদের ঝুঁকে পড়ায় গতি সঞ্চার করে। এ বক্তব্যকে আরো পরিষ্কার করে বলা যায় এইভাবে, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের যে তরুণদের মনে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রশ্নে দোদুল্যমানতা ছিল, সংগঠন বহির্ভূত রাজনৈতিক প্রভাব, বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ১৯৬৮-৬৯ সালের গণআন্দোলনের তোড় তাদের চিন্তা-চেতনাকে প্রভাবিত করে।

www.pathagar.com

১৯৬৮-১৯৬৯ সালের গণআন্দোলন ও স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৬৮-১৯৬৯ সালে গণআন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (পিকিংপন্থী) সভাপতি মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। ১৯৬৮ সালের ২৮ নভেম্বরে পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (পিকিং), কৃষক সমিতি ও শ্রমিক ফেডারেশনের এক যৌথসভায় ৬ ডিসেম্বরকে জুলুম প্রতিরোধ দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। এবং ওই ৬ ডিসেম্বরেই পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় মাওলানা ভাসানী বলেন : "পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি মানিয়া না লইলে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীন পূর্ব বাংলা গঠন করিবে।"[১] পল্টনের ওই জনসভায় জুলুম প্রতিরোধে পর দিন ৭ ডিসেম্বর ঢাকায় হরতাল আহবান করা হয়। ওই দিনে পুলিশের গুলিতে তিন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে এবং আন্দোলন রুদ্রমূর্তি ধারণ করে। দিনে দিনে তা ছড়িয়ে পড়তে থাকে শহর-বন্দর-গঞ্জে। ১৯৬৯ সালের ৮ জানুয়ারির আগ পর্যন্ত তৎকালীন পাকিস্তানের দক্ষিণপন্থী বিরোধী দলগুলো, ছয় দফাপন্থী আওয়ামী লীগ ও মস্কোপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে অংশ নেয় না। অংশ নেয়া শুরু করে ওই তারিখ থেকে অর্থাৎ ৮ জানুয়ারিতে ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি সংক্ষেপে 'ডাক' গঠনের মধ্য দিয়ে। ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটির (ডাক) শরীকদল ছিল নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, (ছয় দফা) জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মস্কো), পিপলস ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টের (পি.ডি.এম.) অঙ্গদল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লীগ, পাকিস্তান জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, নেজামে ইসলাম পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী।[২] ৬ ডিসেম্বর ১৯৬৮ সালে সূচিত আইউব বিরোধী আন্দোলনে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী দলমত নির্বিশেষে সকলকে অংশগ্রহণের আহবান জানালেও ছয় দফাপন্থী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সে আহবান পাশ কাটিয়ে যায়। ২৮ ডিসেম্বর ১৯৬৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের (ছয়দফা) তৎকালীন অস্থায়ী সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এক বিবৃতিতে বলেন :"নির্যাতনের বিরুদ্ধে ও স্বৈরাচারী

১. দৈনিক *সংবাদ*; ৭ ডিসেম্বর ১৯৬৮

২. প্রাগুক্ত : ৯ জানুয়ারি, ১৯৬৯।

www.pathagar.com

শাসনের অবসানকল্পে ঐক্যবদ্ধ বৃহত্তর আন্দোলনে শরীক হইবার জন্য পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সকল বিরোধী রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতি তিনি আহবান জানাইয়াছেন। ... তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের কতিপয় নেতা ছয়দফা আন্দোলনের বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করিয়াছেন এবং তাহারা আওয়ামী লীগের সহিত ঐক্যবদ্ধ হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে।"[৩] তৎকালীন বিরোধী দলগুলোর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ সত্ত্বেও আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে মওলানা ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (পিকিং) সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ না হয়ে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ (ছয়দফা) ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিসহ (মস্কো) সকল দক্ষিণপন্থী দলসমূহের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধে ৮ জানুয়ারি, ১৯৬৯ সালে ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি (ডাক) গঠনের মধ্য দিয়ে।

মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে সহজভাবে নিতে পারেনি কোন দক্ষিণপন্থী দলই। নিতে পারেনি তৎকালীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিও (মস্কো)।[৪] ৬ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (মস্কো) কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির পঞ্চম দিনের বৈঠকে গ্রহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবগুলোর একটিতে আন্দোলনরত মাওলানা ভাসানী এবং তার দল অভ্যন্তরের পিকিংপন্থী কমিউনিস্টদের কটাক্ষ করে বলা হয় : "দলীয় অহংকার বা সঙ্কীর্ণতা, উগ্র হঠকারিতা ও একলা চলার মনোভাব আন্দোলনের অন্তরায়।"[৫] অথচ, এই কটাক্ষ সত্ত্বেও পরিস্থিতি তখন এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়, সেখানে শুধু মৌখিক নয় কায়িকভাবে আন্দোলনে অংশ নেয়া ছাড়া তাদের আর কোন বিকল্প থাকে না। কেননা, ইতোমধ্যে ৪ জানুয়ারি ১৯৬৯ সালে ছাত্র সংগ্রাম কমিটি তাদের এগার দফা দাবি পেশ করে আন্দোলনে নতুন মাত্রা এনে দেয়। ১২.৪০ মিনিট তাই পরিস্থিতিকে নিজেদের নাগালে আনার লক্ষ্যেই মস্কোপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, ছয় দফাপন্থী আওয়ামী লীগ এবং আর দক্ষিণপন্থী বিরোধী দলগুলো ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি (ডাক) গঠন করে। ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটিতে (ডাক) যোগদানের প্রশ্নে ছয় দফাপন্থী আওয়ামী লীগ যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্তির দাবি জানায় সেগুলো হল : সার্বজনীন ভোটাধিকার, ফেডারেল পদ্ধতির পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা, শেখ মুজিব, ওয়ালী খান, জুলফিকার আলী ভুট্টো, তাজউদ্দিনসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি, ট্রাইবুনালে উত্থাপিত সকল মামলা ও গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রত্যাহার ও প্রত্যক্ষ নির্বাচন।[৬] মস্কোপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এবং অন্যান্য দক্ষিণপন্থী দলগুলো ছয় দফাপন্থী আওয়ামী লীগের প্রস্তাব ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটির দাবির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে। ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটিতে যোগদানের প্রশ্নে ছয় দফাপন্থী আওয়ামী

---

৩. দৈনিক *আজাদ* : ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৬৮।

৪. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ওই সময় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (মস্কোপন্থী) অভ্যন্তরে থেকে কাজ করতো।

৫. দৈনিক *সংবাদ* : ৭ জানুয়ারি, ১৯৬৯।

৬. দৈনিক *আজাদ* : ৮ জানুয়ারি, ১৯৬৯।

www.pathagar.com

লীগের প্রস্তাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিষয়টি আসেনি। ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটির প্রস্তাবেও স্বাধীনতার কথা ছিল না।

পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (পিকিং) সভাপতি মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এককভাবে ১৯৬৮ সালের ৬ ডিসেম্বর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যে আইউব বিরোধী আন্দোলন শুরু করেন, তার এক মাস দুদিনের মাথায় অর্থাৎ ১৯৬৯ সালের ৮ জানুয়ারিতে মস্কোপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এবং ছয় দফাপন্থী আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য দক্ষিণপন্থী দলগুলোর সক্রিয় অংশগ্রহণে তা সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের রূপ নেয়। কেবল পূর্ব পাকিস্তানেই নয়, তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানেও সৃষ্টি হয় বাঁধ ভাঙা জোয়ার। আদতে পশ্চিম পাকিস্তানে আইউব বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত করেন জুলফিকার আলী ভূট্টো ১৯৬৭ সালের ১ ডিসেম্বরে পিপলস পার্টি গঠনের মধ্য দিয়ে তাসখন্দ চুক্তিকে বিষয় করে।

১৯৬৮ সালের ৬ ডিসেম্বর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (পিকিং) সভাপতি মাওলানা ভাসানী পূর্ব পাকিস্তানে যে গণআন্দোলন শুরু করেন এবং একক নেতৃত্বে তাকে টেনে নিয়ে যান পুরো মাস, সৃষ্টি করেন সারা পূর্ব বাংলা জুড়ে এক প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া আর পশ্চিম পাকিস্তানে যার সূত্রপাত ঘটান জুলফিকার আলী ভুট্টো। সেই আন্দোলনের তোড়ে কেঁপে ওঠে আইউবের দশ বছরের পোক্ত সিংহাসন। শেখ মুজিবুর রহমানকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে অব্যাহতি দিতে বাধ্য হন তিনি। ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব বেরিয়ে আসেন আইউবের জেল থেকে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা হয় প্রত্যাহৃত। শেষ পর্যন্ত আইউব খানকেও নিতে হয় বিদায়। ২৬ মার্চ ১৯৬৯ সালে শাসন ক্ষমতা দখল করেন পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান।

৬ জানুয়ারি ১৯৬৯ সালে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মস্কো) কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির পঞ্চম দিনের বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (পিকিং) যাদেরকে "উগ্র হঠকারী" বলা হয়, তারাই হলো বামপন্থী স্বাধীনতাকামী। এরাই ওই সময় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (পিকিং) ভেতর থেকে স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার শ্লোগান তোলে। বাইরের এই প্রভাব পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের ভেতরে স্বাধীনতার পক্ষে দ্রুত মেরুকরণ ঘটাতে থাকে। এর অভ্যন্তরে ১৯৬৪ সাল থেকে স্বাধীনতার পক্ষে সক্রিয় স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের তৎপরতাকে এক ধাক্কায় এ সময় যে পরিমাণ এগিয়ে দেয়— শুরুর কাল থেকে অর্থাৎ ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৬৮ সালের নভেম্বর পর্যন্ত পাঁচ বছরে তার এক-চতুর্থাংশও এগোতে পারেনি এই সংগঠনটি। কেননা, এই সময় থেকেই সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে স্বাধীনতার পক্ষে বক্তব্য রাখতে থাকে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (পিকিং) ভেতরকার বামপন্থীরা। স্বাধীনতার পক্ষে তাদের উচ্চকিত শ্লোগান পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের অভ্যন্তরে বড় রকমের গুণগত পরিবর্তন এনে দেয়। জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ তেজোদীপ্ত তরুণরা দলে দলে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের পতাকাতলে এস জড়ো হতে থাকে। অবশ্যি ন্যাশনাল

www.pathagar.com

আওয়ামী পার্টির (পিকিং) ভেতরকার বামপন্থীরা সর্বপ্রথম ১৯৬৯ সালেই স্বাধীনতার পক্ষে আওয়াজ তোলে। এর আগে ওই পার্টির অভ্যন্তরের কোন বামপন্থী দল বা উপদলের কর্মসূচিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা আসেনি।

১৯৬৮ সালের ৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (পিকিং) সভাপতি মাওলানা ভাসানী পল্টন ময়দানের জনসভায় স্বাধীন পূর্ব বাংলার কথা বললেও মাত্র তার পাঁচদিন আগে সিরাজ শিকদারের নেতৃত্বাধীন পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টির শ্রমিক সংগঠন পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন ১৯৬৮ সালের ১ ডিসেম্বর স্বাধীনতার আহবান সংবলিত শ্রমিক আন্দোলনের থিসিস প্রকাশ করে।[৭] ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (পিকিং) অভ্যন্তরে কাজী জাফর আহমদ[৮] হায়দার আকবর খান রনো[৯] ও রাশেদ খান মেননের[১০] নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি স্বাধীন পূর্ব বাংলার কর্মসূচি সংবলিত একটি প্রচারপত্র বিলি করে ১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাসে। ওই প্রচারপত্রে বলা হয় : "সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বৃহৎ পুঁজির প্রতিভূ, এককেন্দ্রীক স্বৈরাচারী সমরবাদী শাসকগোষ্ঠীকে পূর্ব বাংলার বুক হইতে উচ্ছেদ করিয়া একমাত্র স্বাধীন সার্বভৌম জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা কায়েমের মাধ্যমে শোষিত, বঞ্চিত জনতার মুক্তি সম্ভব।"[১১]

দিনে দিনে স্বাধীনতার শ্লোগান যেভাবে উচ্চকিত হয়ে উঠছিল, তার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য ক্ষমতায় এসে ইয়াহিয়া খান সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অবাধ সাধারণ নির্বাচন দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর এক বেতার ও টিভি ভাষণে ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। কিন্তু নির্বাচনের আগে এক প্রলয়ঙ্করী বন্যার তোড় বিপর্যস্ত করে দেয় পূর্ব বাংলার জনজীবন। সাধারণ নির্বাচন পিছিয়ে নেয়া হয় ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিসহ (ভাসানী) সকল দলই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু নিজ দলের ভেতরকার বামপন্থীদের প্রবল চাপের মুখে পড়েন মাওলানা ভাসানী। তারা নির্বাচন বয়কটের দাবি তোলে। বামপন্থীরা এই বলে তার ওপর চাপ সৃষ্টি করে যে, ব্যালটের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার মেহনতি জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন আনা যাবে না এবং তা সম্ভব কেবল সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে। এ লক্ষ্যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন[১২] ১৯৭০ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার

---

৭. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র* : দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৭৭-৮৪

৮. স্বাধীনতার পর প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শিক্ষামন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট এরশাদ সরকারের প্রধানমন্ত্রী।

৯. স্বাধীনতার পর ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা।

১০. প্রাগুক্ত।

১১. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র* : দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৭।

১২. এই ছাত্র সংগঠনটি মেনন গ্রুপ নামে পরিচিত ছিল। এদেরকে পিকিংপন্থী ছাত্র সংগঠন বলা হতো।

www.pathagar.com

লক্ষ্যে ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭০ সালে পল্টনের জনসভায় তা পঠিত ও গৃহীত হয়। এই ঘোষণার প্রেক্ষিতে সামরিক আদালত কাজী জাফর আহমদ ও রাশেদ খান মেননকে সাত বছর করে আর মোস্তফা জামাল হায়দার[১৩] ও মাহবুব উল্লাহকে[১৪] এক বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড দেয়।[১৫]

আওয়ামী লীগ ছয় দফা নিয়ে নির্বাচনী মাঠে নামে। দলের ছাত্র সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের প্রতিটি তরুণ নেমে পড়ে নির্বাচনী প্রচারে। তবে ইতোমধ্যে ছাত্রলীগ নেতৃত্ব এবং কর্মীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এসে যায় স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের নেতৃত্বাধীন। নির্বাচনী প্রচারকে তারা জনগণের দোরগোড়ায় নিজেদেরকে নিয়ে যাবার সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে এবং ছয় দফার আড়ালে এক দফার সংগ্রাম অর্থাৎ স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে জোরদার করার কাজে নেমে পড়ে। ওই বছর অর্থাৎ ১৯৭০ সালর ১৫ ফেব্রুয়ারি স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের তিন নেতা সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও কাজী আরেফ আহমেদ তাদের ৬ বছরের গোপন তৎপরতার অর্জিত সাফল্যের প্রকাশ্য প্রদর্শনীতে নামার সিদ্ধান্ত নেন।

১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হক বন্দি দশায় ঢাকা সেনানিবাসের কয়েদ খানায় সেনাবাহিনীর সদস্যের গুলিতে নিহত হন। স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের কেন্দ্রীয় সেল ১৯৭০ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হকের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্ত কার্যকর করার দায়িত্ব অর্পিত হয় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির একাংশের ওপর। এই অংশের নেতৃত্বে ছিলেন স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের ছাত্র নেতৃত্ব। স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ কেন্দ্রীয় সেল এবং ছাত্র নেতৃত্ব মার্চ মিছিল বের করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মার্চ মিছিলকারীদের নামকরণ করা হয় "১৫ই ফেব্রুয়ারি বাহিনী।"

ওই সময় ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন নূরে আলম সিদ্দিকী। তাকে "১৫ই ফেব্রুয়ারি বাহিনী এবং মার্চ মিছিল সম্পর্কে কিছুই জানানো হয় না। জানানো হয় না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়ন (ডাকসু) সহসভাপতি আ. স. ম. আবদুল রব ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস মাখনকেও। তখন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন শাহজাহান সিরাজ।[১৬] তাকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করা হয়। এমনকি এক সময়কার ছাত্রলীগ নেতা এবং মুজিব বাহিনী নেতা চতুষ্টয়ের অন্যতম শেখ ফজলুল হক মণিকে "১৫ ফেব্রুয়ারি বাহিনী" এবং মার্চ মিছিল সম্পর্কে জানানো হয় না। এ বিষয়ে জানতেন না তিনি কিছুই।

---

১৩. পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্ট এরশাদ সরকারের মন্ত্রী।

১৪. পরবর্তীকালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। তিনি ওই সময় পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির (আলাউদ্দিন-মতিন) প্রভাবাধীন ছিলেন।

১৫. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র* : দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৯০-২।

১৬. পরবর্তীতে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (সিরাজ) সভাপতি।

www.pathagar.com

শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হকের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী মার্চ মিছিলে "১৫ ফেব্রুয়ারি বাহিনীর" নেতৃত্ব দেন তৎকালীন নগর ছাত্রলীগ সভাপতি মফিজুর রহমান খান। বাহিনীর উপনেতৃত্বে ছিলেন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক হাসানুল হক ইনু।[১৭] তৎকালীন ছাত্রলীগ নেত্রী শেখ হাসিনাও[১৮] ছিলেন মিছিলের নেতৃত্বে। শেখ হাসিনাকে মিছিলে সামিল করানো হয় এই ধারণা দেয়ার জন্যে যে "১৫ ফেব্রুয়ারি বাহিনীর" মার্চ মিছিলের প্রতি আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানের প্রচ্ছন্ন সমর্থন রয়েছে। অবশ্যি শেখ মুজিবকে মার্চ মিছিলের সিদ্ধান্তটি জানানো হয়। তিনি সমর্থন বা অসমর্থন সুচক কোন মনোভাবই দেখান নি। যদিও তিনি স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের কর্মধারা ও লক্ষ্য সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন।

মূলত শেখ মুজিবের ভাবমূর্তিকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের নেতারা। তাছাড়া তার বিশাল ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার করে তাদের পক্ষে স্বতন্ত্রভাবে টিকে থাকাও সম্ভব ছিল না। আরেকটি বিষয় তারা সম্ভবত অনুধাবন করতে পারেন যে শেখ মুজিবের কাছ থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলনের পক্ষে সমর্থন পাওয়া যাবে না। কেননা, তার অসমর্থনসূচক মনোভাবের পরিচয় তারা পান ওই বছরই—১৯৭০ সালের আগস্ট মাসে। তাই স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের ত্রয়ী নেতৃত্ব স্বতন্ত্রভাবে আত্মপ্রকাশ করতে চাননি বিপাক এড়াতে এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কাজ করে গেছেন একনিষ্ঠ গোপনীয়তার আড়ালে। আর এই কারণেই স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের কায়িক অস্তিত্বের কথা জানতে পায় নি পাকিস্তান কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। জানতে পায়নি স্বাধীনতার আগ পর্যন্ত কেউই।

"১৫ ফেব্রুয়ারি বাহিনী" গঠন করার পর স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদকে যে বিষয়টির মুখোমুখি এনে দাঁড় করায়— সেটা ট্রেনিং। কিন্তু প্রশিক্ষণ প্রদানের উপযুক্ত ছিল না এই বাহিনী। স্বাধীনতার জন্য নিবেদিত প্রাণ কর্মীর যেমন ছিল অভাব তেমন ছিল দোদুল্যমানতা। তাই নতুন বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য হয়ে ওঠে এবং দরকার পড়ে অধিকতর গোপনীয়তার।

১৯৭০ সালের ৭ জুন ছয় দফা দিবসকে সামনে রেখে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ নতুন বাহিনী গঠনের তৎপরতা শুরু করে এবং অধিকতর সংগ্রামী চেতনায় পুষ্ট একটি বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। ওই বাহিনীর নামকরণ করা হয় "জয়বাংলা বাহিনী।" ওই দিনে আওয়ামী লীগের শ্রমিক সংগঠন শ্রমিক লীগ পল্টন ময়দানে শেখ মুজিবকে অভিবাদন দেবার কর্মসূচি গ্রহণ করে। স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ ছাত্রলীগের মাধ্যমে তাকে গার্ড অব অনার প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়। ইতোমধ্যে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগে প্রায় একাধিপত্য অর্জন করে ফেলে। ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র

১৭. পরবর্তীকালে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (ইনু) সাধারণ সম্পাদক।

১৮. পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী।

www.pathagar.com

ইউনিয়নের (ডাকসু) সহসভাপতি আ স ম আবদুর রব[১৯] স্বাধীনতার প্রেরণায় সিক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের ছাত্রফ্রন্টের নেতৃত্বে এসে যান। সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ৭ জুনে "জয়বাংলা বাহিনী" শহীদ মিনার থেকে পূর্ণ সামরিক কায়দায় যাবে পল্টন ময়দানে। সেখানে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ ও ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের মাঝে মঞ্চে দণ্ডায়মান শেখ মুজিবকে জানাবে অভিবাদন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মার্চ মিছিলের নেতৃত্ব দেবেন আ স ম আবদুর রব ও হাসানুল হক ইনু। স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয় না পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের তৎকালীন সভাপতি নুরে আলম সিদ্দিকী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়নের (ডাকসু) সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস মাখনকে। কেননা, আগাগোড়াই তারা স্বাধীন বাংলাদেশের বিরোধিতা করে এসেছেন। তাদের বিরোধিতার বিষয়টি আমরা পরে দেখতে পাব।

৭ জুনকে সামনে রেখে "জয়বাংলা বাহিনী" গঠন এবং মার্চ মিছিল সংক্রান্ত সিদ্ধান্তটি স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ শেখ মুজিবকে অবহিত করে। কিন্তু তার হাতে "জয়বাংলা বাহিনী"র পতাকা (পরবর্তীতে যা স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকায় পরিণত হয়) তুলে দেয়া হবে, সে সম্পর্কে কোন কিছুই বলা হয় না। আসলে পতাকাটি একটি আকস্মিক সিদ্ধান্তের ফসল।

৬ জুন রাতে ইকবাল হলের[২০] ১১৮ নম্বর কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় একটি আলোচনা সভা। তাতে উপস্থিত ছিলেন কাজী আরেফ আহমেদ, শাহজাহান সিরাজ, আ স ম আবদুর রব ও মনিরুল ইসলাম (মার্শাল মণি)[২১] এরা সবাই ছিলেন স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের সদস্য। সভায় শেখ মুজিবকে পতাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পতাকার ডিজাইন কেমন হবে এবং তার যৌক্তিকতা তুলে ধরে বক্তব্য রাখা হয়। সবুজের ভেতর লাল সূর্য হচ্ছে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রতীক। রক্তবর্ণ সূর্যের মাঝে বাংলাদেশের মানচিত্র বসিয়ে দেয়ার যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয় এইভাবে যে, এই আন্দোলনের সঙ্গে পশ্চিম বাংলা কিংবা ভারতের সঙ্গে কোন যোগসূত্র নেই। অথবা যুক্তবাংলা আন্দোলনের সঙ্গেও এর কোন সংশ্রব নেই। আলোচনা চলাকালীন হাসানুল হক ইনু ছিলেন পাশের রুমে। তাকে ডেকে আনা হয় এবং তার ওপর পতাকার ডিজাইন তৈরি এবং বানিয়ে আনার দায়িত্ব অর্পিত হয়। ওই দিন সকালে কুমিল্লার তৎকালীন ছাত্রলীগ নেতা শিব নারায়ণ দাস এসে উঠেছিলেন ইকবাল হলে। তিনিও ছিলেন স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের সদস্য। তার আসাটা ছিল নিতান্তই কাকতালীয়। শিব নারায়ণ দাস আঁকতে-জুকতে পারতেন ভাল। হাসানুল হক ইনু তার সাহায্য চান। তিনি সাদা কাগজের ওপর পতাকার নক্সা এঁকে দেন। এরপরের কাজ দর্জির কাছে যাওয়া।

---

১৯. পরবর্তীকালে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (রব) সভাপতি এবং প্রেসিডেন্ট এরশাদের আমলে জাতীয় সংসদের বিরোধীদলের নেতা।

২০. পরবর্তীকালে সার্জেন্ট জহুরুল হক হল।

২১. পরবর্তীকালে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (ইনু) শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি।

www.pathagar.com

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় অফিস ৪২, বলাকা ভবনের লাগোয়া কক্ষ ছিল 'নিউ পাক ফ্যাশান টেইলার্স।' এই সূত্রেই দোকানের ম্যানেজার মোহাম্মদ নাসিরউল্লাহর সঙ্গে ছাত্রলীগ নেতা ও কর্মীদের পরিচয়। এই টেইলারিং শপ থেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের নেতারা তাদের পরিধেয় তৈরি করিয়ে নিতেন। দোকানটির মালিক ছিলেন মোহাম্মদ নাসিরউল্লাহর ভগ্নীপতি মোহাম্মদ হাসেম। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর তারা পশ্চিম বাংলার কলকাতা থেকে চলে আসেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে। এই 'নিউ পাক ফ্যাশান টেইলার্স' থেকেই তৈরি হয় "জয়বাংলা বাহিনী" তথা স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পতাকাটি। ১-১৪ এপ্রিল, ১৯৮৯ সালের পাক্ষিক *তারকালোক*-এ স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের অন্যতম নেতা কাজী আরেফ আহমেদ 'ছাত্রলীগের তিন দশকের ইতিহাস লিখতে গিয়ে পতাকা তৈরি করেন যে দর্জি, তার পরিচিতি সম্পর্কে বলেছেন "যে দর্জি এই পতাকা তৈরি করে, সে অবাঙালি ছিল। সে তখন এই পতাকার ইতিবৃত্ত না জেনেই পতাকা তৈরি করেছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর ওই দর্জি পাকিস্তানে চলে যায়।"

কাজী আরেফ আহমেদের বক্তব্যকে বানোয়াট কাহিনী বলা ছাড়া উপায় নেই। কেননা, নাসিরউল্লাহ এবং পতাকার কাটিং ও সেলাই যিনি করেন, আবদুল খালেক মোহাম্মদী, দু'জনের কেউই অবাঙালি নন। এরা খাঁটি বঙ্গজ সন্তান— একজন পশ্চিম বাংলার এবং অপরজন এই বাংলাদেশেরই। পাতাকর কাটিং ও সেলইয়ের কাজ করার সময় তারা ভালোভাবেই জানতেন কি করছেন তারা। শুধু আওয়ামী লীগেরই সমর্থক ছিলেন না তারা, শেখ মুজিবেরও ছিলেন ভক্ত। মোহাম্মদ নাসিরউল্লাহ পশ্চিম বাংলার মানুষ হলেও বিয়ে করেন ঢাকার বিক্রমপুরে। ওই সময় তার বয়স ছিল ত্রিশের কোঠায় আর আবদুল খালেক মোহাম্মদীর পঁচিশ। টাঙ্গাইল জেলার মানুষ তিনি। এরা দু'জনেই এখনো বেঁচে আছেন। নাসিরউল্লাহ ছাত্রলীগের সবার কাছে ছিলেন 'মামা'।

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পতাকাটি তৈরির ইতিবৃত্ত মোহাম্মদ নাসিরউল্লাহ ও আবদুল খালেক মোহাম্মদীর ভাষ্যে তুলে ধরা হচ্ছে : "হাসানুল হক ইনু এবং শিব নারায়ণ দাস রাত প্রায় সাড়ে দশটার দিকে আমাদের দোকানে আসেন। দোকানের মালিক এবং অন্যান্য কর্মচারী ততক্ষণে যে যার ঘরে চলে গেছে। হাসানুল হক ইনু ও শিব নারায়ণ দাস কাগজের ওপর আঁকা ছাত্রলীগের পতাকার একটি ও বাংলাদেশের পতাকার আরেকটি নক্সা দেখিয়ে এবং সাইজের কথা বলে জানতে চাইলেন কোন রঙের কাপড় কতটুকু লাগবে। আমরা কাপড়ের পরিমাণ বলে দিতে তারা বেরিয়ে গেলেন এবং নিউমার্কেট থেকে লেডি হ্যামিলটন কাপড় নিয়ে ফিরলেন। আমরা কাজ শুরু করি রাত বারোটার পর। শুরুর আগে দোকানে প্রবেশের প্রধান গেটের গ্রিল টেনে তালা মেরে দিই। কাপড়ের কাটিং শেষ হলে হাসানুল হক ইনু ও শিব নারায়ণ দাস বাইরে চলে যান। ঘণ্টা খানেক পর আবার ফিরে আসেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের কাজ দেখেন। ভোর চারটার দিকে দুটো পতাকার কাজ শেষ হয়ে যায়। তারা নিয়ে চলে যান।"

www.pathagar.com

কাটার আগে কাপড়ের ওপর পতাকার নক্সা করেন আবদুল খালেক মোহাম্মদী। তিনিই কাটেন এবং প্রথম সেলাইটা তিনিই করেন। এ সময় মোহাম্মদ নাসিরউল্লাহ বাইরের গেটের তালা মারা গ্রিলের প্রহরায় থাকেন। দ্বিতীয় সেলাই অর্থাৎ উল্টো সেলাইটা করেন মোহাম্মদ নাসিরউল্লাহ এবং ডেলিভারি দেনও তিনি। তারা এই পতাকা তৈরির মজুরিও নেন না।

৭ জুনে "জয়বাংলা বাহিনী" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মার্চ মিছিল করে যায় পল্টন ময়দানে। মিছিলের অগ্রভাগে ছিলেন আ স ম আবদুর রব ও হাসানুল হক ইনু। আ স ম আবদুর রবের হাতে ছিল 'জয়বাংলা বাহিনী'র পতাকা— গোটানো অবস্থায়। আর হাসানুল হক ইনুর হাতে ছিল ছাত্রলীগের পতাকা।

পল্টন ময়দানে অভিবাদন মঞ্চে দাঁড়িয়ে ছিলেন শেখ মুজিব। তার দুপাশে ছিলেন সিরাজুল আলম খান, শেখ ফজলুল হক মণি, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমদ ও কাজী আরেফ আহমেদ। মার্চ মিছিল অভিবাদন মঞ্চের কাছে পৌঁছলে আ স ম আবদুর রব দণ্ডে গোটানো পতাকাটি হাঁটু গেড়ে শেখ মুজিবের হাতে তুলে দেন। শেখ মুজিব সেটা গ্রহণ করেন এবং কিছুটা খুলে আবার গুটিয়ে ফেলে আ স ম রবের হাতে ফেরত দেন। অথচ শেখ মুজিবের হাতে তুলে দেওয়া নিয়ে ভিন্ন কথা বলেছেন কাজী আরেফ আহমেদ। ১-১৪ এপ্রিল ১৯৮৯ সালের *তারকালোক*-এ তিনি বলেন : "৭ই জুন ভোর থেকেই মুষল ধারায় বৃষ্টি হচ্ছিল। বাংলাদেশের প্রথম পতাকা পলিথিনের কাগজে মুড়িয়ে আমি পল্টন ময়দানে গেলাম।...শেখ মুজিবের ডান পাশে আমি পলিথিনে মোড়ানো পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। শেখ মুজিব আমার হাত থেকে পতাকাটা নিয়ে খোলা অবস্থায় উপস্থিত জনতাকে প্রদর্শন করে রবের হাতে প্রদান করেন।" কিন্তু মার্চ মিছিলে ছাত্রলীগের পতাকা যিনি বহন করেছিলেন, হাসানুল হক ইনু, তিনি আমাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, "আ স ম আবদুর রবই 'জয় বাংলা বাহিনী'র পতাকা শেখ মুজিবের হাতে তুলে দেন।" ওই দিন পল্টন ময়দানে ছিলেন শিব নারায়ণ দাস। তিনি আমাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে হাসানুল হক ইনুর বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করেন। এ বিষয়ে আলাপ করি আ স ম আবদুর রবের সঙ্গেও। আমাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, শেখ মুজিবের হাতে 'জয় বাংলা বাহিনী'র পতাকা তিনিই তুলে দেন। মার্চ মিছিলেন পর আ স ম রব সংরক্ষণের জন্য পতাকাটি তুলে দেন হাসানুল হক ইনুর হাতে।

৭ জুনের পর ঢাকা নগর ছাত্রলীগের বিভিন্ন ইউনিটে মার্চ মিছিল করার পরিকল্পনা নেয়া হয়। প্রথম মার্চ মিছিলটি করার কথা ছিল ঢাকা কলেজে। মিছিলের জন্য হাসানুল হক ইনুর কাছ থেকে 'জয় বাংলা বাহিনী'র পতাকাটি নিয়ে আসেন তৎকালীন ঢাকা নগর ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন। কিন্তু মার্চ মিছিলের সিদ্ধান্তটি ছাত্রলীগের অভ্যন্তরে স্বাধীন বাংলার পক্ষ-বিপক্ষ গ্রুপকে সরাসরি মুখোমুখি এনে দাঁড় করায়। তাই ছাত্রলীগের ভাঙন রোধে মার্চ মিছিলের সিদ্ধান্ত পরিত্যক্ত হয় এবং 'জয় বাংলা বাহিনী'র পতাকাটি রয়ে যায় শেখ মোহাম্মদ জাহিদ হোসেনের কাছে।

www.pathagar.com

৭ জুন মার্চ মিছিলের পর স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ স্বাধীনতার প্রশ্নে আরো বেশি অনমনীয় ও আপোসহীন হয়ে ওঠে এবং আওয়ামী লীগ নেতৃত্বকে স্বাধীনতার প্রশ্নে সরাসরি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি এনে দাঁড় করায়। ৭ ডিসেম্বরে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া সম্পর্কিত প্রেসিডেন্ট ইয়হিয়ার ঘোষণার তিন দিন আগে ১৯৭০ সালের ২২ আগস্ট স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ এক দুঃসাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এই দিন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে বিপ্লবী পরিষদ স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেয়। তৎকালীন চট্টগ্রাম ছাত্রলীগ নেতা এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক স্বপন চৌধুরী কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশের প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ জন। সংখ্যাগুরু অংশ ছত্রিশ জন ছিলেন স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের সদস্য। এরা সবাই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন। বাকি ৯ জন এদের মধ্যে ছিলেন নুরে আলম সিদ্দিকী, আবদুল কুদ্দস মাখন, শেখ শহীদুল ইসলাম[২২] প্রমুখ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। এরা ছিলেন শেখ ফজলুল হক মণির কট্টর অনুসারী।

ওই দিন কেন্দ্রীয় কমিটির সভা পরিচালনা করছিলেন সংগঠনের সভাপতি নুরে আলম সিদ্দিকী। স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশের প্রস্তাব বিপুল ভোটে অনুমোদিত হয়ে যাচ্ছে দেখে তিনি সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে আসেন। চলে যান শেখ মুজিবের কাছে প্রস্তাব অনুমোদন রোধের আবেদন নিয়ে। তিনি আর সভাকক্ষে ফিরে আসেন নি। সভাপতির অনুপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মনিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভার কাজ আবার শুরু হয় এবং স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়ে যায়।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটি যখন স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশের প্রস্তাব গ্রহণে প্রস্তুতি নিচ্ছিল, সেই সময় স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের অন্যতম নেতা আবদুর রাজ্জাক মারফত শেখ মুজিব এই প্রস্তাবের প্রতি তার আপত্তির কথা জানিয়ে দেন। তিনি প্রস্তাব গ্রহণকারীদের ওপর রীতিমত রুষ্ঠ হয়ে ওঠেন।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটি গৃহীত স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশের প্রস্তাবের প্রতি শেখ মুজিবের বিরোধিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে আবদুর রাজ্জাক এর সত্যতা স্বীকার করেছেন আমাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে। তবে এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আবদুর রাজ্জাক বলেন : "তিনি (শেখ মুজিব) বলেছিলেন কৌশলগত কারণে তোমরা এমন একটি প্রস্তাব নাও যাতে সবটাই বোঝায়। আমরা স্বাধীনতার পক্ষে এটা যেমন বোঝায়, তেমনি ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ যাতে না হয় সে ব্যবস্থাও রাখ। তার মানে এই নয় যে, স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা করা হয়েছে।"

১২ আগস্ট ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়ে যাওয়ায় আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব পড়ে বিপাকে। তাদের শক্তির

---

২২. পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্ট এরশাদ সরকারের মন্ত্রী।

www.pathagar.com

অন্যতম উৎস ছাত্রলীগ স্পষ্টতই দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায়। একদিকে শেখ মুজিবের ছয় দফাপন্থী, অপরদিকে স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ পন্থীরা। ছয় দফাপন্থী ছাত্রলীগের নেতৃত্বে ছিলেন নুরে আলম সিদ্দিকী ও আবদুল কুদ্দুস মাখন। এদেরকে বাইরে থেকে নেতৃত্ব দিতে থাকেন শেখ ফজলুল হক মণি ও তোফায়েল আহমদ। আর এক দফাপন্থী অর্থাৎ স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় প্রত্যয়ী ছাত্রলীগ কর্মীদের নেতৃত্বে চলে আসেন আ স ম আবদুর রব ও শাহজাহান সিরাজ। বাইরে থেকে নেতৃত্ব দিতে থাকেন স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের ত্রয়ী নেতৃত্ব সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও কাজী আরেফ আহমেদ।

www.pathagar.com

১৯৭০ সালের নির্বাচন, শেখ মুজিব এবং সামরিক জান্তার ষড়যন্ত্র

৫ অক্টোবর থেকে ৭ ডিসেম্বর নির্বাচন পিছিয়ে গেলে আওয়ামী লীগ নির্বাচন প্রচারণার জন্য আরো সময় হাতে পায়। ছয় দফাপন্থী ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগের বিজয় অর্জন অভিযানে নেমে পড়ে। আর এক দফাপন্থী ছাত্রলীগ নির্বাচনী প্রচারণাকে স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে। এই পরিস্থিতি আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের জন্য, যারা নির্বাচন বিজয়ের প্রশ্নে ছিলেন এক প্রকার নিশ্চিত এবং নির্বাচনের পর পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় বসার স্বপ্ন দেখছিলেন, তাদের জন্য তৈরি করে এক দারুণ নাজুক অবস্থা। তাদের জন্য আরো উদ্বেগজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে মওলানা ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (পিকিং) ভেতরকার বাপন্থীরা। ২ অক্টোবর, ১৯৭০ সালে পূর্ব বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন এক প্রচারপত্রে বলে : "শাসকগোষ্ঠী ও সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদদের নির্বাচনী ষড়যন্ত্র ছিন্ন করিয়া গ্রামে গ্রামে গড়িয়া তুলুন তীব্র শ্রেণী সংগ্রাম, সৃষ্টি করুন সশস্ত্র সংগ্রামের অগ্নিকণা... যাহা পূর্ব বাংলায় প্রতিষ্ঠিত করিবে শোষণহীণ এক নতুন রাষ্ট্র—জনতার রাষ্ট্র, জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।"[১] পাশাপাশি স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার নিজস্ব কর্মসূচি নিয়ে প্রায় সমান তালে এগোতে থাকে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগসহ অপরাপর সকল দল ৭ ডিসেম্বরের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে নির্বাচনী প্রচরণাকে জোরদার করতে সকল শক্তি নিয়োগ করে। মওলানা ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি নির্বাচনে নামার প্রস্তুতিতে মনোনয়নও দেয়। কিন্তু নির্বাচন তারিখের ঠিক চব্বিশ দিন আগে ১২ নভেম্বর, ১৯৭০ সালে দক্ষিণ বাংলার ওপর দিয়ে বয়ে যায় ইতিহাসের এক প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যায় বিস্তীর্ণ জনপদ। প্রাণ হারায় তিন লাখ আদম সন্তান। লাখ লাখ নর নারী হয়ে পড়ে নিঃসহায়, সম্বলহীন। সারা বিশ্বের মানুষ ছুটে আসে আর্ত মানবতার সেবায় অথচ পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার প্রদর্শন করে চরম উদাসীনতা। দুর্গত মানুষের প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি প্রকাশ করে না। পাঠায় না কোন সাহায্য।

---

১. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র* : দ্বিতীয় খণ্ড, ৫৫০।
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (পিকিং) অভ্যন্তরে কাজী জাফর, রনো, মেননের কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি প্রভাবিত ছিল এই ছাত্র সংগঠনটি।

www.pathagar.com

কেন্দ্রীয় সরকারের এই অমানবিক আচরণে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে সারা পূর্ব বাংলা। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (পিকিং) সভাপতি মওলানা ভাসানী কেন্দ্রীয় সরকারের এই হৃদয়হীন আচরণের জবাবে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার আহবান জানিয়ে এক প্রচারপত্রে বলেন : "আজ হইতে ১৩ বৎসর পূর্বেই ষড়যন্ত্র, অত্যাচার, শোষণ আর বিশ্বাসঘাতকতার নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভের জন্য দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে 'আচ্ছালামু আলাইকুম'[২] বলিয়াছিলাম। হয়ত বাঙালী সেদিন নাটকের সব কটি অংক বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। আমি আশা করি, সচেতন শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন কোন বাঙালীকে বুঝাইতে হইবে না যে, মানবতা বর্জিত সম্পর্কের মহড়া চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠিয়াছে। এইবার নেমেসিসের সমুচিত শাস্তি বিধানের অপেক্ষায়ই আমরা আছি।"[৩] অন্যদিকে ঘূর্ণিঝড়ের প্রেক্ষিতে নির্বাচন পেছানোর দাবি ওঠে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। ফলে মওলানা ভাসানী নির্বাচন বয়কটের ঘোষণা দেন। ইয়াহিয়া খান ঘূর্ণিঝড় দুর্গতদের দেখতে আসেন নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে যখন আর আসার কোন প্রয়োজনই ছিল না। এই সফরে তার সঙ্গী ছিলেন সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল আবদুল হামিদ খান।

ঢাকায় অবস্থানকালে ইয়াহিয়ার সঙ্গে শেখ মুজিবের তিন তিনটি গোপন বৈঠক হয়। ইয়াহিয়ার যোগাযোগ মন্ত্রী জি ডবলিউ চৌধুরীর ভাষায় ওই বৈঠকের পরিবেশে ছিল 'নভেম্বরের হালকা শীতের আমেজ।'[৪] বৈঠক শেষ হওয়ার পর ইয়াহিয়া জি ডবলিউ চৌধুরীকে ডেকে পাঠান। বৈঠকের ফলাফল সম্পর্কে তাকে 'উৎফুল্ল চিত্তে'[৫] বলেন : "নির্বাচন স্থগিত না করার তার সিদ্ধান্ত সঠিক ও দূরদর্শীসম্পন্ন।"[৬] অতএব, নির্বাচন ৭ ডিসেম্বরেই বিধিবদ্ধ থাকে। ইয়াহিয়ার এই 'উৎফুল্লচিত্ততা'র কারণ আমরা পরে জানতে পাব—নির্বাচনের পর শেখ মুজিবের সঙ্গে তার ১৯৭১ সালের ১২ জানুয়ারির বৈঠকে।

ঘূর্ণিঝড় দুর্গতদের পরিদর্শন ও শেখ মুজিবের সঙ্গে গোপন বৈঠক শেষে ৩ ডিসেম্বর ইয়াহিয়া ঢাকা থেকে রাওয়ালপিণ্ডি ফিরে যান। কিন্তু ইতোমধ্যে শাসন ক্ষমতায় হাত বদল ঘটে যায়। ঢাকায় তার অবস্থানকালেই গুজব রটে যে, ইয়াহিয়া খানের হাতে আর ক্ষমতা নেই। চিফ অব স্টাফ জেনারেল আবদুল হামিদ খান ঢাকাতে প্রেসিডেন্টের সফরসঙ্গী হয়ে এলেও তারই নেতৃত্বে সামরিক জান্তা সকল ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছে। ইয়াহিয়া এখন কার্যত সামরিক জান্তার হাতের পুতুল মাত্র। যদিও তিনি ৩ ডিসেম্বর করাচিগামী বিমানে ওঠার আগে ঢাকা বিমান বন্দরে এক বিদেশী

---

২. ১৯৫৬ সালে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কাগমারী সম্মেলনে বক্তৃতাদানকালে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে এ কথা বলেন।

৩. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র* : দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা -৫৭৮

৪. জি ডবলিউ চৌধুরী : *দ্য লাস্ট ডেজ অব ইউনাইটেড পাকিস্তান*, পৃষ্ঠা-১০১।

৫. প্রাগুক্ত।

৬. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে ওই গুজবকে অস্বীকার করেন কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের সামরিক উপদেষ্টা রাও ফরমান আলীর ভাষ্যে গুজবের সত্যতা প্রতিপাদিত হয়।

১৯৭১ সালের ১ মার্চে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণায় পূর্ব বাংলায় যে পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে, সে সম্পর্কে তাকে জ্ঞাত করতে পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন সামরিক আইন প্রশাসক লেফটেন্যান্ট জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খান এবং জেনারেল অফিসার কমান্ডিং মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজার অনুরোধে গভর্নরের সামরিক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী ১ মার্চ রাতেই রাওয়ালপিণ্ডি রওনা হন। ৩ মার্চ তিনি ইয়াহিয়ার সাক্ষাৎ লাভ করেন। প্রেসিডেন্ট হাউজের লাউঞ্জে পা দিতেই যে দৃশ্য তার চোখে পড়ে, তাতে তিনি হতবাক হয়ে যান। তার ভাষায় : "পরদিন বেলা এগারটায় প্রেসিডেন্ট হাউজে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে দেখা হলো। লাউঞ্জে বসে জেনারেল হামিদ, মি ভুট্টো এবং প্রেসিডেন্ট মদ্যপান করছিলেন। সামনের টেবিলের ওপর ইয়াহিয়া ও হামিদ দুজনে পা তুলে বসেছিলেন।"[৭] এই দৃষ্টান্তই বলে দেয়, নির্বাচনের আগ থেকেই ইয়াহিয়াকে ক্ষমতা হারিয়ে প্রায় পুতুল হয়ে প্রেসিডেন্টের গদিতে বসে থাকতে হয়। জান্তা যেভাবেই চায়, তাকে তখন থেকে সে পথেই চলতে হয়। কিন্তু শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব ওই গুজব বিশ্বাস করেন নি বলেই নির্বাচনের পর তারা ইয়াহিয়াকে আশ্বাস দেন যে ক্ষমতায় যাওয়ার পর তাকেই তারা প্রেসিডেন্ট রাখবেন। তাই হামলা আসছে জানতে পেয়েও শেখ মুজিব ইয়াহিয়ার ওপর ভরসা করেই ১৯৭১ সালের মার্চের আলোচনা চালিয়ে যান। অপরদিকে নির্বাচনে বিজয়ী হলে আওয়ামী লীগের হাতে তথা বাঙালির কাছে পাকিস্তানের ক্ষমতা তুলে দেবে না সামরিক জান্তা, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (পিকিং) সভাপতি মওলানা ভাসানী তা জানতেন। তাই নির্বাচনের দু'দিন আগে ৫ ডিসেম্বর পল্টনের এক জনসভায় শেখ মুজিবের প্রতি স্বাধীন সার্বভৌম পূর্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যোগ দেবার আহবান জানিয়ে বলেন : "মুজিব তুমি স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান সংগ্রামে যোগ দাও। যদি আমেরিকা ও ইয়াহিয়ার স্বার্থে কাজ কর তাহলে আওয়ামী লীগের কবর '৭০ সালেই অনিবার্য।"[৮]

৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল হতভম্ব করে দেয় সামরিক জান্তাকে। হতবাক হবার কারণ,—সামরিক জান্তার হিসেব ছিল কোন দলই জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। অতএব, কোয়ালিশন সরকার আসবে কেন্দ্রে। ক্ষমতা প্রকারান্তরে জান্তার হাতেই থেকে যাবে। সামরিক জান্তা এই হিসেব করে তার নিজস্ব গোয়েন্দা সূত্র প্রস্তুতকৃত তথ্য থেকে। নির্বাচনের আগে দলগত

---

৭. মোস্তফা হারুন অনূদিত উর্দু ডাইজেস্টে প্রকাশিত মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর *'ভুট্টো – শেখ মুজিব ও বাংলাদেশ'* পৃষ্ঠা-৬০।

৮. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৮৪-৫৮৫।

www.pathagar.com

অবস্থান সম্পর্কে ওই গোয়েন্দা রিপোর্টে কোন দল কতটা আসন পেতে পারে , তা তুলে ধরা হয় এইভাবে : "আওয়ামী লীগ ৮০; মুসলিম লীগ (কাইউম) ৭০; কাউন্সিল মুসলিম লীগ ৪০; ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মস্কো : ওয়ালী মুজাফফর নেতৃত্বাধীন) ৩৫; পাকিস্তান পিপলস পার্টি ২৫ ।"[৯] অথচ, পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ১৬২টি আসনের ১৬০টি পেয়ে যাবে আওয়ামী লীগ আর পশ্চিম পাকিস্তানের ১৩৮টি আসনের ৮৮ টি পেতে পারে জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি, এ সামরিক জান্তার কষ্ট কল্পনাতেও আসে নি । আওয়ামী লীগের এই ১৬০ আসনের সঙ্গে যুক্ত হবে পূর্ব পাকিস্তনের জন্য সংরক্ষিত ৭ টি আসন । অতএব, জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের মোট আসন দাঁড়াবে ১৬৭ । নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা । আর পশ্চিম পাকিস্তানে একক বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভূত হয় পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি ।

আওয়ামী লীগের এহেন বিপুল বিজয়ে বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই ক্ষমতা হস্তান্তর না করার পাঁয়তারা কষতে থাকে সামরিক জান্তা । পাঁয়তারা কষা এক বিষয় আর তার প্রয়োগ আরেক । এর সঙ্গে জড়িত বিপুল ঝুঁকি—অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক । অভ্যন্তরীণ ঝুঁকি নিরসনে তারা বেছে নেয় উচ্চাভিলাসী ক্ষমতালিপ্সু জুলফিকার আলী ভুট্টোকে, যিনি পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখছিলেন নির্বাচনের আগ মুহূর্তেও । তার ক্ষমতালিপ্সাকে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার চক্রান্তে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেয় জান্তা । আর নির্বাচনী ফলাফলে স্বপ্ন ভঙ্গ ঘটাতে জুলফিকার আলী ভুট্টো তৈরি হয়েই ছিলেন । তাছাড়া আগাগোড়াই তিনি বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার ছিলেন বিরোধী । তার ওই মনোভাবকে স্বচ্ছ ভাষায় তুলে ধরেছেন পাকিস্তান বিমান বাহিনীর এক সময়কার প্রধান এবং তৎকালীন তেহরিকে ইশতিকলাল পার্টির সভাপতি মোহাম্মদ আসগর খান তার *জেনারেল ইন পলিটিকস* গ্রন্থে । পূর্ব বাংলার সমস্যা সমাধানে জুলফিকার আলী ভুট্টো ১৯৭০ সালের মাঝামাঝি সময়ে ইয়াহিয়া খানকে বলেন : "পূর্ব পাকিস্তান কোন সমস্যাই নয় । বিশ হাজারের মতো লোক মারতে হবে এবং সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে ।"[১০] অতএব, অতি দ্রুত দুয়ে দুয়ে চার হয়ে যায় । ক্ষমতা যে হস্তান্তরিত হচ্ছে না, তার ইঙ্গিত পাওয়া গেল ২০ ডিসেম্বর লাহোরের জনসভায় ভুট্টোর ভাষণে । তিনি বললেন : "পিপিপি (পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি) জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলীয় আসনে বসতে রাজি নয় ।"[১১] ভুট্টোর এই মন্তব্যে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে সারা পূর্ব বাংলা । এর প্রেক্ষিতে শেখ মুজিব ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে[১২] নবনির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রতিশ্রুত নির্বাচন সুসম্পন্ন করায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন : "তার (ইয়াহিয়ার) অধঃস্তনদের মধ্যে

৯. মোহাম্মদ আইউব ও কে সুব্রামানিয়াম, *দ্য লিবারেশন ওয়ার*, পৃষ্ঠা-৮৭ ।

১০. মোহাম্মদ আসগর খান : *জেনারেলস ইন পলিটিকস*, পৃষ্ঠা-২৮ ।

১১. *বাংলাদেশ ডকুমেন্টস*, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৩১-১৩৩ ।

১২. পরবর্তীকালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ।

www.pathagar.com

একটি অংশ সক্রিয়, যারা এখনো নির্বাচনী ফলাফলকে উল্টে দেবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।"[১৩] শেখ মুজিব ইয়াহিয়ার যে অধঃস্তনদের কথা ইঙ্গিত করেন, তাদের নিয়েই গঠিত ছিল সামরিক জান্তা। জান্তার সদস্যরা ছিলেন "জেনারেল আবদুল হামিদ খান, সেনাবহিনীর চিফ অব স্টাফ, লেফটেন্যান্ট জেনারেল এস.এম.জি. পীরজাদা, প্রেসিডেন্টের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার; লেফটেন্যান্ট জেনারেল গুল হাসান, চিফ অব জেনারেল স্টাফ, লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান, কোর কমান্ডার, মেজন জেনারেল ওমর, চেয়ারম্যান, জাতীয় নিরাপত্তা কমিটি, মেজর জেনারেল আকবর খান, পরিচালক, আন্ত ঃসার্ভিস গোয়েন্দা বিভাগ। এছাড়া দু'জন বেসামরিক ব্যক্তিকে রাখা হয় জান্তায়। এরা হলেন প্রেসিডেন্টের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা এম এম আহমদ ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা ব্যুরোর পরিচালক এন এ রিজভি।"[১৪] বেসামরিক এই দু'ব্যক্তি ইয়াহিয়া খানের একান্ত অনুগত ও বিশেষ আস্থাভাজন ছিলেন।

ভুট্টোর ২০ ডিসেম্বরের ঘোষণায় ইয়াহিয়া খান এক জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। জটিলতা নিরসনে শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনার জন্য ১৯৭১ সালের ১২ জানুয়ারি ঢাকায় আসেন। ওই দিন তিন ঘণ্টাব্যাপী এক বৈঠক হয় শুধু তার এবং শেখ মুজিবের মধ্যে। এই বৈঠকেই শেখ মুজিব সরকার গঠনের পর তাকে প্রেসিডেন্ট করার প্রস্তাব রাখেন। মোহাম্মদ আসগর খান তাঁর *'জেনারেলস ইন পলিটিক্স'* গ্রন্থে বলেছেন : "আলোচনার এক পর্যায়ে শেখ মুজিব ইয়াহিয়াকে বললেন যে, নতুন শাসনতন্ত্র রচনার পর তারা (আওয়ামী লীগ) তাকে প্রেসিডেন্ট করতে চান। এ প্রস্তাবে ইয়াহিয়া খান বিস্মিত হলেন এবং জিজ্ঞেস করেন 'কেন আপনারা আমাকে প্রেসিডেন্ট করতে চান?' শেখ মুজিবর রহমান ব্যাখ্যা দেন যে, তিনি এবং তার দল মনে করে এটাই হবে সবচেয়ে উত্তম ব্যবস্থা। প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার দু'বছরের অভিজ্ঞতা এবং সেনাবাহিনীতে তার অবস্থানকে সুবিধা হিসেবে কাজে লাগানো যাবে এবং তিনি (শেখ মুজিব) অনুরোধ করেন প্রস্তাবটি ইয়াহিয়া খানকে গ্রহণ করতে। ইয়াহিয়া খানকে রাজি করাতে বেশি জোরাজুরি করতে হল না। সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে গেল।"[১৫] একদিন পর ১৪ জানুয়ারি রাওয়ালপিন্ডির পথে করাচিগামী বিমানে ওঠার আগে তেজগাঁও বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ইয়াহিয়া বলেন : "শেখ মুজিবর রহমান দেশের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন।"[১৬] কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের মাটিতে পা দিতেই পরিস্থিতি তার জন্য আরো জটিল হয়ে ওঠে। চাপ বাড়ে ভুট্টোর। চাপ বাড়ে জান্তার।

---

১৩. *বাংলাদেশ ডকুমেন্টস*, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৩৮।

১৪. মোহাম্মদ আইউব ও কে সুব্রামানিয়াম, *দ্য লিবারেশন ওয়ার*, পৃষ্ঠা- ৯৫।
ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইনস্টিটিউট অব ডিফেন্স অ্যান্ড অ্যানাল্যাইসিস উইং এর ডাইরেক্টর ছিলেন কে সুব্রামনিয়ম এবং ডক্টর মোহাম্মদ আইউব ছিলেন ওই ইনস্টিটিউটের সহযোগী গবেষক ও পাকিস্তান বিভাগের প্রধান।

১৫. মোহাম্মদ আসগর খান, *জেনারেলস ইন পলিটিকস্*, পৃষ্ঠা-২৭।

১৬. *বাংলাদেশ ডকুমেন্টস* : প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪৪।

www.pathagar.com

চাপে পড়েন ১৭ জানুয়ারি সিন্ধু প্রদেশে ভুট্টোর লারকানার বাড়িতে তথাকথিত বুনো হাঁস শিকারে গিয়ে। ভুট্টোর আমন্ত্রণে গিয়েছিলেন সেখানে। গিয়েছিলেন জান্তার সদস্য জেনারেল হামিদ, লেফটেন্যান্ট জেনারেল পীরজাদা প্রমুখ। লারকানার গোপন বৈঠকের পর হাতে যা-ও বা ক্ষমতা ছিল, তাও ছাড়তে হয় ইয়াহিয়াকে। সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে যায়—ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে না। কিন্তু কিভাবে? কার্যক্রমটা কি হবে? সাধারণ পুলিশী কার্যক্রমে অমিততেজা বাঙালিকে দমানো যাবে না। বিকল্প হচ্ছে সামরিক হামলা। অবাধ নির্বাচনে বিজয়ী দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার বদলে সামরিক কার্যক্রম পরিচালনায় বিশ্বব্যাপী বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। বিশেষত, প্রতিবেশী দেশ ভারত, যে মূলত শত্রুভাবাপন্ন, সে কি ভূমিকা নেবে, সেটা তত পরিষ্কার নয় এবং তা হয়ে দাঁড়ায় উদ্বেগের বিষয়। তবে জান্তা অনুমান করে, সুযোগ ভারত হয়তো নেবার চেষ্টা করবে। তাতে পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে উঠবে এবং সেটা জান্তার পক্ষে সামলানো কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। তাই হামলা প্রস্তুতি ও আক্রমণ পরিচালনার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন তার জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অবশ্যি মার্কিন প্রশাসন জান্তা ও ভুট্টোর দিকে মুখ ফিরিয়েই ছিল।

তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, পাকিস্তান ও ভারতকে সরাসরি যুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েও আইউব উৎখাতে ব্যর্থ হয়ে তৎকালীন মার্কিন প্রশাসন নামে ছয় দফার মাধ্যমে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় এবং আইউবের পতনের মধ্য দিয়ে মার্কিন প্রশাসনের কাছে ছয় দফার প্রয়োজন যায় ফুরিয়ে। কিন্তু যে ছয় দফাকে রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে গ্রহণ করে সিআইএ তথা মার্কিন প্রশাসন, তা ইতোমধ্যে পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে এক দফায় পরিণত হয়ে যায়। ছয় দফার এই পরিণতি মার্কিন প্রশাসনের কাছে মোটেই কাম্য ছিল না। কেননা, কদাপিও পাকিস্তানকে খণ্ডিত দেখতে চায়নি সে। অন্যদিকে ছয় দফাকে এক দফার আন্দোলনে পরিণত করতে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' পর্দার অন্তরাল থেকে যে পরিকল্পনা এঁটে রেখেছিল, পশ্চিম পাকিস্তানি শোষণ, বঞ্চনা, এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার মানুষের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামে তা ধীরে ধীরে পুষ্ট হয়ে ওঠে। ছয় দফার মধ্যে পূর্ব বাংলার মানুষ বঞ্চনা ও শোষণ মুক্তির ইঙ্গিত দেখতে পায়, সেটাকে আঁকড়ে ধরে এবং এক অবিনাশী সাহসী পদক্ষেপে এগিয়ে যায় স্বাধীনতা অর্জনের পথে। 'র' এই স্বাধীনতাকামী মানুষের আবেগ এবং তার তীব্র সংগ্রামী চেতনাকে কৌশলে নিয়ে আসে নিজের হাতের মুঠোয়। ব্যাপারটা অনেকটা এই রকম—কলকে সাজালো সিআইএ, টানও দিল এবং নেশার আশ মিটল কিন্তু সুখটানটা আর দিতে পারলো না। সুখটানটা দেওয়ার আগেই কলকে ছিনতাই করলো 'র'। অর্থাৎ ছয় দফা দিয়ে যা করতে চেয়েছিল সিআইএ—তা করেও বটে, কিন্তু যা চায় নি এবং হিসেবেও আসে নি, সেটা ঘটতে থাকে ভেতরে ভেতরে,—তার ইচ্ছার বাইরে এবং এক সময় সে দেখে তার দেওয়া ছয় দফা আর ছয় দফায় নেই, হয়ে গেছে এক দফা। বাঙালি জনগণ শোষণ মুক্তির লক্ষ্যে ছয় দফাকে করে ফেলেছে এক দফা। 'র' এটাই চাইছিল। সিআইএ 'র' এর হাতে খেল বড় রকমের মার। প্রমাদ

www.pathagar.com

গোনে মার্কিন প্রশাসন। পাকিস্তানের অঙ্গহানির মধ্য দিয়ে ভারত হয়ে উঠবে আরো শক্তিধর। তাকে শক্তিমান হতে দেওয়া যায় না। ১৯৬২ সালের চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধের পর ডেমোক্রেট সরকার ভারতকে যে সমর্থন ও সহায়তা দেয়, প্রেসিডেন্ট নিক্সনের রিপাবলিকান সরকার আঞ্চলিক ভারসাম্য রক্ষার স্বার্থে তাকে ফ্রাংকেনস্টাইন হতে দিতে পারে না। রিপাবলিকান সরকারের কাছে বলশালী পাকিস্তান শক্তিমান ভারতের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই সামরিক জান্তা ও ভুট্টোকে সমর্থন দেওয়ার কথা মার্কিন প্রশাসনের। আর অখণ্ড পাকিস্তানের প্রশ্নে পূর্ব বাংলার জনগণ প্রিয় যে নেতার ওপর নির্ভর করা যায়, যাকে অখণ্ড পাকিস্তানের একমাত্র শক্তিশালী সেতুবন্ধ হিসেবে বিবেচনা করা যায়, মার্কিন প্রশাসনের কাছে সেই ব্যক্তি ছিলেন শেখ মুজিবর রহমান। এ বিষয়ে বিখ্যাত মার্কিন সাংবাদিক জ্যাক এন্ডারসনের *এন্ডারসন পেপারস*-এ তুলে ধরা পাকিস্তানে তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ ফারল্যান্ডের মন্তব্য সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য : "আমি ইয়াহিয়াকে বলেছিলাম যে, আমরা মনে করি মুজিবই হচ্ছেন পাকিস্তানের,—পূর্ব এবং পশ্চিম—এর স্থায়িত্বের চাবিকাঠি।"[১৭] মার্কিন প্রশাসন শেখ মুজিবকে অখণ্ড পাকিস্তানের মুখ্য সেতুবন্ধ মনে করলেও তার ওপর ভরসা রাখতে পারে নি দ্বিবিধ কারণে। প্রথমত, ছয় দফা শেখ মুজিবের হাতে আর ছিল না। চলে যায় স্বাধীনতাকামী জনগণের হাতে এক দফায় রূপান্তরিত হয়ে এবং এর নিয়ন্ত্রণে আসে তার পার্টিরই ছাত্র সংগঠনের ভেতরকার সমাজতন্ত্রকামী লড়াকু তরুণরা— শেখ মুজিবের ভাষায় 'চরমপন্থী' যারা। নিয়ন্ত্রণ কমবেশি চলে যায় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (পিকিং) ভেতরকার বামপন্থীদের হাতেও। পর্দার অন্তরালে 'র ' তো আছেই। খেলছে এবং খেলাচ্ছে নিজের লাইনে। দ্বিতীয়ত, শেখ মজিব যতই প্রিয় ব্যক্তি হোন না কেন মার্কিন প্রশাসনের কাছে, তার বিশাল জনপ্রিয়তাও আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে তাদের। কেননা, মার্কিন প্রশাসন দেশে দেশে তার অভিজ্ঞতায় দেখেছে যে এ ধরনের জনপ্রিয় লোককে শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। জনপ্রিয় ব্যক্তি তাদের কাম্য বটে, তবে নিয়ন্ত্রণের অযোগ্য জনপ্রিয়তাকে তারা সুনজরে দেখে না। ১৯৮৬ সালের ফিলিপাইনের সাধারণ নির্বাচনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে এটা অনুধাবনে হয়তো সুবিধা হবে।

ফিলিপাইনের সাধারণ নির্বাচনে বিপুল ভোটে বিজয়ী হন মিসেস কোরাজন একুইনো। কিন্তু শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ভোটের ফলাফলকে উল্টে দেন প্রেসিডেন্ট ফার্দিনান্দ মার্কোস। কোরাজন একুইনো এবং মার্কোস দুজনেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বস্ত। অথচ নির্বাচনে মার্কোসের ভোট ডাকাতি সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যানের প্রশাসন মর্কোসকে সমর্থন দিতে থাকে। মার্কিন আস্থা অর্জনের জন্য কোরাজন একুইনোকে পরিষ্কার বলতে হয় যে, ফিলিপাইনের মার্কিন ক্লার্ক বিমান ঘাঁটি ও সুবিক নৌ–ঘাঁটি অপসারণের কোন পরিকল্পনা তার নেই। বলেন প্রকাশ্য জনসভায়

১৭. জ্যাক এন্ডারসন : *এন্ডারসন পেপারস*, পৃষ্ঠা-২৭৬।

www.pathagar.com

: "আমি কমিউনিস্ট নই, কমিউনিস্ট ছিলাম না এবং ভবিষ্যতেও কমিউনিস্ট হবো না।" তবু রিগ্যান প্রশাসন সমর্থন দিয়ে যেতে থাকে মার্কোসকে। সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ এবং জনগণের প্রেসিডেন্ট ভবন ঘেরাওয়ের মধ্য দিয়ে ফিলিপাইনের জনগণ যখন এক অবশ্যম্ভাবী ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের দিকে এগোতে থাকে এবং ফিলিপাইনের তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত বসওয়ার্থ যখন একের পর এক রিপোর্ট দিয়ে যেতে থাকেন যে, কোরাজন নিয়ন্ত্রণেই থাকবেন, একমাত্র তখনই রিগ্যান প্রশাসন মার্কোস থেকে সমর্থন তুলে নেয় এবং মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী জর্জ শুলজ স্বীকার করেন যে নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি হয়েছে।

আকাশচুম্বি জনপ্রিয়তা নিজ স্বার্থের পক্ষে কি পরিমাণ বিপজ্জনক হতে পারে এ তিক্ত অভিজ্ঞতা মার্কিন প্রশাসন অর্জন করে ১৯৫২ সালে মিশর থেকে। ১৯৫২ সালের ২৩ জুলাই মিশরীয় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নগিব ও কর্নেল গামাল নাসের এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে উৎখাত করেন বাদশা ফারুককে। সুয়েজ খালকে *আন্তর্জাতিকীকরণের* গোপন প্রতিশ্রুতি দানের মাধ্যমে সামরিক অফিসাররা অভ্যুত্থান সংঘটনের ব্যাপারে লাভ করেন তৎকালীন মার্কিন প্রশাসনের সমর্থন। পরবর্তীতে *আন্তর্জাতিকীকরণের* বদলে কর্নেল নাসের সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করলে তার বিরুদ্ধে মার্কিন প্রশাসনের কিছুই করার থাকে না। কারণ, জনপ্রিয়তায় নাসের তখন এক বিশাল মানব হয়ে যান। সকল নিয়ন্ত্রণের ঊর্ধ্বে চলে যান তিনি। পরের ইতিহাস তার কাছে মার্কিন প্রশাসনের বার বার মার খাওয়ার ইতিহাস। গামাল নাসের জনপ্রিয়তালব্ধ তিক্ত অভিজ্ঞতাই ১৯৮৬ সালে রিগ্যান প্রশাসনকে ফিলিপাইনের কোরাজন একুইনোর গগনচুম্বি জনপ্রিয়তায় যেমন উদ্বিগ্ন করে তোলে, তেমনি ১৯৭০ সালে শেখ মুজিবের আকাশ ছোঁয়া জনপ্রিয়তা আতঙ্কগ্রস্ত কর তোলে নিক্সন প্রশাসনকে। ফিলিপাইনে মার্কিন রাষ্ট্রদূত বসওয়ার্থের রিপোর্টে কোরাজন একুইনোর নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে রিগ্যান প্রশাসন নিশ্চিত হলেও শেখ মুজিবের ব্যাপারে ঢাকায় তৎকালীন মার্কিন কনসাল জেনারেল আর্চার কে ব্লাডের রিপোর্টে নিশ্চিত হতে পারে নি নিক্সন প্রশাসন। তাদের কাছে চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হয় রাষ্ট্রদূত জোসেফ ফারল্যান্ড এবং ইসলামাবাদে তৎকালীন সিআইএ স্টেশন প্রধান উলফের রিপোর্ট।

ঢাকায় তৎকালীন মার্কিন কনসাল জেনারেল আর্চার কে ব্লাড ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে ইয়াহিয়ার জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার কয়েকদিন পর সরাসরি ওয়াশিংটনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রিপোর্ট পাঠান যে পূর্ব বাংলার মানুষ শেখ মুজিবের পক্ষে। ক্ষমতা হস্তান্তরিত না হলে ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ অনিবার্য। ২৫ মার্চে সামরিক জান্তার বর্বর হামলার বিরুদ্ধে মার্কিন প্রশাসনের উদাসীনতায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন আর্চার কে ব্লাড এবং তার অধঃস্তনদের স্বাক্ষরসহ একটি প্রতিবাদ লিপি পাঠান ওয়াশিংটনে। এতে মর্কিন পররাষ্ট্র দফতর তাকে 'আতঙ্ক-বাতিকগ্রস্ত' বলে অভিহিত করে ওয়াশিংটনে ডেকে পাঠান এবং সাধারণ প্রশাসনিক ডেস্কে তাকে বসিয়ে দেওয়া হয়।

www.pathagar.com

জোসেফ ফারল্যান্ড ছিলেন পাকিস্তানে তৎকালীন মার্কিন প্রশাসনের মুখ্য ব্যক্তি। যদিও সিআইএ স্টেশন প্রধান ছিলেন উলফ তথাপি গোয়েন্দাগিরিতে ফারল্যান্ডের পূর্ব অভিজ্ঞতাই তার গুরুত্বকে অধিকতর বাড়িয়ে তোলে। তাই তার রিপোর্টই মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর এবং প্রতিরক্ষা দফতরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচিত হতো। শেখ মুজিব সম্পর্কে তার রিপোর্টটি কি ছিল? এ প্রশ্নের জবাবে আবার আমাদেরকে ফিরে তাকাতে হয় সাংবাদিক জ্যাক এন্ডারসনের দিকে। তার আগে জোসেফ ফারল্যান্ডের পরিচিতি আমাদের জানা দরকার। তাতে পরিষ্কার হয়ে যাবে কেন মার্কিন প্রশাসন তার রিপোর্টকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করতো।

জোসেফ ফারল্যান্ড প্রথম জীবনে ছিলেন আইনজীবী এবং জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণপন্থী স্ট্যাটেজিক এন্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের নির্বাহী পরিষদ ও রিসার্চ কাউন্সিলের সদস্য। পরে যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই-এর (ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন) এজেন্ট। গোয়েন্দাগিরিতে হাত পাকান এখানেই। ১৯৫৭ সালে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার তাকে দক্ষিণ আমেরিকার ডোমিনিকান রিপাবলিকে পাঠান রাষ্ট্রদূত করে। তিন বছর তিনি সেখানে ছিলেন একনায়ক রাফায়েল ট্রুজিল্লো আর মার্কিন প্রশাসনের সংযোগ রক্ষাকারী (সিআইএ'র) হিসেবে। এরপর আসেন পানামাতে। প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির পুরো সময়টা ছিলেন পানামাতে। ১৯৬৯ সালের শেষের দিকে আসেন পাকিস্তানে। তাকে তৎকালীন পাকিস্তানের কোন কোন মহল সিআইএ এজেন্ট হিসেবে অভিহিত করতো।

১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর দক্ষিণ বাংলার ওপর দিয়ে যে ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায়, জোসেফ ফারল্যান্ড তার ওপর ওয়াশিংটনে যে রিপোর্ট পাঠান, তার উল্লেখ এখানে সঙ্গত কারণেই করতে হয়। ফারল্যান্ড তার রিপোর্টে বলেন : "বিপর্যয়ে যতটা জীবনহানি ঘটেছে, বাঙালীরা তার অতিরঞ্জন ঘটিয়েছে রাজনৈতিক কারণে।"[১৮] এই জোসেফ ফারল্যান্ডের কাছে শেখ মুজিব কেমন ব্যাক্তি ছিলেন? সাংবাদিক জ্যাক এন্ডারসনের গ্রন্থ থেকে আমরা সেটা জানতে পাব,— "ফারল্যান্ড মুজিবকে জানতেন এবং তাকে প্রাণবন্ত ও প্রাণ প্রাচুর্যসম্পন্ন দেখতে পান কিন্তু তিনি গালভরা বুলি কপচাতে ভালোবাসেন।"[১৯] বুলিকপচান ব্যক্তি সাধারণত কারো বিশ্বাস অর্জন করতে পারেন না। আর তিনি যদি আকাশছোঁয়া জনপ্রিয়তার অধিকারী হন, সকল নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়া তার পক্ষেই সম্ভব হয়ে ওঠে। মিশরের অভিজ্ঞতাই সচেতন করে তোলে মার্কিন প্রশাসনকে। যদিও শেখ মুজিবই ছিলেন তাদের বিবেচনায় পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের একমাত্র সেতুবন্ধ, তথাপি তার ওপর পুরোপুরি আস্থা আনতে পারে না মর্কিন প্রশাসন। উপরন্তু, এও তাদের আর অজানা ছিল না যে, ছয় দফা আর শেখ

১৮. জ্যাক এন্ডারসন : *দ্য এন্ডারসন পেপারস*, পৃষ্ঠা–২৭৫।

১৯. *প্রাগুক্ত।*

www.pathagar.com

মুজিবের হাতে নেই। চলে গেছে তার দলের মূল প্রাণশক্তি ছাত্রলীগের বৃহত্তর অংশের হাতে এবং তা হয়ে গেছে একদফা, যা তাদের কাম্য না কদাপিও। অতএব, কনসাল জেনারেল আর্চার কে ব্লাডের রিপোর্ট নয়—তার ওপরঅলা জোসেফ ফারল্যান্ডের রিপোর্ট, যা সিআইএ স্টেশন প্রধান উলফ সমর্থিত, তাকেই গ্রহণ করে ওয়াশিংটন। ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তা ও জুলফিকার আলী ভুট্টোর প্রত্যাশাকে পূরণ করে নিক্সন প্রশাসন এবং এসেও যায় সবুজ সংকেত। ডকুমেন্টারি ফিল্ম *দ্য বাংলাদেশ স্টোরি.* পার্ট–২'র দ্য মুজিব ইয়ারস'-এ দেওয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সিনেটের বৈদেশিক সাব-কমিটি সদস্য (১৮৮১-৮৫) সিনেটর উইলিয়াম ব্রান্ডসের বক্তব্যে সেই সবুজ সংকেত প্রদানের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ব্রান্ডস বলেন : "Next thing, Kissinger had a great deal of sympathy for Yahya Khan because he was the first Pakistani leader to hold free election and therefore, I feel that Sheikh Mujib should meet him at least half a way. Moreover, I don't think they expected him to resort to a campaign of terror in East Pakistan; I think they expected that he would take sharp quick military action and that would be sufficient as have been in the past to put down rise in East Pakistan."

(তাছাড়া ইয়াহিয়ার প্রতি কিসিঞ্জার প্রভূত সহানুভূতিশীল ছিলেন। কারণ, ইয়াহিয়া খান হচ্ছেন প্রথম পকিস্তানি নেতা যিনি সর্বপ্রথম অবাধ নির্বাচন দেন। অতএব, আমি মনে করি, এ ব্যাপারে শেখ মুজিবকে (সমঝোতার জন্য) আরো কিছু দূর অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল। উপরন্তু, আমি মনে করি না, তারা (মার্কিন প্রশাসন) এটা মনে করেছিল যে, তিনি (ইয়াহিয়া) সন্ত্রাসের আশ্রয় নেবেন। আমি মনে করি, তারা (মার্কিন প্রশাসন) আশা করেছিল যে, তিনি (ইয়াহিয়া) একটি ত্বরিত সামরিক কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। যা অতীতে পূর্ব পাকিস্তানে অভ্যুত্থান দমনে কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে)।"[২০]

সিনেটর উইলিয়াম ব্রান্ডসের ভাষ্য অনুযায়ী তৎকালীন মার্কিন প্রশাসন মনে করেছিল 'পুলিশী ধরনের' সামরিক কার্যক্রমে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যাবে। 'র'-এর পরিকল্পনাও হবে ব্যর্থ। তারপর ছয় দফাকে পাশ কাটিয়ে সমঝোতার মাধ্যমে অখণ্ড পাকিস্তানের জন্য একটি নতুন ব্যবস্থা কায়েম করা যাবে। একই রকমের ধারণা ছিল ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তা এবং জুলফিকার আলী ভুট্টোরও। কিন্তু তাদের কারোরই কল্পনাতে আসেনি—না নিক্সন প্রশাসন না সামরিক জান্তার যে 'পুলিশী ধরনের' সামরিক কার্যক্রম লাখ লাখ নর-নারীকে ভারতে আশ্রয়প্রার্থী করে তুলবে। রুখে দাঁড়াবে বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতা। অস্ত্র তুলে নেবে সাহসী তরুণরা।

মার্কিন সবুজ সঙ্কেত পাওয়ামাত্রই হামলা পরিচালনার ছক তৈরির প্রস্তুতিতে নেমে পড়ে সামরিক জান্তা। প্রস্তুতির জন্য সময়ের প্রয়োজন। আর সময় হাতিয়ে নিতে গেলে

---

২০. এইচ নাজারেথ (প্রযোজক) : *দ্য বাংলাদেশ স্টোরি*, পার্ট-২, দ্য মুজিব ইয়ারস।

www.pathagar.com

পূর্ব বাংলার মানুষকে ফেলতে হবে বিভ্রান্তিতে যাতে তারা ইঙ্গিত পায় ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। বিভ্রান্তির ঘোর কাটার আগেই চূড়ান্ত করতে হবে প্রস্তুতি। সামরিক জান্তা হিসেব কষে, জাতীয় পরিষদ অধিবেশনের দিন-তারিখ ঘোষণায় বিলম্ব হলে তাদের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে অন্ধকারে রাখা যাবে না পূর্ব বাংলার মানুষকে। তাই প্রতারণার আশ্রয় নেয়। ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে দিয়ে জাতীয় পরিষদ অধিবেশনের তারিখ ঘোষণা করিয়ে দেয়। কিন্তু এর দু'দিন আগে ১১ তারিখে এক গোপন বৈঠকে সামরিক জান্তা সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় হামলা পরিচালনার।

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ সাল। দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার। ঐদিনের প্রথম ভাগে রাওয়ালপিন্ডির সেনাসদর দফতরে বসে সামরিক জান্তার একটি বৈঠক। ২৫ মার্চের হামলা পরিচালনা ওই দিনের বৈঠকের সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেনারেল হামিদ, লেফটেন্যান্ট জেনারেল পীরজাদা, লেফটেন্যান্ট জেনারেল গুল হাসান, লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান, মেজর জেনারেল ওমর, মেজর জেনারেল আকবর ও পকিস্তান কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা প্রধান এন এ রিজভী। বৈঠকে অতিরিক্ত ছিলেন পাকিস্তান কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার উপপ্রধান এস এ সউদ। জান্তার বাইরের লোক তিনি। তাকে ডেকে পাঠানো হয়। বেলা তিনটার দিকে বৈঠক শেষ হয় এবং বৈঠকে পূর্ব বাংলায় হামলা পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে যায়। এই বৈঠকেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক এবং পাকিস্তান পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক কমান্ড প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খানের ভাগ্যও হয়ে যায় নির্ধারিত।

সাহেবজাদা ইয়াকুবের জায়গায় আসবেন কোর কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান—যিনি আইউব আমলে বেলুচিস্তানে গণঅভ্যুত্থান দমনে হত্যাকাণ্ড পরিচালনায় দার্ঢ্যের পরিচয় দিয়ে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ রেখেছিলেন। "বেলুচিস্তানের কসাই"—এই কুখ্যাতিই পূর্ব বাংলায় হামলা পরিচালনায় তার নিয়োগে জান্তার কাছে উপযুক্ত সার্টিফিকেট হিসেবে বিবেচিত হয়। সিদ্ধান্ত আরো গৃহীত হয়,—গভর্নর ভাইস এডমিরাল এস এম আহসানকেও যেতে হবে। তিনটি পদই দখল করবেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান—গভর্নর, সামরিক আইন প্রশাসক ও পাকিস্তান পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক কমান্ড প্রধান। এডমিরাল আহসান ও জেনারেল ইয়াকুবের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই—তারা রাজনৈতিক সমাধানের পক্ষে এবং শেখ মুজিবের প্রতি নমনীয়।

শেখ মুজিবের প্রতি তাদের ওই নমনীয়তার কারণ হলো,—জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে গুলশানের একটি বাড়িতে তাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত গোপন বৈঠকে শেখ মুজিব বামপন্থীদের খতম করার আশ্বাস দেন। এ সম্পর্কে জি ডবলিউ চৌধুরী তার *দ্য লাস্ট ডেজ অব ইউনাইটেড পাকিস্তান* গ্রন্থে বলেছেন : "মুজিবর রহমান গর্ব সহকারে বলেন যে, তিনি পূর্ব পাকিস্তানের বামপন্থীদের নির্মূল করে দেবেন।"[২১]

২১. *দ্য লাস্ট ডেজ অব ইউনাইটেড পাকিস্তান*, পৃষ্ঠা–১১৯।

www.pathagar.com

একই দিন অর্থাৎ ১১ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় আরেকটি বৈঠক হলো প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও জুলফিকার আলী ভুট্টোর মধ্যে। ভুট্টো সামরিক জান্তার সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় ছিলেন। সিদ্ধান্ত পাওয়া মাত্রই নেমে পড়েন প্রথম রাউন্ডের খেলায়। বৈঠকে তারই পরামর্শে একদিন পর অর্থাৎ ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদ অধিবেশনের তারিখ ঘোষণা করেন এবং ছক অনুসারে এর একদিন পর অর্থাৎ ১৫ ফেব্রুয়ারি ভুট্টো নামেন দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলায়। ওই তারিখে ঘোষণা করলেন : "তার দল মার্চের ৩ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠেয় জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে বসবেন যতক্ষণ না তার দলের লোকজনের কাছে পরিষ্কার হচ্ছে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল প্রকাশ্য অথবা গোপন আলোচনায় পারস্পরিক সুযোগ-সুবিধার অধিকার দিচ্ছে।"[২২] ভুট্টো নেমেছিলেন হামলা পরিচালনায় সামরিক জান্তাকে সৈন্য-সামন্ত-রসদপত্র পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে এনে জড়ো করার সময় করিয়ে দেবার খেলায় এবং সময় পেয়ে যায় জান্তা। এর আগে অর্থাৎ সৈন্য সামন্ত আনার আগে ছকমাফিক আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেরে ফেলে সামরিক জান্তা। ইয়াহিয়াকে দিয়ে ১৭ ফেব্রুয়ারি তার বেসামরিক মন্ত্রিসভা দেয় ভেঙে। এর পর পরই শুরু হয় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য ও যুদ্ধ উপকরণ প্রেরণের কার্যক্রম। পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের (পিআইএ) বোয়িং বিমান ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে সর্বপ্রথম সৈন্য ও রসদপত্র আনা শুরু করে।

রাওয়ালপিন্ডি সেনা সদর দফতরে ১১ ফেব্রুয়ারির গোপন বৈঠকে সামরিক জান্তা পূর্ব বাংলায় হামলা পরিচালনার যে সিদ্ধান্ত নেয়, সে সম্পর্কে শেখ মুজিবের প্রতিক্রিয়া কি ছিল? আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সামরিক জান্তার ১১ ফেব্রুয়ারির গোপন বৈঠকে জান্তার সদস্যরা ছাড়া বাইরের ছিলেন মাত্র একজন। তিনি পাকিস্তান কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার উপপ্রধান এস এ সউদ।

এস এ সউদ হামলা পরিকল্পনাকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ করতে পারেন নি। অবশ্যি জান্তার বৈঠকে উচ্চবাচ্য করতেও সাহসী হননি। হামলা পরিকল্পনার প্রতি তিনি তার বিরক্তি ও অসমর্থনের কথা সেনা সদর দফতর থেকে ফিরে এসেই প্রকাশ করেন গোয়েন্দা বিভাগের এক পদস্থ বাঙালি কর্মকর্তার কাছে। বেলা গড়িয়ে তখন তিনটা। বাঙালি কর্মকর্তা সউদের কথা চুপচাপ শুনে যান কোন মন্তব্য না করেই। একদিন পর সেনা সদর দফতরে নেয়া জান্তার সিদ্ধান্তের বিষয়টি জেনে যান শেখ মুজিব। খবরে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেন। সত্যতা যাচাই করতে চাইলেন।

পরদিন সকালে শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠতম ইনার সার্কেল এ বি এস সফদার, পাকিস্তান কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার তৎকালীন প্রাদেশিক প্রধান, আসেন তার বত্রিশ নম্বর বাড়িতে। শেখ মুজিবকে তখন ঘিরে বসেছিলেন নির্বাচন বিজয়ী তার দলের নেতা এবং কর্মীরা। তিনি এ বি এস সফদারকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন, যিনি ছিলেন তার এক ইনার সার্কেল, তাকে নিয়ে তিনি ঢুকলেন পাশের রুমে।

---

২২. *বাংলাদেশ ডকুমেন্টস*, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২২৫।

www.pathagar.com

এই ইনার সার্কেলটি ছাড়া শেখ মুজিবের ছিল আরো দুটি ইনার সার্কেল। সিএসপি রুহুল কুদ্দুস এবং সিএসপি আহমদ ফজলুর রহমানের কথা তার পার্টির উর্ধ্বতন ব্যক্তিরা জানতেন। এই ইনার সার্কেলটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ। এই ইনার সার্কেলটি গড়ে ওঠে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে বেরিয়ে আসার পর। অপর ইনার সার্কেলটি একক এবং একজন প্রয়াত সিএসপি,— যিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের একজন পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। তৃতীয় ইনার সার্কেলটি এবং তিনিও ছিলেন একক ব্যক্তি, এ বি এস সফদার— শেখ মুজিবের ছিলেন ঘনিষ্ঠতম। এই ইনার সার্কেলটি অপর দুই সার্কেলের সকল খবরা-খবর রাখতেন। এই ইনার সার্কেল অর্থাৎ এ বি এস সফদার ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে এবং ফেব্রুয়ারি মাসে শেখ মুজিবের সঙ্গে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান গভর্নর রিয়ার এডমিরাল এস এম আহসান ও পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক লেফটেন্যান্ট জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খানের সঙ্গে দুটো করে মোট চারটে বৈঠকের ব্যবস্থা করিয়েছিলেন। চারটে বৈঠকই অনুষ্ঠিত হয় গুলশানের একটি বাড়িতে।

পাশের রুমে গিয়ে শেখ মুজিব এ বি এস সফদারকে বললেন : "বড়ই উদ্বেগের মধ্যে আছি। ক্ষমতা না দেওয়ার পরিকল্পনা চলছে। প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সাহেবজাদা ইয়াকুবের সঙ্গে দেখা করে আসল খবরটা আমাকে জানান।"

এ বি এস সফদার ওইদিনই যোগযোগ করেন সাহেবজাদা ইয়াকুবের সঙ্গে। পরদিন দশটায় পান সময়। তার কাছে শেখ মুজিবের উদ্বেগের কথা শুনে জেনারেল ইয়াকুব জানান যে খবরের পেছনে কোন সত্যতা নেই। তাকে পাশ কাটিয়ে এখানে কোন সামরিক কার্যক্রম গ্রহণ সম্ভব নয়। তিনি বললেন, "Tell Sheikh Sahib not to be worried so long I am here. If situation changes, he would be informed duely. (শেখ সাহেবকে গিয়ে বলুন তিনি যেন উদ্বেগের মধ্যে না থাকেন যতক্ষণ আমি এখানে আছি। পরিস্থিতি নতুন কোন মোড় নিলে অবশ্যই তাকে সময় মতো জানানো হবে।) এ বি এস সফদার ফিরে এসে শেখ মুজিবকে জেনারেল ইয়াকুবের আশ্বাস বাণী শোনালেন। জানান তিনি (এ বি এস সফদার) ২১ ফেব্রুয়ারি দেশের বাইরে চলে যাচ্ছেন। তবে লোক ঠিক করে যাচ্ছেন তার আর জেনারেল ইয়াকুবের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য।

জেনারেল ইয়াকুব শেখ মুজিবকে ওই আশ্বাসবাণী শোনোতে পেরেছিলেন এই কারণে যে, তখনো তিনি জানতেন না ১১ ফেব্রুয়ারি জান্তার গোপন বৈঠকে তাকে সরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। জানতেন না পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক ও পাকিস্তান পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অধিনায়ক আর থাকছেন না। অপরদিকে শেখ মুজিব ১১ ফেব্রুয়ারির ষড়যন্ত্রের আভাস দিয়ে ১৫ ফেব্রুয়ারি বললেন : "ক্ষমতা হস্তান্তর বিলম্বিত করার ষড়যন্ত্র পাকান হচ্ছে...।[২৩]

---

২৩. *বাংলাদেশ ডকুমেন্টস, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৫২।*

www.pathagar.com

জেনারেল ইয়াকুবের কথায় শেখ মুজিব তাৎক্ষণিকভাবে আশ্বস্ত হলেও দু'দিন পর নিশ্চিত হয়ে যান যে, সামরিক হামলা আসছে। তার 'র' সূত্র তাকে নিশ্চিত করে। এই 'র' সূত্র তার দ্বিতীয় ইনার সার্কেল, যার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া তিনি আরো নিশ্চিত হয়ে যান ১৭ তারিখে ইয়াহিয়ার নিজের মন্ত্রী পরিষদ ভেঙে দেয়ায়। তথাপি ইয়াহিয়া খানের প্রতি তার বিশ্বাসে চিড় ধরে না। কারণ, তখনো পর্যন্ত জাতীয় সংসদ অধিবেশনের জন্য নির্ধারিত তারিখে কোন পরিবর্তন আসে নি।

সামরিক জান্তার গোপন বৈঠকের খবরে 'র' তৈরি হয়ে যায় "শতাব্দীর সুযোগ"-এর সর্বোত্তম ব্যবহারে। প্রয়েজন যদি পড়ে সম্মুখ সমরে নামার, তার জন্যেও সে আঁটঘাঁট বাঁধতে থাকে। হামলা পরিচালনায় জান্তার পরিকল্পনা মোতাবেক ২৭ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য ও গোলাবারুদ প্রেরণ কার্যক্রম শুরু হবার প্রায় একই সময়ে ভারত তার কাশ্মীরের লাদাখ এলাকা থেকে চতুর্থ মাউনটেইন ডিভিশন পশ্চিম বাংলায় সরিয়ে আনতে শুরু করে নির্বাচনের অজুহাত তুলে। ওই সময়, ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে ভারতীয় পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৯ মার্চ, ১৯৭১-এ ছিল পশ্চিম বাংলায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের নির্ধারিত দিন। নির্বাচনের আগে পশ্চিম বাংলায় ছিল দুটি ডিভিশন। সিকিম-ভুটান সীমান্তে দুটি এবং নেফায় (উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সি) ছিল দুটি। মোট ছ'ডিভিশন সৈন্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানকে বেষ্টন করে। নির্বাচনী কার্যক্রম তদারকের অজুহাতে কাশ্মীর থেকে অতিরিক্ত একটি মাউনটেইন ডিভিশনের পশ্চিম বাংলায় বিচলনে ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তার পক্ষে তাকে সন্দেহের চোখে দেখাই ছিল স্বাভাবিক। পূর্ব বাংলায় সামরিক কার্যক্রম গ্রহণে পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষের মুখোমুখি এসে দাঁড়াতে পারে. এ আশঙ্কা সামরিক জান্তার ছিলই। কাশ্মীর থেকে পশ্চিম বাংলায় চতুর্থ মাউনটেইন ডিভিশনের বিচলনে সশস্ত্র সংঘর্ষের ওই আশঙ্কাকে দৃঢ়তর করে। তাই, শুধু পূর্ব বাংলার ওপর হামলার লক্ষ্যেই নয়, ভারতীয় সশস্ত্র হুমকি মোকাবেলার প্রশ্নেও মার্কিন প্রশাসনের সবুজ সংকেত জান্তার জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে। জান্তার আশঙ্কা যে সঠিকই ছিল, সেটা আমরা দেখতে পাব ২৫ মার্চের পর। ১৯৭১ সালের মে মাসেই ভারত সশস্ত্র আক্রমণ পরিচালনার মাধ্যমে 'শতাব্দীর সুযোগ'কে কাজে লাগাতে চেয়েছিল।

হামলা পরিচালনার প্রস্তুতি মার্চ মাসের মাঝামাঝি তক চূড়ান্ত না হবার সম্ভাবনা দেখে সামরিক জান্তা আরেক কৌশল অবলম্বন করে। ইয়াহিয়াকে দিয়ে জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করিয়ে দেয়। এর প্রেক্ষাপটে এক দফাকামী চরমপন্থীদের মোকাবেলায় শেখ মুজিব চাইলেন নতুন আরেকটি তারিখ। ২৮ ফেব্রুয়ারি রাতে গভর্নর এম এম আহসান শেখ মুজিবকে গভর্নর হাউজে ডেকে পাঠান ইয়াহিয়ার জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিতকরণ সিদ্ধান্তটি জ্ঞাত করাতে। গভর্নরের সামরিক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীও ছিলেন সেখানে। গভর্নর আহসানের কথায় শেখ মুজিব যা বলেন, সেটা আমরা রাও ফরমান আলীর মুখ থেকেই শুনি : "নিঃসন্দেহে আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করা হল। আমাদের পায়ের নিচের মাটি সরিয়ে ফেলা হল।

www.pathagar.com

শেখ মুজিবের সঙ্গে আরো দু'জন লোক ছিল। তিনি তাদেরকে সরিয়ে দিয়ে একা থেকে গেলেন। পরে বললেন, অধিবেশনের নতুন একটা তারিখ যদি এ মাসেই ঘোষণা করা হয়, তাহলে জনসাধারণকে নিরস্ত্র করা যাবে। আপনি দয়া করে মূলতবি ঘোষণার পর পরবর্তী একটা তারিখ ঘোষণা করার জন্য বলুন।"[২৪]

শেখ মুজিব গভর্নর আহসানকে জাতীয় পরিষদ অধিবেশনের আরেকটি তারিখ ঘোষণার অনুরোধ জানিয়ে স্থগিত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ও একদফাকামী চরমপন্থীদের মোকাবেলায় এবং সারা বাংলার মানুষের ক্রোধ প্রশমনে ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ থেকে ৬ মার্চ সারা পূর্ব বাংলায় সাধারণ ধর্মঘট আহবান করলেন এবং বললেন, ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে পরবর্তী কর্মসূচির ঘোষণা দেবেন। কিন্তু ১ মার্চে ইয়াহিয়ার জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার সাথে সাথে ক্রোধে ফুঁসে ওঠে সারা বাংলার মানুষ। ওই দিন সন্ধ্যায় একদফাপন্থী স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের দশজন তরুণের একটি দুঃসাহসিক দল হামলা চালায় নীলক্ষেত পুলিশ ফাঁড়িতে। রাজপথে নামিয়ে দেওয়া সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে ঢাকায় প্রাণ হারায় কয়েক ব্যক্তি। ২ মার্চে অবতারণা হল অভূতপূর্ব ঘটনার। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজন করে এক প্রতিবাদ সভা। সভায় বক্তৃতা করার কথা ছিল ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ— আ স ম আবদুর রব, নুরে আলম সিদ্দিকী, শাহজাহান সিরাজ, আবদুল কুদ্দুস মাখনসহ আরো কয়েক জনের। সভা শুরু হয় নুরে আলম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে। মঞ্চ কলা ভবনের অলিন্দের ছাদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়নের (ডাকসু) সহসভাপতি আ স ম আবদুর রব যখন বক্তৃতা করছিলেন ঠিক সেই সময় পশ্চিম দিকের গেট দিয়ে একটি ছোট্ট মিছিল সভায় প্রবেশ করে। মিছিলের নেতৃত্বে যিনি ছিলেন, তিনি শেখ মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন, ছাত্রলীগ নগর শাখার সম্পাদক। তার হাতে ছিল ৭ জুন, ১৯৭০ সালে শেখ মুজিবের হাতে তুলে দেয়া 'জয় বাংলা বাহিনী'র সেই পতাকা। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ নেতা হাসানুল হক ইনুর কাছ থেকে শেখ মোহাম্মদ জাহিদ হোসেনের হাতে এ পতাকাটি কিভাবে আসে, সে কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। হাসানুল হক ইনুর কাছ থেকে পতাকাটি নিয়ে জাহিদ হোসেন রেখে দেন নিজের বইয়ের র‍্যাকে। তিনি জানান, তার পরিষ্কার মনে আছে যে ২ মার্চের বটতলায় ছাত্র সভায় আগের দিন তার অগোছালো ঘরটি গোছগাছ করেন তার মা বেগম লুৎফুন্নেছা। পতাকাটি বইয়ের র‍্যাক থেকে তুলে তিনি ভাঁজ করে রাখেন টেবিলের ওপর। বেগম লুৎফুন্নেছা আমাকে দেওয়া ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে বলেন : "ছেলের অগোছালো ঘর গোছাতে গিয়ে র‍্যাকে পাই পতাকাটি। ওই দিনই প্রথম দেখলাম সেটি। ঘরে পতাকা রাখার ব্যাপারে বিপদ-আপদের ভীতি ছিল আমার। কিন্তু ছেলের প্রয়োজনীয় মনে করায় টেবিলের ওপর গুছিয়ে রাখি।"

---

১৪ *উর্দু ডাইজেস্ট*-এ প্রকাশিত রাও ফরমান আলীর লেখা মোস্তফা হারুণ অনুদিত *ভুট্টো শেখ মুজিব*

www.pathagar.com

জাহিদ হোসেনও ভুলে গিয়েছিলেন পতাকার কথা। আমাকে দেওয়া ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে তিনি স্বীকার করেছেন যে অহোরাত্র পার্টির কাজের ব্যস্ততা এবং সর্বক্ষণের উত্তপ্ত পরিস্থিতির কারণে পতাকার অস্তিত্বের কথা তার স্মরণে ছিল না।

মালিবাগের নিজ পাড়া থেকে মিছিলে বের হবার ঠিক আগ মুহূর্তে নিজের ঘরের টেবিলের ওপর পতাকাটি দেখে সেটা তুলে নেন এবং মিছিল করে এসে উপস্থিত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। শেখ মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন বক্তৃতা-মঞ্চের কাছে এগিয়ে যেতে পতাকাটি তুলে নিতে মঞ্চ থেকে হাত বাড়িয়ে ঝুঁকে পড়েন সভার সভাপতি নুরে আলম সিদ্দিকী, ঝুঁকে পড়েন আ স ম আবদুর রবও। জাহিদ হোসেন আ স ম রবের হাতে পতাকা তুলে দেন। কেন তিনি আ স ম রবের হাতে পতাকা তুলে দিলেন, এ প্রশ্নের জবাবে জাহিদ হোসেন আমাকে বলেন : "স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের ছাত্র ফ্রন্টের কর্মী ছিলাম আমি। আ স ম রব ছিলেন স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের ছাত্র ফ্রন্টের নেতা। সে কারণেই তার হাতে পতাকা তুলে দেই। তিনি আমার হাত থেকে পতাকাটি নেন এবং কিছুক্ষণ সেটি সভার শ্রোতা ও দর্শকের উদ্দেশ্যে আন্দোলিত করে অলিন্দের ছাদ থেকে নেমে আসেন। তারপর পতাকা হাতে মিছিল করে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন।" আ স ম রব অলিন্দের ছাদ থেকে যখন নেমে আসেন তখনো সভার কাজ শেষ হতে বাকি। কয়েকজন বক্তা বক্তৃতা রাখার অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু ছাদ থেকে নেমে পতাকা উচিয়ে পা বাড়াতেই এক বিরাট মিছিল তার পেছনে পেছনে চলতে শুরু করে। সভা মাঝ পথেই পণ্ড হয়ে যায় এবং ওই মুহূর্ত হতে, বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায় ছাত্র সভায় উড্ডীনের মুহূর্ত হতে 'জয় বাংলা বাহিনীর' পতাকা এক ঐতিহাসিক মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়ে যায়। সে পতাকা হয়ে যায় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের পতাকা।

আ স ম আবদুর রব মিছিল শেষে ফিরে আসেন ইকবাল হলে। তখন তার হাতে পতাকা নেই। খোয়া গেছে। ওইদিন বিকেলে ঢাকা নগরী এক অপরূপ মোহনীয় সাজে নিজেকে তুললো সাজিয়ে। গাঢ় সবুজ জমিনে রক্তলাল সূর্যের মাঝে সোনালী রঙে আঁকা বাংলাদেশের মানচিত্র সারা অঙ্গে জড়িয়ে ডাক দিল বাঙালিকে। সুউচ্চ ভবন, কানাগলির একতলা বাড়ি কিংবা টিনের চালা সে পতাকা শিরে ধারণ করে উঠে দাঁড়াল হাজার বছরের জমাট বাঁধা অব্যক্ত কান্না বুকে ধরে। ঢাকা যেন জেগে উঠলো অযুত আকাঙ্ক্ষার বাংলাদেশ হয়ে। সূচিত হল এক হতবাক করা ঐতিহাসিক লগ্ন।

স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় জেগে ওঠা ঢাকা নগরী তথা সারা বাংলাদেশ আরো একধাপ এগিয়ে দেয় স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ এবং তার প্রভাবাধীন ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটিকে। পরদিন ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে আয়োজিত ছাত্র জনসভায় ছাত্রলীগ স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আহবান জানালো। ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করলেন। ইশতেহারে আগের দিনে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সভায় উত্তোলিত পতাকাকে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা হিসেবে ঘোষণা করা হলো। অপরদিকে ইয়াহিয়ার জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার

www.pathagar.com

পরদিন অর্থাৎ ২ মার্চ সিরাজ শিকদারের সর্বহারা পার্টির অঙ্গ শ্রমিক সংগঠন পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন শেখ মুজিব ও তার দল আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত এক প্রচারপত্রে বললো :"আপনার ও আপনার পার্টির ছয় দফা সংগ্রামের রক্তাক্ত ইতিহাস স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে যে, ছয় দফার অর্থনৈতিক দাবীসমূহ বাস্তবায়ন সম্ভব সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে, পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন, মুক্ত ও স্বাধীন করে।"[২৫] ১ মার্চ থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত আরো রক্ত ঝরলো। সেনাবাহিনী ও ইপিআর-এর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস) সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে সারা পূর্ব বাংলায় প্রাণ হারায় ১৭২ জন এবং আহত হয় ৩৫৮ জন। এ হিসেব তৎকালীন সরকারি বিজ্ঞপ্তির।

শেখ মুজিবের ১ মার্চ ঘোষণার প্রেক্ষিতে যে দিনটির অপেক্ষায় উন্মুখ ছিল পূর্ব বাংলা তথা সারা পাকিস্তান— এসে যায় সেই ৭ মার্চ। এর আগের দিন ৬ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এক ঘোষণায় ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদ অধিবেশনের তারিখ পুনঃনির্ধারণ করেন। একই দিনে দু' দুটো তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এক নির্দেশ জারির মাধ্যমে জান্তার সদস্য কোর কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করেন এবং অপসারিত হন ভাইস এডমিরাল এস এম আহসান। আর সন্ধ্যায় তিনি টেলিফোনে আলাপ করেন শেখ মুজিবের সঙ্গে, পাঠান গোপন বার্তা। বার্তায় তিনি শেখ মুজিবকে বলেন : "আমি শিগগিরই ঢাকায় আসছি এবং আপনার সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ করবো। আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমি আপনার আকাঙ্ক্ষা ও জনগণের প্রতি দেওয়া আপনার প্রতিশ্রুতির পুরোপুরি মর্যাদা দেব। আমার কাছে একটি পরিকল্পনা আছে, যা আপনাকে ছয় দফা থেকেও বেশি খুশি করবে।"[২৬] পরদিন রেসকোর্স ময়দানে অনুষ্ঠেয় জনসভায় তিনি কি বলবেন, তা নির্ধারণের জন্য ওই রাতেই বসে আওয়ামী লীগ হাই কমান্ডের এক গোপন বৈঠক। একটানা ন' ঘণ্টা চলে সে বৈঠক। শেখ মুজিব সন্ধ্যায় পাওয়া ইয়াহিয়ার পরিকল্পনা ও প্রতিশ্রুতির প্রতি ছিলেন আস্থাবান। তাই তুমুল বাক-বিতণ্ডা শেষে বৈঠকে বক্তৃতার বিষয়বস্তু নির্ধারিত হয়ে যায় স্বাধীনতাকামীদের পাশ কাটিয়ে। ওই গোপন বৈঠকের তথ্যাদি কাউকে জানতে দেওয়া হয় না। কিন্তু ওই সময় লন্ডনের দৈনিক *টেলিগ্রাফ*-এর দক্ষিণ এশীয় সংবাদদাতা ডেভিড লোসাক বৈঠকের আলাপ-আলোচনা সম্পর্কে যে টুকরো-টাকরা তথ্য সংগ্রহ করেন তা তিনি তার *পাকিস্তান ক্রাইসিস* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। বৈঠকে শেখ মুজিব বলেন : "বিচ্ছিন্নতা থেকে পূর্ব পাকিস্তান কিছুই পাবে না... রক্তপাত এবং পীড়ন ছাড়া।... আওয়ামী লীগের ম্যান্ডেট স্বাধীনতার জন্য নয়— স্বায়ত্তশাসনের জন্য।"[২৭]

৭ মার্চের আগে ২৮ ফেব্রুয়ারি মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ ফারল্যান্ড শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করে তার কাছে মার্কিন নীতি তুলে ধরেন এবং তার (শেখ মুজিব) ব্যক্তিগত

---

২৫. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৬৩-৬৬৫।

২৬. সিদ্দিক সালিক প্রণীত লেখক অনুদিত *নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল*, পৃষ্ঠা-৬৪।

২৭. মোহাম্মদ আইউব ও কে সুব্রামানিয়াম : *দ্য লিবারেশন ওয়ার*, পৃষ্ঠা –১১৯।

www.pathagar.com

ও পারিবারিক নিরাপত্তার আশ্বাস দেন। শেখ মুজিবের কাছে ফারল্যান্ডের তুলে ধরা মার্কিন নীতিমালা সম্পর্কে জি ডবলিউ চৌধুরী বলেন : "ফারল্যান্ড মুজিবের কাছে মার্কিন নীতিমালা তুলে ধরেন এবং জানান, তিনি যেন তার বিচ্ছিন্নতাবাদী খেলায় ওয়াশিংটনের দিকে ফিরে না তাকান।"[২৮] আর তাকে (শেখ মুজিব) দেয়া ব্যক্তিগত ও পারিবারিক গ্যারান্টি সম্পর্কে জানা যাবে *এভারসন পেপারস*-এ তুলে দেওয়া ফারল্যান্ডের নিজেরই ভাষ্য থেকে : "যুদ্ধের ওপর যখন ইতিহাস লেখা হবে, প্রমাণিত হবে, মার্কিন নীতি এবং আমাদের স্থানীয় কর্মতৎপরতা শেখ মুজিবকে বাঁচিয়ে রেখেছে।"[২৯]

রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড তার কাছে মার্কিন নীতি তুলে ধরলেও শেখ মুজিবের সম্ভবত তখনো ভরসা ছিল কনসাল জেনারেল আর্চার কে ব্লাডের সঙ্গে তার গোপন বৈঠকের প্রেক্ষিতে ওয়াশিংটনে প্রেরিত তার রিপোর্টের ওপর। আশা ছিল কনসাল জেনারেলের রিপোর্টকে ওয়াশিংটন আস্থায় আনবে এবং জান্তাকে বাধ্য করাতে পারে ক্ষমতা হস্তান্তরে। অথচ তখনো তিনি জানতেন না তার সম্পর্কে ফারল্যান্ডের পর্যবেক্ষণ এবং ইসলামাবাদস্থ সিআইএ স্টেশন প্রধান উলফ-এর রিপোর্টের কথা। তাছাড়া শেখ মুজিব তখন হয়তো বিশ্বাস করেন নি যে, ইয়াহিয়া খানের হাত থেকে জান্তা ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছে। এ ব্যাপারে জি ডবলিউ চৌধুরী[৩০] কি বলেন দেখা যাক : "এ বিষয়ে আমার পর্যবেক্ষণ হচ্ছে যে, ফেব্রুয়ারিতেই আহসানের মতোই ইয়াহিয়াকে অপসারণ করে হামিদকে বসানো হতো, তিনি (ইয়াহিয়া) হয়তো খুশি মনেই বিদায় নিতেন। কিন্তু কিছু কিছু কারণে জান্তা ইয়াহিয়াকে ধরে রাখে। ওয়াশিংটন এবং পিকিংয়ের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের যে দায়িত্ব নিক্সন তার (ইয়াহিয়া) ওপর অর্পণ করেন, সে প্রেক্ষিতে ইয়াহিয়ার অপসারণে বা ইস্তফাদানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষ করে ওয়াশিংটন ও পিকিংয়ের যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতো, সে সম্পর্কে তারা (জান্তা) সচেতন ছিল।[৩১] ইয়াহিয়া যে ফেব্রুয়ারি মাসেই ক্ষমতা হারিয়ে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসেছিলেন, তা শেখ মুজিব সম্ভবত অনুধাবনই করতে পারেন নি। তাই ৭ মার্চ বিকেলে রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত ভাষণে ২৫ মার্চে অনুষ্ঠেয় জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগদানের প্রশ্নে আগের দিন সন্ধ্যায় ইয়াহিয়ার সঙ্গে টেলিফোন আলাপ এবং তাকে প্রেসিডেন্ট করার তার প্রতিশ্রুতির আলোকে চারটি শর্ত আরোপ করলের তিনি, এক. 'সামরিক আইন তুলে নিতে হবে; দুই.ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে; তিন. সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে; চার. বাঙালি হত্যার কারণ খুঁজে বের করার জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি করতে হবে এবং যতদিন দাবী আদায় না হবে ততোদিন অসহযোগ আন্দোলন

২৮. জি ডবলিউ চৌধুরী : *দ্য লাস্ট ডেজ অব ইউনাইটেড পাকিস্তান*, পৃষ্ঠা-১২০।

২৯. জ্যাক এভারসন : *দ্য এভারসন পেপারস*, পৃষ্ঠা-২৭৬।

৩০. জি ডবলিউ চৌধুরী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার যোগাযোগ মন্ত্রী ও শাসনতান্ত্রিক উপদেষ্টা ছিলেন। *লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক অর্ডার*-এর প্রণেতা তিনি।

৩১. জি ডবলিউ চৌধুরী : *দ্য লাস্ট ডেজ অব ইউনাইটেড পাকিস্তান*, পৃষ্ঠা-১৫৬।

www.pathagar.com

চালিয়ে যাবার আহবান জানালেন চাপ সৃষ্টির জন্য। অবশ্যি তিনি বক্তৃতায় এ কথাও বললেন "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

রাওয়ালপিন্ডি সেনা সদর দফতরে শেখ মুজিবের এ ভাষণের প্রতিক্রিয়া ছিল বেশ তাৎপর্যপূর্ণ—"সদর দফতরে টেলিফোনে আলাপকালে একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা জানান যে, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক (প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান) বলেছেন, 'এই পরিস্থিতিতে এটাই সবচেয়ে উত্তম ভাষণ।'[৩২]

শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ভাষণকে অভিনন্দন জানায় পাকিস্তানের দক্ষিণপন্থী দলগুলোও। কাউন্সিল মুসলিম লীগ নেতা মিয়া মমতাজ মোহাম্মদ খান দৌলতানা বলেন, "শেখ মুজিবর রহমানের দাবী অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত এবং পাকিস্তানের বর্তমান রাজনৈতিক সঙ্কট নিরসনে তা গ্রহণ করতে হবে।"[৩৩] পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমির অধ্যাপক গোলাম আজম অনতিবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানান এবং বলেন : "এভাবেই বর্তমান সঙ্কট থেকে জাতির উত্তরণ ঘটতে পারে।"[৩৪] পাকিস্তান কেন্দ্রীয় জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টির সাধারণ সম্পাদক মওলানা সিদ্দিক আহমদ বলেন, "সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবর রহমানের চার দফা দাবী মেনে নিয়ে তার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্য দিয়েই বর্তমান সঙ্কট সমাধান সম্ভব।"[৩৫] এর আগে ৪ মার্চ পাকিস্তান তেহরিকে ইশতেকলাল পার্টি প্রধান অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল আসগর খান বলেন : "যদি এরপরও বর্তমান শাসকরা ক্ষমতা হস্তান্তর না করে তাহলে পূর্ব পাকিস্তানিদের সমর্থনে আমি আন্দোলন শুরু করব। ... ... তিনি বলেন, শেখ মুজিবর রহমানকে সম্প্রতি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে এবং আওয়ামী লীগের ছয় দফায় খারাপ কিছু নেই।"[৩৬]

শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ভাষণকে ইয়াহিয়া এবং পাকিস্তানের দক্ষিণপন্থী দলগুলো অভিনন্দন জানায় বটে, কিন্তু এই ভাষণ ছয় দফাপন্থী ও এক দফাপন্থীদের সরাসরি মুখোমুখি এনে দাঁড় করায়। কাজী জাফর-মেননের কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি ওই ৭ মার্চেই এক প্রচারপত্রে বলা হয় : "আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, নির্বাচনের মাধ্যমে আপোসে স্বাধীনতা আসিবে না— আসিবে না পূর্ব বাংলার কৃষক-শ্রমিক মধ্যবিত্ত তথা সমগ্র জনতার মুক্তি। মুক্তির একমাত্র পথ সশস্ত্র জনতার বিপ্লব—ইতিহাস বারবার এই শিক্ষাই আমাদের দিয়াছে।"[৩৭] কিন্তু ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর) তখনো এক পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে বাঙালীর মুক্তির পথ খুঁজে

---

৩২. লেখক অনূদিত সিদ্দিক সালিকের *নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল*, পৃষ্ঠা ৬৬।

৩৩. *বাংলাদেশ ডকুমেন্টস*, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩৩।

৩৪. *বাংলাদেশ ডকুমেন্টস*, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪৬।

৩৫. *বাংলাদেশ ডকুমেন্টস*, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-০১-২০২।

৩৬. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৬৯৬।

৩৭. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৬৯৭, ৬৯৮, ৬৯৯।

www.pathagar.com

বের করার কথা বলছিল। পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি মোজাফফর আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেনের নামে ৭ মার্চে প্রচারিত পার্টি গৃহীত পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের জন্য ১৭ দফা প্রস্তাবের ১৭ নম্বর প্রস্তাবে বলা হয় : "পাকিস্তানকে একটি পূর্ণ স্বাধীন সার্বভৌম ও জনকল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করিতে হইবে।"[৩৮] পরদিন ৮ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ স্বাধীনতার পক্ষে এক দুঃসাহসিক পদক্ষেপ নেয়। এদিনে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটি স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত নেয় এবং দেশের সকল ছাত্রলীগ শাখা কমিটিকে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ শাখা কমিটি গঠনের নির্দেশ দেয়। ছাত্রলীগ এই দিনে তার সংগঠনের ইতিহাসে স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে আরেকটি সাহসী প্রস্তাব গ্রহণ করে। সংগঠনের নামের আগে 'পূর্ব পাকিস্তান' শব্দ বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়। কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবে বলা হয় : "অদ্যকার এই সভা আগামী কাউন্সিল অধিবেশন পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের পরিবর্তে শুধুমাত্র ছাত্রলীগ ব্যবহৃত হইবে।"[৩৯] একই দিনে গেরিলা যুদ্ধের রণকৌশল সংক্রান্ত এবং এই ধরনের যুদ্ধে ব্যবহার উপযোগী অস্ত্র বিষয়ক একটি বেনামি প্রচারপত্র বিলি করা হয়।"[৪০] পরদিন, ৯ মার্চ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী স্বাধীনতার ডাক দিয়ে বলেন : "আসুন, আমরা ঘোষণা করি যে, পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনই আমাদের লক্ষ্য। এর চেয়ে কম কিছু নয়। আসুন, এই আন্দোলনকে আমরা সত্যিকারের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য দ্বিতীয় ও শেষ পর্যায়ের মরণপণ সংগ্রামে পরিণত করি। সত্যিকারের জাতীয় মুক্তির আর কোন পথ নাই।"[৪১] একই দিনে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)[৪২] এক প্রচারপত্রে বলে, "মুক্তির জন্য শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন নয়, হরতাল- ধর্মঘট নয়,...অস্ত্র হাতে লড়াই করুন; শত শত হত্যার বদলা নিন।...পূর্ব বাংলা মুক্ত করুন। জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা কায়েম করুন।"[৪৩] ওই একই দিনে অর্থাৎ ৯ মার্চে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (মণি সিং)[৪৪] "এই মুহূর্তের জরুরি কর্তব্য" বলে উপদেশ দান করে ছয় দফার মাধ্যমে 'স্বাধীনতা' অর্জনের আহবান জানিয়ে এক প্রচারপত্রে বলে, "কোন কোন নেতা 'স্বাধীন বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছে বলিয়া ধ্বনি তুলিয়া আজিকার গণসংগ্রামের উদ্দীপনা, সংকল্প ও প্রস্তুতিতে ভাঁটা আনিয়া দিতে চাহিতেছেন।...নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর, সামরিক শাসন প্রত্যাহার প্রভৃতি যে দাবিগুলো আওয়ামী লীগ প্রধান (শেখ মুজিব) উত্থাপন করিয়াছেন,

---

৩৮. প্রগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৬৯৭, ৬৯৮, ৬৯৯।

৩৯. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭০৮

৪০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭০৭

৪১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭১২,৭১৩

৪২. এই দলটি হক-তোয়াহা গ্রুপ নামে পরিচিত ছিল।

৪৩. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭১৬, ৭১৭

৪৪. পরবর্তীতে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি

www.pathagar.com

সেগুলি আদায় করিতে পারিলে 'স্বাধীন বাংলা' কায়েমের সংগ্রামে সুবিধা হইবে—ইহা উপলব্ধি করিয়া এই দাবির পেছনে কোটি কোটি জনগণকে সমবেত করা এবং এই দাবিগুলো পূরণে ইয়াহিয়া সরকারকে বাধ্য করা...ইহা হইল এই মুহূর্তের জরুরী কর্তব্য।"[৪৫] এর আগে, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ সালের এই পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টিরই (মণি সিং) নেয়া এক রাজনৈতিক প্রস্তাবের ৩ নম্বর প্রস্তাবে মওলানা ভাসানী এবং স্বাধীনতাকামীদের বিরুদ্ধে বলা হয়, "অন্যদিকে কিছু উগ্র বাঙালী জাতীয়তাবাদী তথাকথিত স্বাধীন পূর্ব বাংলার নামে অবাঙালী বিরোধী জিগির তুলিয়া এবং মওলানা ভাসানী স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের আওয়াজ তুলিয়া জনগণের মনে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ বিরোধী মনোভাব গড়িয়া তুলিয়া অবস্থা আরো জটিল ও ঘোরালো করিয়া তুলিয়াছে।" এবং ওই রাজনৈতিক প্রস্তাবের ৫ নম্বর প্রস্তাবে বলা হয়, "এই সংগ্রামের সফলতার জন্য উগ্র বাঙালী জাতীয়তাবাদের অবাঙালী জনগণ বিরোধী এবং মওলানা ভাসানীর পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ বিরোধী জিগিরের মুখোশও আমাদের খুলিয়া দিতে হইবে।"[৪৬] পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (মণি সিং) তার রাজনৈতিক প্রস্তাবে মওলানা ভাসানী ও স্বাধীনতাকামীদের মুখোশ খুলে ফেলতে বলে এবং এও বলে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান উত্থাপিত দাবি আদায় করতে পারলে 'স্বাধীন বাংলা কায়েমের সুবিধা' হবে। পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (মণি সিং) কথিত শেখ মুজিবের ওই দাবি তথা ছয় দফা সম্পর্কে মুসলিম লীগ সমর্থক দক্ষিণপন্থী করাচির দৈনিক *'দ্য ডন'* কিন্তু ভিন্ন কথা বলে। *'দ্য ডন'* মনে করে নি যে স্বাধীনতার কোন দাবি ছয় দফাতে রয়েছে। ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১-এ *'দ্য ডন'* লেখে, "ফেডারেল পদ্ধতির জন্য ছয় দফা আমাদের দেশের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের পক্ষে একটি ন্যায়সঙ্গত এবং বাস্তবানুগ কর্মসূচি।"[৪৭] *'দ্য ডন'* ছাড়াও অন্যান্য দক্ষিণপন্থী দলগুলো, যেমন, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলামী, জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম, জাস্টিস পার্টি, যাদের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, তারাও মনে করে নি যে ছয় দফার মধ্যে স্বাধীনতার দাবি আছে। সে কারণে তারা শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানায়। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (মণি সিং) ছয় দফার মধ্যে স্বাধীনতা খুঁজে পায়, আর কেউ না পেলেও।

পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (মণি সিং) ছয় দফার মাধ্যমে স্বাধীনতা আসবে বলে মনে করলেও স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ এবং তার নেতৃত্বাধীন স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তা কদাপিও মনে করেনি। তাই তারা স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতিতে নেমে পড়ে। ৭ মার্চের দু'দিন পর অর্থাৎ ৯মার্চ সন্ধ্যায় স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম নেতা হাসানুল হক ইনু ও শরীফ নুরুল আম্বিয়ার[৪৮] নেতৃত্বে

৪৫. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭০৯, ৭১০, ৭১১
৪৬. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র* : দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৫৩, ৬৫৪
৪৭. *বাংলাদেশ ডকুমেন্টস*, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪৭
৪৮. পরবর্তীকালে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (ইনু) নেতা

www.pathagar.com

একদল তরুণ এক অসম সাহসী 'ডাকাতি' সংঘটিত করে। ঢাকা বিজ্ঞান গবেষণাগারে (সায়েন্স ল্যাবরেটরি) হামলা চালায় বিস্ফোরক সংগ্রহের জন্য। পরদিন খবরের কাগজে এই 'ডাকাতির' সংবাদ পড়ে চমকে ওঠে বাংলার মানুষ।

এক দফাপন্থী স্বাধীনতাকামীরা সশস্ত্র লড়াইয়ের প্রস্তুতি যখন নিচ্ছে, শেখ মুজিব তখন আপোসের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন আর জুলফিকার আলী ভুট্টো ও সামরিক জান্তা হামলা প্রস্তুতি চূড়ান্ত করার চেষ্টায় গতি সঞ্চার করে চলেছে। হামলা প্রস্তুতি চূড়ান্ত করার জন্য জান্তাকে আরো সময় করিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে ভুট্টো নতুন খেলায় নামেন। ১৪ মার্চ বলেন : "পূর্ব পাকিস্তানের শাসনভার আওয়ামী লীগের হাতে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা পিপিপির (পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি) হাতে দিতে হবে।"[৪৯] এতে অবস্থা আরো জটিল হয়ে ওঠে। সমঝোতা বৈঠকের নামে পূর্ব বাংলার মানুষকে বিভ্রান্তির মধ্যে রাখার জন্য জান্তা ইয়াহিয়াকে ১৫ মার্চ ঢাকায় পাঠায়। ইতিমধ্যে ঢাকায় এসে পড়েন জান্তার অন্যতম সদস্য লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান। তার হাতে সকল ক্ষমতা হস্তান্তর করে গভর্নর এস এম আহসান ও লেফটেন্যান্ট জেনারেল সাহেবদাজা ইয়াকুব খান বিদায় নিয়ে চলে যান পশ্চিম পাকিস্তানে আর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে আসেন জান্তার সদস্য—জেনারেল হামিদ, লেফটেন্যান্ট জেনারেল ওমর, মেজর জেনারেল আকবর ও পাকিস্তান কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা প্রধান এন এ রিজভি। এরা ছাড়া আরো আসেন কমান্ডো বাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল মিঠ্ঠা খান। তার ওপর দায়িত্ব অর্পিত হয় শেখ মুজিবকে আটকের।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও শেখ মুজিব দু'জনে বৈঠকে বসেন ১৬ মার্চ বেলা এগারটায়। এই বৈঠকে দুজনের মধ্যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে একটি আপোস-সমঝোতা হয়ে যায় পাকিস্তানের অখণ্ডতাকে অটুট রেখেই। পরদিন ১৭ মার্চ দুপক্ষ মুখোমুখি হলো নিজস্ব পরামর্শকদের নিয়ে এবং ২০ মার্চ একপ্রকার স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ১৬ মার্চের আপোস রফার আলোকে ইয়াহিয়া শেখ মুজিবকে আরো ছাড় দিতে রাজি এবং সামরিক আইন প্রত্যাহার ও ক্ষমতা হস্তান্তরে তিনি কমবেশি প্রস্তুতও হয়ে গেছেন। ইয়াহিয়া এই ছাড় দেয়াতে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে জান্তা। তাকে সতর্ক করে দেয়া হয় যে, তিনি অতিমাত্রায় ছাড় দিচ্ছেন। শেখ মুজিবকে ছাড় দেয়া নিয়ে ইয়াহিয়াকে দেয়া জান্তার সতর্ক বাণী সম্পর্কে রাওয়ালপিন্ডি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক দপ্তরের আইন বিশেষজ্ঞ এবং প্রেসিডেন্টের পরামর্শক দলের চতুর্থ ব্যক্তি কর্নেল হাসান জি ডবলিউ চৌধুরীকে জানান : "শেখ মুজিব এবং তার দলের সাথে বৈঠকে পর প্রতিদিন ইয়াহিয়াকে বসতে হত জান্তার সঙ্গে। তিনি শেখ মুজিবকে যে ছাড় দিচ্ছেন তাতে জাতীয় সরকারকে দুর্বল করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে তাকে (ইয়াহিয়া) হুশিয়ার করে দেয় জান্তা।"[৫০] আপোস-সমঝোতা সম্পর্কে আভাস পাওয়া গেল পাকিস্তানের

৪৯. *বাংলাদেশ ডকুমেন্টস*, প্রথম খণ্ড; পৃষ্ঠা-২৩৪, ২৩৫, ২৩৬

৫০. *দ্যা লাস্ট ডেজ অব ইউনাইটেড পাকিস্তান*, পৃষ্ঠা-১৬৭

www.pathagar.com

প্রজাতন্ত্র দিবস মার্চ উপলক্ষে ২২ মার্চে দেয়া প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ভাষণে : "পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চল একটি সমন্বিত পদ্ধতিতে একতানে, একযোগে এবং স্বাচ্ছন্দ্যে বসে সাধারণ লক্ষ্যে যাতে কাজ করে যেতে পারে, আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জন্য সে মঞ্চ এখন তৈরি হয়ে গেছে।"[৫১]

ওই একই দিনে, ২২ মার্চ শেখ মুজিব বলেন : "যদি তারা অনতিবিলম্বে আমাদের দাবি মেনে নেন তাহলে সম্ভবত আমরা বন্ধু হিসেবে এখনো বাস করতে পারব।"[৫২] একই দিনে পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মস্কো) সভাপতি খান আবদুল ওয়ালী খানকে তিনি বলেন যে তিনি এখনো পর্যন্ত অখণ্ড পাকিস্তানে বিশ্বাসী। সাংবাদিক এ্যান্থনি মাসকারেনহাস জানাচ্ছেন আমাদের এ তথ্য : "১৯৭১ সালের ২২ শে মার্চ তারিখে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নেতা খান আবদুল ওয়ালী খান তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'শেখ সাহেব, আমাকে বলুন, আপনি কি এখন পর্যন্ত অখণ্ড পাকিস্তানে বিশ্বাস করেন?' মুজিব এর উত্তরে বলেন, 'খান সাহেব, আমি একজন মুসলিম লীগপন্থী।' মুজিবের উত্তরের তাৎপর্য এই যে, খান ওয়ালী খান ১৯৪৮ সালে উপমহাদেশ বিভক্তির বিরোধিতা করেছিলেন বলে তিনি তাকে ভৎর্সনা করলেন (যে জামাতে ইসলামী এখন পাকিস্তানের আদর্শের রক্ষক বলে দাবি করে, সেই দলও ভারত বিভক্তির বিরোধিতা করেছিল) এবং তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, তিনি অর্থাৎ শেখ মুজিব কেবল পাকিস্তান আন্দোলনকেই সমর্থন করেননি, এখন পর্যন্ত এর ধারণার প্রতি অনুগত রয়েছেন।"[৫৩]

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও শেখ মুজিবের ভাষ্য অনুযায়ী বৈঠকে আলাপ-আলোচনা কতটুকু সফল হয়েছিল? আপোস-সমঝোতায় তারা কতদূর পৌঁছে ছিলেন? এ বিষয়ে জি ডবলিউ চৌধুরীর বক্তব্য সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। আমাকে দেয়া তার এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের কথায় আগে আসি। সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন : "শেষের দিকে, একেবারে আর্মি এ্যাকশন (২৫ মার্চ হামলা পরিচালনার আগে) নেয়ার আগ খানে ইয়াহিয়া যে প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলেন, আমি মনে করি ছয় দফার প্রায় নব্বই ভাগ তার মধ্যে ছিল।" প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে আপোস-সমঝোতায় আসা সত্ত্বেও শেখ মুজিব এবং তার দল আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের ক্ষমতায় যেতে পারল না কেন? জি ডবলিউ চৌধুরী তার *'দ্য লাস্ট ডেজ অব ইউনাইটেড পাকিস্তান'* গ্রন্থে আরো পরিষ্কার করে বলছেন : "পাকিস্তান সরকার প্রকাশিত শ্বেতপত্রে খসড়া ঘোষণা পত্রের সংক্ষিপ্তসার দেয়া হয়। ১৯৭১ সালের মে মাসে আমি এক ব্যক্তিগত সফরে ইসলামাবাদে এবং ঢাকা যাই। তখন এর পুরো মূল অংশটি পড়ি। ঢাকা-সংলাপের মূল

---

৫১. *বাংলাদেশ ডকুমেন্টস*, প্রথম খণ্ড; পৃষ্ঠা–২৬১

৫২. *বাংলাদেশ ডকুমেন্টস*, প্রথম খণ্ড, পৃ: ২৬১

৫৩. অ্যান্থনি মাসকারেনহাস : *বাংলাদেশ লাঞ্ছিত*, ডক্টর মাযহারুল ইসলাম অনূদিত বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৭৩ পৃষ্ঠা: ১৬০ , ১৬১

www.pathagar.com

কপি আমার কাছে ভিন্নতর চিত্র তুলে ধরে। শ্বেতপত্রে আপোসের কথা যা বলা হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি আপোস করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার 'বাংলাদেশ রাজ্য'র (নামকরণও 'বাংলাদেশ রাজ্য' হিসেবে গ্রহণ করা হয়) মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তি করা হয় ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে ইয়াহিয়ার জন্য আমি যে ফর্মূলা তৈরি করে দিয়েছিলাম, সেটাকে। তার ভিত্তি ছিল অখণ্ড পাকিস্তানসহ ছয় দফা। পীরজাদাকে আমি জিজ্ঞেস করি কেন শ্বেত পত্রের পুরো বিবরণ প্রকাশ করা হলো না। এতে তার জবাব ছিল : "চাপ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে একটি ঘোষণাপত্র তৈরি করা হয়।"[৫৪] এবং সতর্ক করে দেয়া সত্ত্বেও শেখ মুজিবের সঙ্গে আপোস-সমঝোতায় আসায় ইয়াহিয়ার যেটুকু ক্ষমতা ছিল, তাও কেড়ে নেয় জান্তা। ইয়াহিয়া অথর্ব হয়ে পড়েন।

জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রথম দিকে ঢাকা-সংলাপে আসতে চাননি। কিন্তু আপোস-সমঝোতার খবর পৌঁছতেই ২১ তারিখে চলে আসেন ঢাকায়। ২২ মার্চ বসেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও শেখ মুজিবের সঙ্গে। জান্তার হয়ে আপোস-সমঝোতা বানচালের জন্য তিনি বলেন, 'সামরিক আইন প্রত্যাহার করা যাবে না। ১৪ মার্চে তোলা 'পাকিস্তানের দু'অংশের সংখ্যাগুরু দলের হাতে আলাদা আলাদাভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরকরণ' বিষয়ক তার সেই দাবির প্রতি রইলেন অনড়।

অপরদিকে আপোস-সমঝোতার খবর রাষ্ট্র হয়ে পড়ায় এক দফাপন্থী স্বাধীনতাকামীরা এবার প্রতিরোধে নামে। স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবস ২৩ মার্চকে 'প্রতিরোধ দিবস' ঘোষণা করে পল্টন ময়দানে মার্চ মিছিল করে। আনুষ্ঠানিকভাবে তোপধ্বনির মাধ্যমে তোলা হয় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। রাইফেলের ফাঁকা আওয়াজ করে ২১ বার তোপধ্বনি করেন কামরুল ইসলাম খসরু এবং পিস্তল ফুটিয়ে পতাকা তোলেন হাসানুল হক ইনু। গীত হলো কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা' স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের চার নেতা নুরে আলম সিদ্দিকী, আ স ম আবদুর রব, শাহজাহান সিরাজ ও আবদুল কুদ্দুস মাখন সালাম জানান বাংলাদেশের পতাকাকে। এরপর তারা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় দীপ্ত চারটি প্লাটুনের অভিবাদন গ্রহণ করেন 'আমার সোনার বাংলার' ব্যান্ডের তালে তালে। ওই মুহূর্ত থেকে 'আমার সোনার বাংলা' স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদায় গেল অভিষিক্ত হয়ে।

অভিবাদন পর্ব শেষ হতেই আ স ম রব একটি খণ্ড মিছিল নিয়ে বেরিয়ে পড়েন শেখ মুজিবের বাসভবনের উদ্দেশ্যে। সেখানে গিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তুলে দেন তার বাড়ির গেটে। অথচ শেখ মুজিবের বাড়িতে যাওয়ার কোন প্রোগ্রামই ছিল না স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের।

শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়ার মধ্যে সর্বশেষ বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হলো ২৪ মার্চ। ইয়াহিয়ার দলের মুখ্য আলোচক পাকিস্তান প্লানিং কমিশনের চেয়ারম্যান এম এম

৫৪. *দ্য লাস্ট ডেজ অব ইউনাইটেড পাকিস্তান*, পৃষ্ঠা-১৬৬

www.pathagar.com

আহমদ বৈঠকে খসড়া ঘোষণাপত্রের সংশোধনীও অনুমোদন করিয়ে নেন। বৈঠক শেষে ২৫ তারিখে শেখ মুজিব বলেন : "সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানে আমাদের কর্তব্য সম্পন্ন করেছি এবং প্রাণপণ প্রচেষ্টা নিয়োজিত করেছি।"[৫৫] একই দিনে তিনি নতুন নির্দেশ জারি করলেন। বললেন, "টেলিফোন ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন, ক্যাবল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন এবং টেলিগ্রাফ ওয়ার্কশপে সকল উৎপাদন বিভাগ অনতিবিলম্বে চালু হবে।"[৫৬] তিনি পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলেন।

২৪ মার্চের বৈঠকে অনুমোদিত খসড়া ঘোষণাপত্রটি লেফটেন্যান্ট জেনারেল এস এম জি পীরজাদার সঙ্গে বৈঠকের পর চূড়ান্তভাবে গৃহীত হবার কথা ছিল। পীরজাদারই জানানোর কথা ছিল অনুষ্ঠেয় বৈঠকের সময়। পীরজাদার তরফ থেকে কোন সাড়া এলো না। এম এম আহমদ ২৫ তারিখ সকালেই রওনা দেন করাচির উদ্দেশ্যে বিনা নোটিশে। এর অর্থ— হামলার প্রস্তুতি চূড়ান্ত হয়ে যাওয়া। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত রাজনৈতিক দলের নেতারা পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের (পিআইএ) বিমান ধরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। যেন আসন্ন মহাপ্রলয়ের সংকেত পেয়ে গেছে ভীত সন্ত্রস্ত পক্ষীকুল। নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটছে প্রাণপণ। ইতোমধ্যে মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে বিদেশীদের ঢাকা ত্যাগ শুরু হয়ে যায়। বিদেশী মিশনগুলো তাদের লোকজন সরানোর কাজও সম্পন্ন করে ফেলে।

ইতিহাসের আরেকটি ভয়াবহতম নরমেধযজ্ঞ সংঘটনের চূড়ান্ত সময় নির্ধারণ করে ফেলে জান্তা। ২৬ মার্চ রাত ১ টায় পরিচালিত হবে হামলা। বর্বর পাকিস্তানি বাহিনী তৈরি হয়েই বসেছিল। অপেক্ষায় ছিল চূড়ান্ত আদেশের। ২৫ তারিখ সকাল এগারটায় জেনারেল টিক্কার কাছ থেকে নির্দেশ গেল ঢাকা সেনানিবাসে জেনারেল অফিসার কমান্ডিং মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজার কাছে। বিলম্ব তার সইছিল না। নির্ধারিত সময়ের দেড় ঘণ্টা আগেই ২৫ তারিখে রাত সাড়ে এগারটায় খাদিম হোসেন রাজা খুলে দিলেন ঢাকা সেনানিবাসের গেট। ট্যাংক, কামান, মর্টার, মেশিনগানে সজ্জিত হয়ে বেরিয়ে আসে তৈমুরীয় দানবরা। হাজার হাজার নিরস্ত্র নিরপরাধ খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের প্রাণ নেয় কেড়ে। স্বেচ্ছাবন্দিত্ব বরণ করলেন শেখ মুজিব। এবং বেজে উঠলো মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর স্বপ্নের অখণ্ড পাকিস্তানের মৃত্যু ঘণ্টা।

আর 'র' আটঘাট বাঁধলো।

---

৫৫. *বাংলাদেশ ডকুমেন্টস*, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৭৪

৫৬. *বাংলাদেশ ডকুমেন্টস*, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৭১

www.pathagar.com

২৫ মার্চ হামলার পর 'র' এবং সিআইএ

আটঘাট বেঁধে 'র' তৈরি হয়েই ছিল।

২৫ মার্চ রাতের হামলার পর দলে দলে হিন্দু-মুসলমান নারী-পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ-যুবা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে আশ্রয় নিতে শুরু করে। আর ৩০ মার্চ 'র'-এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র— ইনস্টিটিউট ফর ডিফেন্স এ্যান্ড অ্যানাল্যাসিসের ডাইরেক্টর কে সুব্রামানিয়াম ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স আয়োজিত এক সিম্পোজিয়ামে বলেন : "যে বিষয়টি ভারতের উপলব্ধিতে আনতে হবে, সেটা হলো পাকিস্তানের ভাঙন আমাদের স্বার্থেই আসবে। এ জাতীয় সুযোগ কখনো আসবে না।"[১] কে সুব্রামানিয়াম যৌথভাবে মোহাম্মদ আইউব এবং তার লেখা *দ্যা লিবারেশন ওয়ার* গ্রন্থের ভূমিকায় লেখেন : "ভারতের জন্য এটা এমন একটি ঘটনা, যা শতাব্দীতে আর ঘটেনি।" 'র'-এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ডাইরেক্টর যখন ২৫ মার্চ হামলাকে অখণ্ড পাকিস্তানকে খণ্ডিত করার জন্য 'শতাব্দীর বিরল ঘটনা' হিসেবে দেখতে পান, সেক্ষেত্রে 'র' তার প্রস্তুতি যে কতটা সম্পন্ন করে ফেলে, তা সহজেই অনুমেয়।

পূর্বশর্ত অধ্যায়ে আমরা দেখেছি ভারতের ছয় ডিভিশনের এক বিশাল বাহিনী আগে থেকেই ঘিরে রেখেছিল পূর্ব পাকিস্তানের চারদিক। উপরন্তু, ৯ মার্চে অনুষ্ঠেয় ভারতীয় পার্লামেন্ট নির্বাচনের অজুহাতে কাশ্মীরের লাদাখ অঞ্চল থেকে পশ্চিম বাংলায় সরিয়ে আনা হয় চতুর্থ মাউনটেন ডিভিশন। এই প্রস্তুতিকে সামনে রেখে বাংলাদেশ মুক্ত করার লক্ষ্যে কে সুব্রামানিয়াম একাই কেবল পূর্ব বাংলায় সামরিক কার্যক্রম গ্রহণ করার কথা বললেন না, তার সঙ্গে কণ্ঠ মেলান প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নিজের দল কংগ্রেস ও বিরোধীদলের কিছু সদস্য। কণ্ঠ মেলান অবসরপ্রাপ্ত কয়েকজন জেনারেলও। তারা প্রধানমন্ত্রীর প্রতি অবিলম্বে পূর্ব বাংলায় সামরিক কার্যক্রম গ্রহণের আহবান জানালেন। ভারতীয় সেনা সদর দফতরের মিলিটারি অপারেটর্সের ডেপুটি ডাইরেক্টর মেজর জেনারেল সুখওয়ান্ত সিং এ সম্পর্কে আমাদের জানাচ্ছেন : "কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল অবিলম্বে সামরিক কার্যক্রম গ্রহণের পক্ষে প্রকাশ্যে এই যুক্তি উত্থাপন করে বলেন, সমুদ্র পথে ভারি অস্ত্রশস্ত্র ও রসদপত্র আনিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিজেকে শক্তিশালী করার আগেই পূর্বাঞ্চলকে মুক্ত করতে হবে। তারা

---

১. লেখক অনুদিত সিদ্দিক সালিকের *'নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল*, পৃষ্ঠা-১০০

www.pathagar.com

যুক্তি দেখালেন, ভারত পাকিস্তানকে যতবেশি সময় দেবে, সামরিক দিক দিয়ে কার্যক্রম তত বেশি ব্যয়বহুল হবে। কার্যক্রম গ্রহণের সময় এখনই— তারা সমস্বরে বললেন। তাদের কেউ কেউ সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এইচ এফ জে মানেকশকে এই বলে অভিযুক্ত করেন যে, তিনি শীতল মনোভাব দেখাচ্ছেন। এই রকম গুজব রটে যে, অর্থমন্ত্রী ওয়াই ভি চ্যাবনের সমর্থন নিয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জগজীবন রাম মিসেস ইন্দিরা গান্ধীকে অবিলম্বে সামরিক কার্যক্রম গ্রহণের কথা বলেন এবং এ ব্যাপারে জেনারেল শ্যাম মানেকশর যদি কোন বিভ্রান্তি থেকে থাকে সেক্ষেত্রে তাকে সরিয়ে দেবার পরামর্শও তারা দেন। বলা হয়, এই যুক্তি উত্থাপন করেন যে ঈশ্বর প্রদত্ত এই সুযোগকে কোন অবস্থাতেই হাতছাড়া করা উচিত হবে না।"[২] অবিলম্বে সামরিক কার্যক্রম গ্রহণের অর্থ বর্ষা মৌসুমের আগেই যুদ্ধ শুরু করা এবং তার সমাপ্তি ঘটানো। ওয়াই ভি চ্যাবন, জগজীবন রাম, অবসরপ্রাপ্ত জেনারেলরা এবং কে সুব্রামানিয়ামের সমর্থকরা সেটাই চাইছিলেন। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী দূরদর্শী রাজনীতিক। তিনি জানতেন, বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সামরিক কার্যক্রম গ্রহণ অপরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের সামিল বলে গণ্য হবে। এতে যে ঝুঁকি বিদ্যমান, তা ভারত নিতে পারে না। ঝুঁকিটা হলো— ইচ্ছে করলেই কোন আঞ্চলিক শক্তি ক্ষুদ্রতর প্রতিবেশীর ওপর সর্বাত্মক আক্রমণ পরিচালনা করতে পারে না, যতক্ষণ না সে কোন না কোন পরাশক্তির সমর্থন পুষ্ট হচ্ছে। পরাশক্তির সমর্থন বা অসমর্থন হলো আজকের বিশ্বের সকল ক্ষুদ্র অথবা আয়তনে বৃহৎ দেশের শক্তিমত্তার পরিচায়ক। তাই পূর্ব বাংলায় সামরিক কার্যক্রম গ্রহণের আগে যে কোন পরাশক্তির সমর্থন ভারতের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এবং প্রয়োজন পড়ে ভারতের জন্য বিশ্ব জনমতেরও। মিসেস ইন্দিরা গান্ধী এ কারণেই অবিলম্বে-সামরিক কার্যক্রমের প্রস্তাব বাতিল করে দেন।

১৯৭১ সালে উপমহাদেশের ক্ষেত্রে পরাশক্তিগুলোর ভূমিকা কি ছিল? ভারতের জানা ছিল যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন দৃঢ় সমর্থন নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাকিস্তানের পেছনে। ২৫ মার্চের বর্বরোচিত হামলার বিরুদ্ধে সারা বিশ্বের গণতন্ত্রকামী মানুষ যখন প্রতিবাদে উচ্চকিত হয়ে ওঠে, তখন মার্কিন প্রশাসন শুধুমাত্র 'উদ্বেগ' প্রকাশের মধ্য দিয়ে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বলেন : "আমরা উদ্বেগের সঙ্গে ঘটনা প্রবাহের প্রতি নজর রাখছি।"[৩] ২ এপ্রিল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আরেক বিবৃতিতে "পাকিস্তানি জনগণের জীবনহানি ও দুঃখ-কষ্ট ভোগে" উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় মাত্র। আর চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই ১৩ এপ্রিল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে প্রেরিত এক বার্তায় বলেন : "এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ব্যাপক জনগণ থেকে গুটিকয়েক ব্যক্তিকে আলাদা করা—যারা

২. মেজর জেনারেল সুখওয়ান্ত সিং : *দ্য লিবারেশন অব বাংলাদেশ* প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮

৩. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২০১

www.pathagar.com

পাকিস্তানের অখণ্ডতা বিনাশ করতে চায়।"[৪] ওই বার্তায় ভারতীয় আগ্রাসনের মুখে পাকিস্তানকে দৃঢ় সমর্থনের কথা ঘোষণা করেন তিনি। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার, যে ভয়ঙ্কর নরহত্যাযজ্ঞ সংঘটিত করে ইয়াহিয়ার সামরিক বাহিনী, সে বিষয়ে একটি বাক্যও চৌ এন লাই তার বার্তায় উল্লেখ করেন না।

একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন সামরিক বল প্রয়োগ, প্রাণহানি ও নিপীড়নে উদ্বেগ প্রকাশই করেন না কেবল, প্রতিবাদও জানায়। সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পোদগর্নি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে প্রেরিত এক চিঠিতে বলেন: "শেখ মুজিবর রহমান এবং অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বন্দি করায় এবং নির্যাতন করায় সোভিয়েত ইউনিয়ন উদ্বেগ বোধ করছে। এই সব নেতারা হালের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সন্দেহাতীত সমর্থন লাভ করেছিলেন। আমরা বিশ্বাস করি, যে জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, বল প্রয়োগ না করে রাজনৈতিকভাবে তার সমাধান করা যায় এবং করতে হবে।"[৫]

সোভিয়েত ইউনিয়ন পাকিস্তান সেনাবাহিনী সংঘটিত নরমেধ যজ্ঞের প্রতিবাদ করলেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অথবা পূর্ব বাংলায় ভারতীয় সর্বাত্মক সামরিক কার্যক্রমে সক্রিয় সমর্থন নিয়ে এগিয়ে আসবে, এ আস্থা কখনোই সোভিয়েতের ওপর আনতে পারেননি মিসেস ইন্দিরা গান্ধী। কেননা, শুরু থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব বাংলার ব্যাপারে একটি রাজনৈতিক সামাধানের কথা বলতে থাকে—বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা নয়। কারণ, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন মনে করেনি। তাই ১৯৭১ সালের মে মাসের কোন এক সময় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির ইলা মিত্র এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির মণি সিংকে যেতে হয়েছিল মস্কোতে। যেতে হয়েছিল সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টিকে বোঝানোর জন্য যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ জাতীয় মুক্তি যুদ্ধ এবং এ যুদ্ধের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের উপাদান রয়েছে। ইলা মিত্র এবং মণি সিংয়ের মস্কো থেকে ঘুরে আসার পরই সোভিয়েত কিছুটা নমনীয় হয়। তথাপি ১৯৭১ সালের ৯ নভেম্বরের আগ পর্যন্ত তাদের কাছ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ জাতীয় মুক্তি আন্দোলন হিসেবে প্রকাশ্য স্বীকৃতি লাভ করে না।

নভেম্বরে একটি সোভিয়েত সংসদীয় প্রতিনিধিদল আসে ভারত সফরে। সংসদীয় দলের নেতা ভি কুদরিয়াভেৎসেভ ৯ তারিখে দিল্লীতে বলেন, "বাংলাদেশে যে সংগ্রাম চলছে তা জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এবং তার মধ্যে গৃহযুদ্ধের উপাদান রয়েছে।"[৬] অবশ্যি বক্তব্যে তিনি পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে বাংলাদেশ সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনাকে বাতিল করে দেন না এবং এই সমস্যা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কোন সশস্ত্র সংঘর্ষও ডেকে আনবে না বলেও তিনি মন্তব্য করেন। এখানে তৎকালীন সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পোদগর্নির উক্তি স্মর্তব্য।

---

৪. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৯৩

৫. *প্রাগুক্ত* : ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৬১, ৫৬২

৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৭৭, ৫৭৮

www.pathagar.com

১৯৭১ সালের ১০ অক্টোবর উত্তর ভিয়েৎনাম যাবার পথে প্রেসিডেন্ট পোদগর্নি দিল্লীতে যাত্রা বিরতি করেন। তার সম্মানে দেয়া এক ভোজসভায় তিনি বলেন : "আমরা মনে করি সামরিক সংঘাতের দিকে আরো ঝুঁকে পড়াকে রোধ করতে হবে।"[৭] মস্কোর ধারণা সম্ভবত এই রকম ছিল যে, রাজনৈতিক সমাধানের পথ তখনো রুদ্ধ হয়ে যায়নি এবং সেটাই ছিল তার কাম্য। কেননা, উপমহাদেশের দুই দেশ ভারত এবং পাকিস্তান আবার আরেকটি সর্বাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত হোক, সোভিয়েত ইউনিয়ন তা চায়নি এ কারণে যে ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে তাসখন্দ চুক্তি সম্পাদনে যে ভূমিকা সে পালন করে এবং এর মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে তার যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, তার মাধ্যমে সে পাকিস্তানকে মার্কিন প্রভাবমুক্ত করার চেষ্টায় ছিল। আরেকটি ভারত-পাকিস্তান সর্বাত্মক যুদ্ধের মধ্যে পাকিস্তানের সঙ্গে তার সেই সম্পর্ক বিনষ্ট হবার সম্ভাবনাই শুধু প্রত্যক্ষ করে না সোভিয়েত রাশিয়া; উপরন্তু পাকিস্তানের অধিক মাত্রায় মার্কিনি প্রভাবাধীন হয়ে পড়ার সম্ভাবনাও তার সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু এক কোটি শরণার্থীর চাপ মুক্ত হতে গেলে ভারতের পক্ষে সর্বাত্মক যুদ্ধে যাওয়া ছাড়া উপায়ও ছিল না। এক্ষেত্রে বিখ্যাত মার্কিন সাংবাদিক জ্যাক এন্ডারসনের বক্তব্য সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য: "কিন্তু এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, বস্তুত যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় ২৫ মার্চ ১৯৭১ থেকেই, যখন ইয়াহিয়া তার সামরিক বাহিনীকে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েমের আদেশ দেন। যখন সীমান্তের অপর পারে গণহত্যা সংঘটিত হচ্ছে, তখন কোন জাতিই উদাসীন থাকতে পারে না। উপরন্তু, এ নির্যাতন বিপুলসংখ্যক শরণার্থীকে ভারতে ঠেলে দেয়। ডিসেম্বরের শুরুর দিকে এক কোটি পূর্ব পাকিস্তানি ক্ষুধার্ত এবং মানবেতর অবস্থার ভেতর দিয়ে এসে জড় হয় হাজার হাজার শরণার্থী ক্যাম্পে। এক অর্থে ভারতের বিরুদ্ধে এটি একটি আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ। কেননা, এমনিতেই ভারত তার কোটি কোটি ক্ষুধার্ত জনগণের খাদ্য সংস্থানে ছিল কঠিন চাপের মধ্যে। তার ওপর একজন অবিমৃষ্যকারীর স্বেচ্ছাচারের দরুণ সৃষ্টি হয় দলে দলে গৃহহীন মানুষের অতিরিক্ত চাপ।"[৮]

ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তা ১৯৭০ সালের নির্বাচনে যে ভুল হিসেব কষে, তারই পুনরাবৃত্তি ঘটে ১৯৭১ সালে হিন্দু বিতাড়নের মধ্যে। সামরিক জান্তার হিসেব ছিল এই—পূর্ববাংলা থেকে হিন্দুদের সীমান্তের ওপারে ঠেলে দিলে ভারত যে অর্থনৈতিক সংকটের আর্বতে নিপতিত হবে, তাতে সে পাকিস্তানের দেয়া শর্তে রাজনৈতিক সমাধানের পথ বেছে নেবে। কিন্তু সামরিক জান্তার কল্পনাতেও আসেনি যে হিন্দুদের সাথে লাখ লাখ মুসলমানও সীমান্ত অতিক্রম করে আশ্রয় প্রার্থী হবে ভারতে। ফলে পুরো ঘটনাই বুমেরাং হয়ে ফিরে আসে এবং মিসেস ইন্দিরা গান্ধী এই শরণার্থী সমস্যাকেই করেন তার পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠনের অন্যতম হাতিয়ার। বেরিয়ে পড়েন ইউরোপের বিভিন্ন দেশ সফরে। বক্তব্য রাখেন ২৭ মার্চ ভারতীয় পার্লামেন্টে দেয়া তার

---

৭. লেখক অনূদিত মেজর জেনারেল সুখওয়ান্ত সিংয়ের *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়*, পৃষ্ঠা -৮৭

৮. জ্যাক এন্ডারসন : *দ্য এন্ডারসন পেপারস*, পৃষ্ঠা-২৬১

www.pathagar.com

নিজের ভাষণের আলোকে। অবিলম্বে যুদ্ধের পক্ষে যারা, তাদের প্রশ্নের জবাবে ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ তিনি পার্লামেন্টে বলেন : "আমি সেই সব সদস্যদের আশ্বস্ত করতে চাই, যারা জিজ্ঞেস করেছেন সময় মতো সিদ্ধান্ত নেয়া হবে কী না, অবশ্যিই সেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ করণীয়। সময় উতরে যাবার পর সিদ্ধান্ত নেবার কোন যৌক্তিকতা নেই। ... একই সময়ে আমাদেরকে আন্তর্জাতিক রীতিনীতি ও অনুসরণ করে চলতে হবে।"[৯]

ইউরোপ সফরে বিশ্ব জনমত ভারতের অনুকূলে মোটামুটি এলেও মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে যুদ্ধে নামা সম্ভব হয়ে ওঠে না সোভিয়েতের প্রত্যক্ষ সমর্থন ছাড়া। কারণ, তিনি জানতেন যুদ্ধ শুরু হলে মার্কিন প্রশাসন পাকিস্তানের পাশে তো দাঁড়াবেই এবং চীন তার এলাকা থেকে আঘাত হানতে পারে। চীন যে যুদ্ধে নামার প্রস্তুতি নেয়, নভেম্বরের শেষ দিকে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চীনা-যুদ্ধ প্রস্তুতির খবর সময় মতো সিআইএ জানিয়ে দেয় পেন্টাগনকে। সিআইএ তার রিপোর্টে বলে : "কয়েক মাস যাবৎ তিব্বত এলাকায় যুদ্ধ প্রস্তুতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তিব্বতের ইয়াং তুং এলাকার ৫৩ তম চীনা স্বতন্ত্র পদাতিক ডিভিশনের ১৫৭তম পদাতিক রেজিমেন্টের সৈন্যদের 'জরুরি উদ্দেশ্যে' ডেকে পাঠানো হয়েছে।"[১০]

ইয়াং তুং হয়ে চীনারা সিকিম ও ভুটানের মধ্য দিয়ে ভারত ভূমিতে পা রাখতে পারে। অবশ্যি ভারতের ওপর চৈনিক হামলায় সোভিয়েত ইউনিয়ন নীরব দর্শকের ভূমিকায় থাকতো না। দিল্লীতে রুশ রাষ্ট্রদূত নিকোলাই পেগোভ ভারতীয় কর্মকর্তাদের চীনা হামলার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন না হবার জন্যে বলেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে চীনারা যদি আঘাত হানে সেক্ষেত্রে রুশরা "ভিন্নমুখী আক্রমণ পরিচালনা করবে।"[১১] ক্রেমলিনের কট্টরপন্থীরা চীনের লন নর হ্রদ এলাকায় আঘাত হানার পরিকল্পনা নেয়। এই এলাকাতেই চীনের পারমাণবিক বোমা তৈরির প্রকল্প। ক্রেমলিনের কট্টরপন্থীদের এই মনোভাবের কথা জানতে পেয়েই চৈনিক নেতারা নিজেদের সংযত করেন।

সিআইএ-'র রিপোর্ট এবং ভারতীয় কর্মকর্তাদেরকে দেয়া সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতের প্রতিশ্রুতিই বলে দেয় যে, সম্ভাব্য ভারত-পাকিস্তান সর্বাত্মক যুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষে চৈনিক আক্রমণের বিষয়টি মিসেস ইন্দিরা গান্ধী আগে থেকেই হিসেবে আনেন। তাই সোভিয়েতের সাহায্য তার জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে এবং তিনি মরিয়া হয়ে ওঠেন সম্ভাব্য ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে সোভিয়েতকে জড়িত করতে। জড়িত করেন ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসের ৯ তারিখে সম্পাদিত ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তির মাধ্যমে। চুক্তি সম্পাদনের পর পরই আরেকটি করণীয় সম্পন্ন করে ফেলেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী। অক্টোবর মাসে এক চুক্তির মাধ্যমে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেললেন অস্থায়ী বাংলাদেশ

৯. *বাংলাদেশ ডকুমেন্ট*, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৬৯

১০. জ্যাক এন্ডারসন : *দ্য এন্ডারসন পেপারস*, পৃষ্ঠা-৩১৯

১১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩১৯

www.pathagar.com

সরকারকে। এ চুক্তি সম্পাদনের পর থেকেই মুক্তিবাহিনীর গেরিলা অপারেশন সুসংগঠিত করতে বিশেষ মনোযোগী হয়ে ওঠে ভারতীয় সেনা কর্তৃপক্ষ। এ চুক্তি গোপন সাত দফা চুক্তি নামে খ্যাত, যা আজ পর্যন্ত দু'দেশের সরকার—বাংলাদেশ এবং ভারত; প্রকাশ করেনি।

> চুক্তির শর্তগুলো হচ্ছে : (১) যারা সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে শুধু তারাই প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে নিয়োজিত থাকতে পারবে। বাকীদের চাকুরিচ্যুত করা হবে এবং সেই শূন্যপদ পূরণ করবে ভারতীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তারা (২) বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশে অবস্থান করবে (কতদিন অবস্থান করবে, তার সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় না)। ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাস থেকে আরম্ভ করে প্রতি বছর এ সম্পর্কে পুনীরিক্ষণের জন্য দু' দেশের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে (৩) বাংলাদেশের কোন নিজস্ব সেনাবাহিনী থাকবে না (৪) অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য মুক্তিবাহিনীকে কেন্দ্র করে একটি প্যারামিলিশিয়া বাহিনী গঠন করা হবে (৫) সম্ভাব্য ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে অধিনায়কত্ব দেবেন ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান, মুক্তিবাহিনী সর্বাধিনায়ক নন এবং যুদ্ধকালীন মুক্তিবাহিনী ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়কত্বে থাকবে (৬) দু' দেশের বাণিজ্য হবে খোলা বাজার (ওপেন মার্কেট) ভিত্তিক। তবে বাণিজ্যের পরিমাণ হিসাব হবে বছরওয়ারি এবং যার যা পাওনা সেটা স্টার্লিংয়ে পরিশোধ করা হবে (৭) বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের প্রশ্নে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে এবং ভারত যদ্দুর পারে এ ব্যাপারে বাংলাদেশকে সহায়তা দেবে।

১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে ভারতের সঙ্গে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার সম্পাদিত এই সাত দফা গোপন চুক্তির তথ্য আমাকে এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের দিল্লী মিশন প্রধান হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী। অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে সাত দফা গোপন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরদানের পর পরই তিনি মুর্ছা যান।

ভারত অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারকে এই চুক্তিতে আবদ্ধ করায় কেন? এর চমৎকার জবাব দেয়া যায় পশ্চিম বাংলার নকশাল বাড়ি আন্দোলনের নেতা চারু মজুমদারের ভাষ্যে: "কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—শাসক শ্রেণীর এই আওয়াজ দেয়া হয়েছে লুণ্ঠনের স্বার্থে।"[১২]

ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি এবং অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে সাত দফা চুক্তি সম্পাদনের মধ্য দিয়ে যুদ্ধে লড়ার লক্ষ্যে সকল রাজনৈতিক করণীয় সম্পন্ন করে ফেলেন মিসেস ইন্দিরা গান্ধী। অন্যদিকে অক্টোবরেই ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মানেকশ তার বাহিনীকে একটি সর্বাত্মক যুদ্ধে লড়ার উপযুক্ত করে তোলেন। অবিলম্বে-যুদ্ধ কার্যক্রমের পক্ষে যারা ছিলেন, বর্ষা মৌসুম শুরু হবার আগেই

---

১২. চারু মুজমদার "আধুনিক শোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যান" চতুর্থ দলিল

www.pathagar.com

বাংলাদেশকে মুক্ত করার আওয়াজ তুলেছিলেন যে কট্টরপন্থীরা, তাদেরকে ওই সময় জেনারেল মানেকশ এই বলে হতাশ করেন যে, ভারতীয় সেনাবাহিনী একটি সর্বাত্মক যুদ্ধে লড়ার প্রস্তুতিতে নেই। প্রস্তুতির জন্য কমপক্ষে ন'মাসের সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু নির্ধারিত ন'মাসের আগেই তিনি প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলেন।

সবকিছু গুছিয়ে আনা সত্ত্বেও মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে তখনো যুদ্ধে নামা সম্ভব ছিল না। কেননা, নভেম্বরের আগ পর্যন্ত যুদ্ধ প্রশ্নে সোভিয়েতের সুস্পষ্ট সমর্থনের ইঙ্গিত মেলেনি। ওই মাসে অর্থাৎ নভেম্বরে ভারত-সোভিয়েত চুক্তির প্রেক্ষাপটে সোভিয়েত বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার মার্শাল কুতুকভের নেতৃত্বে একটি সোভিয়েত সামরিক প্রতিনিধি দল আসে ভারত সফরে। সামরিক প্রতিনিধি দলের পর পরই আসেন সোভিয়েত প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মার্শাল গ্রেচকো। এই সফরের মধ্য দিয়েই সোভিয়েত সমর্থন নিশ্চিত হয়ে যায় এবং মিসেস ইন্দিরা গান্ধী এবার নিঃশঙ্কচিত্তে নামেন যুদ্ধ-ময়দানে। ২১ নভেম্বর শুরু হয় ভারত-পাকিস্তান সর্বাত্মক যুদ্ধের অঘোষিত মহড়া। ওই তারিখে ভারতীয় সেনাবাহিনী ট্যাংক বহর পাঠিয়ে বাংলাদেশ সীমান্তের অভ্যন্তরে বিরাট এলাকা দখল করে খুঁটি গেড়ে বসে পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায়। নির্দেশ আসে ৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যার পর, যখন পশ্চিমাঞ্চলে ভারতীয় বিমান ঘাঁটিতে পাকিস্তানি বোমারু বিমান বোমা বর্ষণ শুরু করে এবং আরম্ভ হয়ে যায় তৃতীয় ভারত-পাকিস্তান সর্বাত্মক যুদ্ধ।

www.pathagar.com

'র' এবং মুজিব বাহিনী

২৫ মার্চের পর শুধু যুদ্ধ প্রস্তুতিই নয়, যুদ্ধের পর স্বাধীন বাংলাদেশে ভারতীয় আধিপত্য যাতে বজায় থাকে, সে পরিকল্পনা রচনার প্রস্তুতি নেয় ভারত সরকার এবং পরিকল্পনা তৈরির দায়িত্ব অর্পিত হয় ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' -এর ওপর। অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের নেতৃত্বাধীনে বাঙালি যখন মরণপন লড়াইয়ে লিপ্ত, মুক্তিবাহিনীর অকুতোভয় যোদ্ধারা যখন জীবনবাজি রেখে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কামান আর মেশিন গানের মুখোমুখি যুদ্ধরত, তখন 'র' অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের অজ্ঞাতে উত্তর ভারতের দেরাদুনের কাছাকাছি তানদুয়ায় গড়ে তুলতে থাকে তার নিজস্ব বাহিনী। সে বাহিনীর নাম মুজিব বাহিনী। এই বাহিনী গঠন প্রক্রিয়ার পশ্চাৎপটে আমরা এখন যাব।

যুদ্ধ প্রস্তুতি, অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ ও মুক্তিবাহিনীর সহায়তাদান সংক্রান্ত বিষয়ে ভারত সরকার তিনটি কমিটি গঠন করে। একটি রাজনৈতিক এবং অপর দুটি সামরিক। ভারত সরকার এবং অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করে রাজনৈতিক কমিটি। এ কমিটির প্রধান করা হয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্লানিং কমিশনের চেয়ারম্যান ডি পি ধরকে। আর যুদ্ধ প্রস্তুতি সংক্রান্ত যুদ্ধ কাউন্সিলের প্রধান করা হয় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মানেকশকে। ডি পি ধরকে যুদ্ধ কাউন্সিলেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জেনারেল মানেকশ সেনাবাহিনী উপপ্রধানকে চেয়ারম্যান করে আরেকটি কমিটি তৈরি করেন। সেটা যুগ্ম গোয়েন্দা কমিটি। কমিটিতে 'র'-কেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যদিও সেনাবাহিনী উপপ্রধানকে করা হয় এর চেয়ারম্যান কিন্তু জেনারেল শ্যাম মানেকশই থাকেন চূড়ান্ত নির্দেশদানের অধিকর্তা। যুগ্ম গোয়েন্দা কমিটি যুদ্ধ প্রস্তুতিতে তার দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী তরুণদের নিয়ে একটি বিশেষ বাহিনী গঠনের পরিকল্পনাতেও নেমে পড়ে। পরিকল্পনাকে ফলপ্রসূ করে তোলার দায়িত্ব পড়ে তার অঙ্গ সংগঠন 'র'-এর ওপর। জেনারেল শ্যাম মানেকশ নিজেই থাকেন এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে। আর এই বাহিনী গঠনে ডেকে পাঠানো হয় বিশেষ বাহিনী তৈরিতে পারদর্শী মেজর জেনারেল উবানকে। তিনি অতি নিষ্ঠার সঙ্গে কাজে লেগে যান। কাজটি তার জন্য সহজ হয়ে গেল তাজউদ্দীন আহমদের প্রধানমন্ত্রী হবার ঘটনায়। তাজউদ্দীন আহমদ প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন আওয়ামী লীগের চার যুবনেতা। তাদের ক্ষোভের সুযোগ নেয়া হল। যদিও তাদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল আগে থেকে, অন্যভাবে এবং গড়ে ওঠে মুজিব বাহিনী।

www.pathagar.com

জেনারেল উবান তার যাবতীয় নিষ্ঠা প্রয়োগে গড়ে তুলতে থাকেন মুজিব বাহিনী। তিনি এর গঠন প্রক্রিয়া এবং কার্যক্রমের জন্য দায়ী থাকেন সরাসরি সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল শ্যাম মানেকশর কাছে। এ কারণে তার বাহিনী এক সময় 'শ্যাম মানেকশর ছেলেরা' নামে পরিচিতি লাভ করে। সেহেতু মেজর জেনারেল উবান মুজিব বাহিনীর ব্যাপারে দায়ী ছিলেন সরাসরি জেনারেল মানেকশ আর 'র'-এর ডিরেক্টর আর এন কাওয়ের কাছে—যিনি ছিলেন ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েটের সেক্রেটারি; তার বেসামরিক ওপরঅলা। অবশ্যি জেনারেল উবান তাকে 'র'-এর ডিরেক্টর হিসেবে উল্লেখ করেননি তার *ফ্যানটমস অব চিটাগং : ফিপথ আর্মি ইন বাংলাদেশ* বইয়ের কোথাও। আর এন কাওয়ের এই দ্বৈত পরিচয় তিনি এড়িয়ে গেছেন। জবাবদিহি মাত্র দু'জনের কাছে করতে হতো বলেই তিনি নির্দ্বিধায় ভারতীয় পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল আরোরার অজ্ঞাতে তার বাহিনীর ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছেলেদের পাঠাতে শুরু করেন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে। এতে পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডে তৈরি হয়ে যায় দ্বৈত অধিনায়কত্ব এবং স্বাভাবিক কারণেই জেনারেল আরোরার কাছে তা গ্রহণযোগ্য হবার কথা নয়। তিনি সেনাবাহিনী সদর দফতরকে বলেন মুজিব বাহিনীকে তার অধিনায়কত্বে ছেড়ে দিতে। তার অনবরত চাপে ডাইরেক্টর অব মিলিটারি অপারেটর্স লেফটেন্যান্ট জেনারেল কে কে সিং মুজিব বাহিনীর তাৎপর্য সম্পর্কে তাকে অবহিত করেন। তাজউদ্দীন আহমদ যখন মুজিব বাহিনীর অস্তিত্বের কথা জানতে পান, তখন তিনিও জেনারেল শ্যাম মানেকশকে অনুরোধ জানান এই বাহিনীকে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের নেতৃত্বাধীন ছেড়ে দিতে। জেনারেল মানেকশ তাকে জানান যে, সেনাবাহিনীর বিশেষ দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য তৈরি করা হয়েছে এই বাহিনী। কিন্তু কী সে দায়িত্ব, সে সম্পর্কে তাজউদ্দীন আহমদকে তিনি কী বলেছিলেন, তা জানা যায় না। মুজিব বাহিনী সংগঠক জেনারেল উবান তার *ফ্যানটমস অব চিটাগং : ফিপথ আর্মি ইন বাংলাদেশ* গ্রন্থেও সে বিষয়ে কিছুই উল্লেখ করেননি। তবে সাত দফা গোপন চুক্তির আলোকে এ বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য অনুধাবনে বেগ পাবার কথা নয়। তা হল, মুক্তিবাহিনীর এক বিরাট সংখ্যক সদস্য বামপন্থী চিন্তাধারায় সিক্ত। স্বাধীনতার পর এরা ভারতীয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে—এই চিন্তা থেকে এদেরকে নির্মূলের লক্ষ্যে প্রয়োজন হয়ে পড়ে একটি আজ্ঞাবহ বাহিনীর। আর সে বাহিনী গড়ে উঠবে শেখ মুজিবের নামে এবং মুজিবের রাজনীতির নামে সে বাহিনী পরিচালিত হবে বামপন্থী নির্মূলে। তবে মুজিব বাহিনী তৈরি করে 'র' যা করতে চেয়েছিল, কার্যক্ষেত্রে ঘটে যায় উল্টোটি। কারণ, খোদ মুজিব বাহিনীর ভেতরই সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও বামপন্থী চিন্তাধারার অনুবর্তী ছিল শতকরা আশি ভাগ।

মুজিব বাহিনী কাদের নিয়ে গঠিত হয়, কি উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়, এ সবই এসেছে জেনারেল উবানের *ফ্যান্টমস অব চিটাগং : ফিপথ আর্মি ইন বাংলাদেশ* গ্রন্থে। আসেনি কেবল মুজিব বাহিনী নেতা চতুষ্টয় সিরাজুল আলম খান, শেখ ফজলুল হক মনি, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমদের সঙ্গে কোথায়, কার মাধ্যমে তার প্রথম পরিচিতি ঘটে, এই প্রসঙ্গটি। বইতে শুধু বলেছেন এক বন্ধুর বাড়িতে তাদের প্রথম

www.pathagar.com

দেখা ও বৈঠক। কিন্তু তার সেই বন্ধু যে চিত্তরঞ্জন সুতার, এ নামটি ভুলেও তিনি আনেননি বইয়ের কোথাও। তিনি চিত্তরঞ্জন সুতারের নামটি উচ্চারণ না করলেও আমরা তা জানতে পাব আবদুর রাজ্জাকের ভাষ্য থেকে। আর এই সুতারের পরিচয় তো আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়েই পেয়েছি। তাতে পরিষ্কার হয়ে যায় 'র'–এর সঙ্গে জেনারেল উবান ও মুজিব বাহিনীর যোগসূত্রটি। এবার আমরা আসতে পারি আবদুর রাজ্জাকের ভাষ্যে। আর মুজিব বাহিনী সম্পর্কে জেনারেল উবানের ভাষ্যে আসবো পরে।

আবদুর রাজ্জাক আমাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন : "জায়গা মত যেয়ে দেখি যে, শেখ ফজলুল হক মণি ও তোফায়েল আহমদ।...সে জায়গাটা কলকাতায় ২১ নম্বর রাজেন্দ্র রোড; যেখানে চিত্তরঞ্জন সুতার বঙ্গবন্ধুর (শেখ মুজিব) রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।...তিনি ভারত সরকারের সঙ্গে আলাপ করলেন। সেই আলাপের প্রেক্ষিতে একজন অফিসার আসেন।...জেনারেল উবানই এসেছিলেন।" সাক্ষাৎকারটি ঘটে ১৯৭১ সালের মে মাসের গোড়ার দিকে এবং চূড়ান্ত হয়ে যায় মুজিব বাহিনী তৈরির প্রক্রিয়া।

আবদুর রাজ্জাকের সাক্ষাৎকারেই আমরা দেখতে পাব কী নিপুণ কৌশলে চিত্তরঞ্জন সুতার এই চারজনকে তাজউদ্দীন আহমদের প্রধানমন্ত্রী হবার ঘটনাকে অজুহাত করে ঐক্যবদ্ধ করেন। যুবনেতা চতুষ্টয় মনে করতেন,—যেহেতু আওয়ামী লীগের ভেতর ছাত্রলীগের তরুণরাই হচ্ছে যোদ্ধৃ অংশ; তাদের নেতৃত্বে আছেন তারাই—সেহেতু মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দেবার কথা তাদেরই। মাঝখান দিয়ে প্রবাসী সরকার গঠন করে তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী হয়ে নেতৃত্ব নিজের হাতে তুলে নেবেন, এ তাদের মোটেই কাম্য ছিল না। চিত্তরঞ্জন সুতার এটাকে উস্কে দেন এভাবে : "আপনাদের ভেতর মত পার্থক্য কেন হচ্ছে? আপনারা এক থাকেন। সরকারের (ভারত সরকার) সঙ্গে কথা বলেন, সরকার তো আপনাদেরকেই চেনে,"—আবদুর রাজ্জাক আমাকে বলেন একথা।

যুবনেতা চতুষ্টয় চিত্তরঞ্জন সুতারের এই আশ্বাসের প্রেক্ষিতে তাজউদ্দীন আহমদের প্রধানমন্ত্রিত্বের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে যুদ্ধ কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব তোলেন। তাদের প্রস্তাব অনুযায়ী স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনা করবে যুদ্ধ কাউন্সিল। কেননা, তাদের মতে, মুক্তিবাহিনীতে ঢুকে যাচ্ছে এমন সব লোক যারা যুদ্ধে অনাগ্রহী এবং পাকিস্তানপন্থী। জেনারেল উবানের ভাষ্য অনুযায়ী "বামপন্থী ও নকশালপন্থী নৈরাজ্যিকরা।" কিন্তু প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার তাদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে। আর অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের প্রশ্নে ভারত সরকারকে আন্তর্জাতিক রীতিনীতি অবশ্যিই অনুসরণ করতে হয়। এক্ষেত্রেও তারা হতাশ হন এবং ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন আরো বেশি মাত্রায়। অতএব, বিকল্প হিসেবে নিজেদের নেতৃত্বে একটি সমান্তরাল বাহিনী গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় নামেন এবং চিত্তরঞ্জন সুতার সে ব্যবস্থা সম্পন্ন করে ফেলেন। দৃশ্যপটে হাজির হয়ে যান জেনারেল উবান।

www.pathagar.com

জেনারেল উবানের সঙ্গে চার যুবনেতার সাক্ষাতের দু'সপ্তাহের মাথায় মুজিব বাহিনীর প্রথম দলটি ভারতীয় মিলিটারি একাডেমী শহর দেরাদুন থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে পাহাড় শীর্ষের শহর তানদুয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। প্রশিক্ষণ শুরু হয় ১৯৭১ সালের মে মাসের ২৯ তারিখে। আরেকটি ট্রেনিং ক্যাম্প খোলা হয় মেঘালয়ের তুরার কাছাকাছি হাফলং-এ। মাত্র একটি দলের ট্রেনিং শেষে এ ক্যাম্পটি তুলে দেয়া হয়। তানদুয়ার ট্রেনিং ক্যাম্পের মূল পরিকল্পক ও পরিচালক ছিলেন মেজর জেনারেল উবান।

প্রথম দলটি, যার সংখ্যা ২৫০, তাদের ট্রেনিং দেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসাররা। ট্রেনিং শেষে এদের ভেতর থেকে ৮ জনকে করা হয় প্রশিক্ষক। হাসানুল হক ইনুকে করা হয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রধান। প্রশিক্ষকরা হলেন শরীফ নুরুল আম্বিয়া, আফম মাহবুবুল হক, রফিকুজ্জামান, মাসুদ আহমদ রুমী, সৈয়দ আহম্দ ফারুক, তৌফিক আহমদ ও মোহনলাল সোম। পরে প্রশিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানো হয়। করা হয় বাহান্নো। এরাই বাকি দশ হাজার মুজিববাহিনী সদস্যকে প্রশিক্ষণ দেন। ট্রেনিং প্রদান বন্ধ হয়ে যায় নভেম্বর ১৯৭১ সালের ২০ তারিখে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালনায় ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন ব্রিগেডিয়ার আর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রধান হাসানুল হক ইনুর ওপরঅলা ছিলেন একজন কর্নেল। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অন্যান্য ভারতীয় অফিসারদের মধ্যে ছিলেন মেজর মালহোত্রা। তাকে আমরা আবারো দেখতে পাব রক্ষীবাহিনী গঠন কার্যক্রমে।

মুজিব বাহিনীর অপারেশন পরিচালনার জন্য চার যুবনেতা বাংলাদেশকে চারটি সেক্টরে ভাগ করে নেন। বৃহত্তর রংপুর, রাজশাহী, পাবনা, দিনাজপুর নিয়ে উত্তরাঞ্চলীয় সেক্টর-এর দায়িত্বে ছিলেন সিরাজুল আলম খান। সেকেন্ড-ইন-কমান্ড ছিলেন মনিরুল ইসলাম ওরফে মার্শাল মণি। বৃহত্তর খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, বরিশাল এবং পটুয়াখালী নিয়ে দক্ষিণাঞ্চলীয় সেক্টর,-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছিলেন তোফায়েল আহমদ। সেকেন্ড ইন-কমান্ড ছিলেন কাজী আরেফ আহমেদ। বৃহত্তর চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম , কুমিল্লা,. নোয়াখালী, সিলেট এবং ঢাকা জেলার কিছু অংশ নিয়ে পূর্বাঞ্চলীয় সেক্টর। শেখ ফজলুল হক মণি ছিলেন এই সেক্টরের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। সেকেন্ড-ইন-কমান্ড ছিলেন আ স ম আবদুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখন। আর কেন্দ্রীয় সেক্টর ছিল বৃহত্তর ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল এবং ঢাকা জেলার কিছু অংশ নিয়ে। সদর দফতর ছিল মেঘালয়ের ডালুতে। এই সেক্টরের দায়িত্বে ছিলেন আবদুর রাজ্জাক। সেকেন্ড-ইন-কমান্ড ছিলেন সৈয়দ আহমদ।

চার যুবনেতা সিরাজুল আলম খান, শেখ ফজলুল হক মণি, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমদের ওপর ছিল মুজিব বাহিনীর কর্মী সংগ্রহের দায়িত্ব। ছাত্রলীগ কর্মী এবং শেখ মুজিবের কট্টর অনুসারীর বাইরের কারোরই মুজিব বাহিনীতে প্রবেশাধিকার ছিল না। মুজিব বাহিনীর জন্য ভারত সরকার প্রদত্ত অস্ত্রশস্ত্র এবং ব্যয় নির্বাহে আর্থিক সহায়তার সমন্বয় বিধান করতেন জেনারেল উবান। তার মাধ্যমেই অস্ত্র এবং বাজেট

www.pathagar.com

অনুযায়ী অর্থ সরাসরি চলে আসতো চার যুবনেতার হাতে। দেয়া হতো সেক্টর ভিত্তিক। চার যুবনেতা পেতেন জেনারেলের মর্যাদা। যাতায়াতের জন্য পেতেন হেলিকপ্টার।

২৫ মার্চের আগে শেখ ফজলুল হক মণি ও সিরাজুল আলম খানের ভেতর স্বাধীনতার প্রশ্নে যে মতবিরোধ ছিল, ভারতের মাটিতে পা দেয়ার পর তার অবসান ঘটে। কিন্তু মুজিব বাহিনী গঠনের প্রারম্ভিক কাল থেকে আরেকটি বিরোধ অংকুরিত হতে থাকে—সেটা যেমন নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব, তেমনি মতাদর্শগত বিরোধও এবং এক সময় বিরোধ প্রকট হয়ে দেখা দেয়। তাদের এই বিরোধের প্রথম প্রকাশ আমরা দেখতে পাই ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির ১৯৭০ সালের ১২ আগস্টের বৈঠকে স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রস্তাব গৃহীত হবার কালে। ছাত্রলীগের যে গ্রুপটি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে, তার প্রকাশ্য নেতৃত্বে নুরে আলম সিদ্দিকী ও আবদুল কুদ্দুস মাখন ছিলেন বটে, পেছনের শক্তি ছিলেন শেখ ফজলুল হক মণি। এর বিস্তারিত আমরা পেয়েছি পূর্ববর্তী অধ্যায়ে।

শেখ ফজলুল হক মণি তখন ছাত্র ছিলেন না ঠিকই, বৃহত্তর রাজনীতিতে প্রবেশের চেষ্টায় ছিলেন, তবে ছাত্রলীগের নেতৃত্ব নিজের মুঠোয় রাখার প্রয়াস থেকে দূরে ছিলেন না। অপর গ্রুপের নেতৃত্বে ছিলেন সিরাজুল আলম খান। তার স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ডাক-এর প্রতি ছাত্রলীগের বেশিরভাগ তরুণ ঝুঁকে পড়লেও সমাজতন্ত্রের প্রতি সিরাজুল আলম খানের ব্যক্তিগত বিশ্বস্ততার প্রশ্নটি সংশয়ের উর্ধ্বে রাখা যায় না আবদুর রাজ্জাকের ভাষ্য অনুযায়ী। আবার সমাজতন্ত্রকে তিনি ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ চরিতার্থে ব্যবহার করেছিলেন কিনা, এ প্রশ্নও এড়িয়ে যাওয়া যায় না। বলার অবকাশ রয়ে যায় যে, ২৫ মার্চের আগে সিরাজুল আলম খান ও শেখ ফজলুল হক মণির ভেতর যে দ্বন্দ্ব বিরাজমান ছিল, সেটা ছিল একক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্ব এবং সমাজতন্ত্রের শ্লোগান তুলে একক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্বকে সুকৌশলে মতাদর্শগত দ্বন্দ্বে রূপ দিতে পেরেছিলেন সিরাজুল আলম খান। ভারতের মাটিতেও ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ প্রতিষ্ঠার পুরোনো দ্বন্দ্বটি ঢাকা পড়ে যায় তথাকথিত মতাদর্শগত দ্বন্দ্বের আড়ালে।

এবার আমরা আবদুর রাজ্জাকের ভাষ্যে আসতে পারি। দেখতে পাব সমাজতন্ত্রের প্রতি সিরাজুল আলম খানের বিশ্বস্ততার প্রশ্নে তার বক্তব্য। আবদুর রাজ্জাক বলেন : "ভারতে যতদিন ছিলেন যুদ্ধে তিনি (সিরাজুল আলম খান) তো যানইনি, কলকাতাতেই অধিকাংশ সময় ছিলেন। ওখানে তার যে ক্যাম্প ইনচার্জ ছিলেন শিলিগুড়ির পাংগা ক্যাম্প,—তার ইনচার্জ ছিলেন মনিরুল ইসলাম ওরফে মর্শাল মণি এবং মান্নানকে দায়িত্ব দিয়ে কলকাতাতেই থাকতেন। কলকাতায় কোথায় কি করতেন, কাউকে জানতে দিতেন না। পরবর্তীকালে খবর পাওয়া গেল তিনি নকশালদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। এসইউসি'র (সোলালিস্ট ইউনিটি সেন্টার : নেতা শিবদাশ ঘোষ) সঙ্গেও যোগাযোগ করেছেন। সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ, যিনি দক্ষিণপন্থী লবির লোক, তার সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল সিরাজুল আলম খানের। মোটিভটা ধরা পড়েছে অনেক পরে—যখন আমরা দেখলাম পিটার কাসটারর্সের সঙ্গে তার সংযোগ, যখন দেখলাম পশ্চিম বাংলার অতি বামপন্থীদের সঙ্গে তার যোগসূত্র

www.pathagar.com

রয়েছে, যাদের সঙ্গে ট্রটস্কিপন্থী আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রীদের যোগাযোগ, যারা সিআইএ অরগানাইজড। তাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক দেখা গেল পরবর্তীকালে। আমি তখন বুঝতে পারলাম তিনি একটা মটিভ নিয়ে কাজ করছেন। আর ট্রটস্কি লাইন সম্পর্কে আমার তো পরিষ্কার ধারণা আছে, এতো সিআইএ-'র লাইন।" অতএব, এক প্রকার স্পষ্ট যে ভারতের মাটিতে মুজিব বাহিনীর দুই নেতা শেখ ফজলুল হক মণি ও সিরাজুল আলম খানের ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাসী দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটে মতাদর্শগত বিরোধ প্রকাশের মধ্য দিয়ে। এক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমাজতন্ত্রের শ্লোগান সিরাজুল আলম খান ব্যবহার করলেও ছাত্রলীগের প্রায় আশিভাগ তরুণ কিন্তু বামপন্থী চিন্তাধারার অনুবর্তী হয়ে পড়ে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সৎ নিষ্ঠাবান লড়াকুতে পরিণত হয়ে যায়—যা আবার সিরাজুল আলম খানেরই নেতৃত্বকে দৃঢ়তর করে। অপরদিকে শেখ মুজিবের প্রতি আবদুর রাজ্জাকের গভীর আনুগত্য সত্ত্বেও সমাজতন্ত্রের প্রতি তার বিশ্বস্ততা মুজিব বাহিনীর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকামী তরুণদের ভেতরেও তার নেতৃত্বকে সমভাবে প্রোথিত করে। আবার শেখ মুজিবের প্রতি আনুগত্যের কারণে শেখ ফজলুল হক মণি গ্রুপের সদস্যদের কাছেও ছিলেন সমান শ্রদ্ধাভাজন। ফলে ভারতের মাটিতে তাকে শেখ ফজলুল হক মণি ও সিরাজুল আলম খানের মধ্যে সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করতে হয়। অন্যদিকে মুজিব বাহিনীর নেতৃত্বে একাধিপত্য অর্জনের চেষ্টায় সতর্ক পদক্ষেপে নেমেও ব্যর্থ হতে হয় শেখ ফজলুল হক মণিকে। ব্যর্থ হন এই কারণে যে, তানদুয়ার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যারা প্রশিক্ষক ছিলেন—তাদের নেতৃত্বে ছিলেন হাসানুল হক ইনু। তিনি বামপন্থী চিন্তাধারার অনুবর্তী এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকামী। প্রথম দলের ট্রেনিং শেষে যে আটজনকে প্রশিক্ষক করা হয়, তাদের মধ্যে একজন বাদে আর সকলেরই চোখে ছিল সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। প্রশিক্ষকের সংখ্যা যখন বায়ান্নতে উন্নীত হয়, তখনো বামপন্থী অনুবর্তীরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। তিনজন বাদে আর সকলেই ছিলেন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকামী। স্বাভাবিক কারণেই প্রশিক্ষকদের রাজনৈতিক মটিভেশন সমাজতন্ত্রের পক্ষেই হবার কথা। যেহেতু আওয়ামী লীগের ঘোষণাপত্রে সমাজতন্ত্রের কথা ছিল, সে কারণে সমাজতন্ত্রের ওপর রাজনৈতিক বক্তৃতা রাখা তাদের পক্ষে সুবিধাজনক হয়ে ওঠে। কিন্তু বিষয়টিকে মোটেই সহজভাবে নেয় না তানদুয়ার ভারতীয় সেনা কর্তৃপক্ষ। প্রশিক্ষণ প্রধান হাসানুল হক ইনুর ওপরঅলা ভারতীয় কর্নেল রাজনৈতিক বক্তৃতা বন্ধের নির্দেশ দেন। এ আদেশ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে। হাসানুল হক ইনুর নেতৃত্বে প্রশিক্ষকরা দাবি তোলেন যে সরাসরি দিল্লী থেকে নির্দেশ না আসা পর্যন্ত তারা সামরিক প্রশিক্ষণ দানের পাশাপাশি রাজনৈতিক বক্তৃতাও চালিয়ে যাবেন। কিন্তু কর্নেলের অনবরত চাপে পরিস্থিতি এক পর্যায়ে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। প্রশিক্ষণ প্রধান হাসানুল হক ইনু কর্নেলকে জানিয়ে দেন যে দিল্লী থেকে রাজনৈতিক বক্তৃতা প্রদানের অনুমতি যতদিন না আসছে ততদিন ট্রেনিং বন্ধ থাকবে। প্রশিক্ষকরা প্রশিক্ষণদান বন্ধ করে দিলেন। এ খবর দিল্লীতে পৌঁছতে তানদুয়ায় ছুটে আসেন জেনারেল উবান। চার যুবনেতাও এলেন তার সঙ্গে। আসল সত্যটা এড়িয়ে গিয়ে কৌশলে অচলাবস্থার নিরসন ঘটানো হয়। ট্রেনিং প্রদান আবার আরম্ভ হয় এবং

www.pathagar.com

রাজনৈতিক বক্তৃতাও চলতে থাকে। প্রশিক্ষকরা প্রশিক্ষণদান বন্ধ রাখেন তিনদিন। এখানে উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে ২০নভেম্বর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বন্ধ করে দেয়া হলেও সমাজতান্ত্রিক চিন্তা চেতনায় প্রভাবিত থাকার কারণেই প্রশিক্ষকদের ১৬ ডিসেম্বরের আগে তানদুয়া থেকে ছাড়া হয় না।

রাজনৈতিক বক্তৃতা এবং প্রশিক্ষণ বন্ধের ঘটনা ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার 'র'–কে মুজিব বাহিনীর প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা এনে দেয়। 'র' হিসেব কষে ফেলে, যে পরিকল্পনাকে সামনে রেখে মুজিব বাহিনী করা হচ্ছে তা অংকুরেই বিনষ্ট হতে যাচ্ছে এবং আশ্রয় নেয় ভিন্ন কৌশলের। আত্মপ্রকাশ ঘটে এক অদ্ভুত মতবাদের—নাম তার মুজিববাদ!

১৯৭১ সালের মে মাসের ২৯ তারিখে তানদুয়ায় মুজিব বাহিনীর ট্রেনিং শুরু হলেও অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার এক অস্তিত্বের খবর জানতে পায় আগস্ট মাসে। এ মাস হতেই সীমান্তে মুক্তিবাহিনী কমান্ড ও ভারতীয় সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী কমান্ডের অগোচরে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মুজিববাহিনী সদস্যরা বাংলাদেশ অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে শুরু করে। কিন্তু বিভিন্ন সেক্টরে মুক্তিবাহিনী কমান্ড ও ভারতীয় সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে তারা ধরা পড়ে। প্রয়াত মুক্তিবাহিনী কমান্ডার মেজর জলিলের সেক্টরে মুক্তি বাহিনী সদস্যদের হাতে ধরা পড়ে বাইশজন মুজিববাহিনী সদস্য। ১৯৮৯ সালের মার্চ মাসে আমাকে দেয়া টেপকৃত এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে মেজর জলিল বলেন : "আমার সেক্টরাধীন হিঙ্গেলগঞ্জের ফিল্ডে যারা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, তারা বাইশজনকে গ্রেফতার করেন। তারা তখন ভেতরে প্রবেশ করছিল। সেখানে তাদের চ্যালেঞ্জ করা হয়। এক ভদ্রলোক নিজেকে ক্যাপ্টেন জিকু[১] বলে পরিচয় দেন। তাকেও গ্রেফতার করা হয়।" এ ঘটনায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার। এর প্রেক্ষাপটে কলকাতার হিন্দুস্থান ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে অনুষ্ঠিত হয় এক ত্রিপক্ষীয় বৈঠক। ভারত সরকারের পক্ষে ছিলেন ডি পি ধর। অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ। আর ছিলেন মুজিব বাহিনীর নেতারা। সেপ্টেম্বর মাসেও অনুষ্ঠিত হয় আরেকটি বৈঠক। প্রথম বৈঠকেই একটি আপোস রফা হয়ে যায়। শাহজাহান সিরাজকে মুজিব বাহিনী ও অস্থায়ী সরকারের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য নিয়োগ করা হয়। মুজিব বাহিনী নেতা চতুষ্টয়ের ঐকমত্যের ভিত্তিতেই শাহজাহান সিরাজ এই নিয়োগ লাভ করেন। অবশ্যি এই নিয়োগকে সিরাজুল আলম খানের রহস্যজনক কার্যকলাপের আরেকটি দিক হিসেবে উল্লেখ করে আবদুর রাজ্জাক বলেন যে তিনি তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে গোপন আঁতাত রাখার জন্য শাহাজাহান সিরাজের নিয়োগের ব্যবস্থা করেন।

আগস্ট মাসে মুজিব বাহিনীর ট্রেনিংপ্রাপ্ত সদস্যরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা শুরু করলেও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ সমরে নামার কোন পরিকল্পনা তাদের ছিল না। দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা নিয়ে তারা বাংলাদেশে প্রবেশ করে। আবদুর

১. *নুরে আলম জিকু, পরবর্তীকালে জাসদ নেতা।*

www.pathagar.com

রাজ্জাক ও হাসানুল হক ইনু আমাকে বলেছেন যে, সামজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তারা ধাপে ধাপে এগোবার পরিকল্পনা নেন। এই উদ্দেশ্যে প্রতিটি থানায়[২] একজন করে কমান্ডারের অধীনে দশজন ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুজিব বাহিনী সদস্যের সমন্বয়ে একটি কমান্ড গঠন করা হয়। তাছাড়া ছিল একজন রাজনৈতিক কমান্ডার। রাজনৈতিক মটিভেশন প্রদানই ছিল তার কাজ। একই পদ্ধতিতে গঠন করা হয় জেলা কমান্ড। জেলাতেও ছিল রাজনৈতিক কমান্ডার। থানা কমান্ড ও জেলা কমান্ড গঠিত হলেও যুদ্ধ বলতে যা বোঝায় তা করেনি মুজিব বাহিনীর সদস্যরা। তারা যা করে, সেটা আমরা জানতে পাব আবদুর রাজ্জাকের মুখ থেকে : "আমরা জনগণের সঙ্গে মিলে যুদ্ধ করছি। কিছু কিছু রাজাকারও খতম হচ্ছে। কিন্তু মূল জায়গাটা মানে পাক আর্মির সামনে না পড়লে যুদ্ধ করছি না। দু'চার জায়গায় সামনে পড়ে গেছি—যুদ্ধ হয়েছে। আমরা তো লড়াই শুরুই করিনি। আমাদের তো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। পাঁচ বছরের প্রথম বছরে কি করবো, তৃতীয় এবং চতুর্থ বছরে কি করবো তারপর সরকার তৈরি করবো,—এই ছিল আমাদের সামগ্রিক পরিকল্পনা। আমরা যদি সফল হতাম তাহলে কোন ঘাস থাকতো না, আগাছা থাকতো না। সমাজ দেহ থেকে আগাছা উপড়ে ফেলতাম। প্রতিবিপ্লবীদের থাকতে হতো না। হয় মটিভেট হয়ে এদিকে আসতে হতো নইলে নিশ্চিহ্ন হতে হতো।" আবদুর রাজ্জাক আমাকে দেয়া ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন। এবং তার মুখ থেকেই এসে গেছে 'র'–এর সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার ছক। অবশ্যি আবদুর রাজ্জাক এ কথা বলেছেন তাঁর বামপন্থী চিন্তাধারার আলোকে। তাদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা বামপন্থী চিন্তাধারার অনুবর্তী এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকামী তরুণদের দৃঢ় সংকল্পবদ্ধতাই পরবর্তীকালে 'র'-কে তার পরিকল্পনা কার্যকর করতে দেয়নি। আবদুর রাজ্জাক, হাসানুল হক ইনুরা পরিকল্পনা মাফিক এগোননি সত্য কিন্তু শেখ ফজলুল হক মণি গ্রুপের মাধ্যমে 'র' নেমে পড়ে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে। এ বিষয়ে পরে।

২. পরবর্তীকালে উপজেলা।

www.pathagar.com

সিআইএ'-র তৎপরতা

'র' তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যতটা সক্রিয় ছিল সিআইএ ঠিক ততটাই তৎপর হয়ে ওঠে ভারতের মাটিতে। ঢুকে যায় অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে। অনুপ্রবেশ ঘটায় মুজিব বাহিনীর ভেতরেও। সিআইএ-'র তৎপরতার নমুনা তুলে ধরা যেতে পারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড এম নিক্সনের নিরাপত্তা বিষয়ক সহকারী (পরবর্তীকালে পররাষ্ট্র মন্ত্রী) হেনরি কিসিঞ্জারের ভাষ্যে : "মি. কাইউম"[১] নামে এক ব্যক্তি, আওয়ামী লীগের এক নির্বাচিত সদস্য, যিনি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে ছিলেন সম্পৃক্ত; তিনি ৩০ জুলাই কলকাতায় আমাদের কনসুলেটে আসেন এই বলতে যে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য তাকে মনোনীত করা হয়েছে। কাইউম নির্ধারিত তারিখ ১৪ আগস্টে হাজির হলেন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন যে, "সমঝোতামূলক আলাপ-আলোচনায় যদি মুজিবকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়, তাহলে তার গ্রুপ পুরো স্বাধীনতা ছাড়াই মীমাংসায় আসতে পারে। অবশ্যি ইসলামাবাদকে আওয়ামী লীগের ছয়-দফা গ্রহণ করতে হবে।"[২] আর অস্থায়ী বাংলাদেশের সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমদের[৩] সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোগাযোগ সম্পর্কে হেনরি কিসিঞ্জার আরো বলেন : "অবশেষে পর দিন 'বাংলাদেশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী' কলকাতায় আমাদের কনসালের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি বলেন, আলাপ-আলোচনা অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে যতক্ষণ না বাঙালিদের 'আশা-আকাঙ্ক্ষা' পুরনে যুক্তরাষ্ট্র তার প্রভাব খাটাচ্ছে।[৪]

অপরদিকে মুজিব বাহিনীর ভেতর সিআইএ যেভাবে অনুপ্রবেশ করে, তা আবদুর রাজ্জাকের ভাষ্য থেকে আমরা পেয়েছি। তার ভাষ্য অনুযায়ী সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়নের সঙ্গে সিরাজুল আলম খানের গোপন যোগাযোগ প্রতীয়মান করে মুজিব বাহিনীর ভেতর সিআইএ-'র তৎপরতাকে। মুজিব বাহিনীর ভেতর সিআইএ 'র অনুপ্রবেশ কতদূর ঘটে আমরা তা দেখতে পাব স্বাধীনতার পর রিলিফকর্মী পরিচয়দানকারী হল্যান্ডের নাগরিক পিটার কাসটার্সের সঙ্গে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক

---

১. পুরো নাম কাজী জহিরুল কাইউম। আওয়ামী লীগের টিকেটে জাতীয় পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন।

২. হেনরি কিসিঞ্জার : *হোয়াইট হাউজ ইয়ারস*, পৃষ্ঠা-৮৬৯, ৮৭০

৩. পরবর্তীকালে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট।

৪. হেনরি কিসিঞ্জার : *হোয়াইট হাউজ ইয়ারস*, পৃষ্ঠা - ৮৭২

www.pathagar.com

দলের যোগসাজশের ঘটনায়। এই পিটার কাসটার্সের কথা বলেছেন আবদুর রাজ্জাক, বলেছেন তোফায়েল আহমদ। পিটার কাসটার্স সম্পর্কিত বিষয়ে পরে।

এখানে একটি বিষয় অনিবার্য কারণে এসে পড়ে। সেটা হলো, মুজিব বাহিনী নেতা চতুষ্টয়ের জীবিত তিনজনের দু'জন আমাকে মুজিব বাহিনীর ওপর সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। একজন—সিরাজুল আলম খান, সাক্ষাৎকার দিতে রাজি হননি। তিনি বলেছেন ১৯৯২ সালের আগে এ সম্পর্কে তিনি মুখ খুলবেন না।

www.pathagar.com

জেনারেল উবানের ভাষ্যে মুজিব বাহিনী

এবার আমরা আসবো মুজিব বাহিনীর সংগঠক মেজর জেনারেল এস. এস উবানের নিজের কথায়,—মুজিব বাহিনীর গঠন, তার উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণীতে। তা তুলে ধরা হচ্ছে তার লেখা "ফ্যানটমস অব চিটাগং : দ্য ফিপথ আর্মি ইন বাংলাদেশ" গ্রন্থ হতে পুরোটা নয়, অংশবিশেষ :

"মুক্তিবাহিনী

"...হাজার হাজার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের কোম্পানি ও ব্যাটালিয়নে সংগঠিত করে মুক্তিবাহিনী নামকরণ করা হয়। এদের ভেতর বেঙ্গল রাইফেলসের নিয়মিত ইউনিটও ছিল। তারা ভারতীয় বাহিনীর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে কিন্তু নিজেদের নেতৃত্বেই লড়ে। যেখানে নেতৃত্ব ভালো ছিল, সেখানে চমৎকার লড়েছে। সীমান্তের কাছাকাছি এলাকায় তারা লক্ষ্য নির্ধারণ করতো। এবং কমান্ডো কায়দায় আক্রমণ চালাতো। কিন্তু এই ধরনের কার্যক্রমের জন্য তারা তেমন প্রশিক্ষণ পায়নি কিংবা যুদ্ধ উপকরণও পর্যাপ্ত ছিল না। প্রায়শই এমন ধরনের ক্ষয়ক্ষতিও হতাহতের সম্মুখীন হতো তারা, যা চেষ্টা করলে এড়ানো যেতো।

"এদেরকে দেশের অভ্যন্তরে পাঠাবার প্রচেষ্টা নেয়া হয় কয়েকবার। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলো, বড় বড় দলে পাঠানো হয়। একেকটি দলে কখনো কখনো দু'শয়ের ওপর মুক্তিযোদ্ধা দেয়া হতো। ফলে ছোট ছোট গ্রাম এত বড় বড় দলের খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করতে পারতো না। পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ অতি সহজেই তাদের উপস্থিতির খবর পেয়ে যেতো এবং অপারেশন শেষে তাদের চলে আসার পর পাক-সামরিক কর্তৃপক্ষ ওই গ্রামগুলোতে চালাতো হত্যা, ধর্ষণ এবং ধ্বংসের তাণ্ডব। কেননা, তারা মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছিল। এতে গ্রামবাসীদের কাছে মুক্তিযোদ্ধাদের আগমনের ব্যাপারটি অপ্রিয় হয়ে দাঁড়ায়। হাজার হাজার তরুণ প্রশিক্ষণ নেবার জন্য স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসে। খাঁটি যারা তাদেরকে চিহ্নিত করার কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল না, শিক্ষার্থীদের লক্ষ্যও নির্দিষ্ট ছিল না। প্রশিক্ষণ ক্যাম্পগুলি জাতীয় পরিষদ সদস্যদের (এমএনএ) ওপর নির্ভরশীল ছিল। শিক্ষার্থীদের সঠিক পরিচিতি সত্যায়নের জন্য অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার তাদেরকে নিয়োগ করেন। বাঙালি অফিসাররা যে তালিকা নিয়ে আসতেন, এমএনএ'রা সেটাই অন্ধের মত সত্যায়ন করতেন। এদের কারো কারো ভেতর ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ নিয়ে নিজস্ব রাজনৈতিক মতলব ছিল। সেহেতু, কয়েকটি দল অস্ত্রশস্ত্রসহ বাংলাদেশের ভেতরে গিয়ে হাওয়া হয়ে যায়। কিছু

www.pathagar.com

দল ফিরে আসে অস্ত্র ভেতরে লুকিয়ে রেখে এবং রিপোর্ট করে শত্রুর সঙ্গে সংঘর্ষে অস্ত্রশস্ত্র তাদের খোয়া গেছে। এই অশুভ তৎপরতা নির্মূলে একটি নিশ্ছিদ্র প্রস্তাব দেয়া হয়। কিন্তু উচ্চতর পদ সৃষ্ট জ্ঞানবানদের উন্নাসিকতার কাছে এ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারে না।

"মুজিব বাহিনী

"ওই অশান্ত সময়ে একদল উৎসর্গীকৃত প্রাণ তরুণ নেতৃত্বের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। তাদের নাম সারা বাংলাদেশে অত্যন্ত পরিচিত। তারা হলেন শেখ ফজলুল হক মণি (শেখ মুজিবের এক ভাগ্নে), তোফায়েল আহমদ, সিরাজ এবং আবদুর রাজ্জাক। প্রথম পরিচিতিতে তাদের সম্পর্কে আমার এই ধারণা হয় যে তারাই একমাত্র নেতৃত্ব, যারা ভাল কিছু দিতে পারেন। মনে হলো, লক্ষ্য সম্পর্কে তারা প্রচণ্ডভাবে প্রেরণাদীপ্ত এবং তা অর্জনে অকুতোভয়। তাদের নেতৃত্ব বাংলাদেশের ভেতরে-বাইরে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যে প্রতিষ্ঠিত, তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলো, তাদের অবস্থান মেনে নেয়ার মেজাজে ছিলেন না অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার। এদেরকে তারাই প্রশিক্ষণ দিতে চেয়েছিলেন এবং চেয়েছিলেন মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্বাধীনে যুদ্ধ করাতে। অথচ ওই ধরনের প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যাপারে এই তরুণ নেতাদের ঘোর আপত্তি ছিল। মুজিবের প্রতি প্রগাঢ় আনুগত্য এবং তার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে (তারা সবাই মুজিবের সঙ্গে পাক-সামারিক কর্তৃপক্ষের কারা নির্যাতন ভোগ করেছেন) এরা নিজেদেরকে 'মুজিব বাহিনী' নামে অভিহিত হতে পছন্দ করেন। এরা তাদের পুরোনো সহকর্মীদের ভেতর থেকে ক্যাডার নির্বাচিত করে সত্যায়নপত্র প্রদান করেন। তারা বাংলাদেশ থেকে দৃঢ়চেতা, নিবেদিতপ্রাণ বিশ্বস্ত লোকদের নির্বাচিত করে নিয়ে আসেন ট্রেনিং দেবার জন্যে। বলেন, মুক্তিবাহিনী কমান্ডো পদ্ধতির প্রশিক্ষণ পাচ্ছে, তা থেকে তাদের লোকদের আলাদা ধারায় অপ্রচলিত যুদ্ধের ট্রেনিং পাওয়া উচিত। মনে হল, তারা একটি রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃত্বে আছেন এবং প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ শহর, তহশিল এবং থানায় তাদের সংগঠনের শাখা রয়েছে। সেনাবাহিনী যে হাজার হাজার তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে, তাদের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে তাদের (যুবনেতাদের) সন্দেহ ছিল এবং আওয়ামী লীগের যুব সংগঠনের সঙ্গে এরা (মুক্তিযোদ্ধারা) সম্পর্কিতও ছিল না। তাই মুক্তিবাহিনীর কাছ থেকে তারা তাদের সংগঠন সেলগুলোর গোপনীয়তা রক্ষায় সাবধানতা অবলম্বন করতো।

"কর্নেল ওসমানী যৌথ অধিনায়কত্বের ওপর জোর দেন। অবশ্যিই যে কোন যুদ্ধে এটা কাঙ্ক্ষিত বিষয়। আওয়ামী লীগের কিছু সিনিয়র নেতা, যারা অস্থায়ী সরকার গঠন করেছিলেন, তারাও তাদের যুব শাখার এই নেতাদের ব্যাপারে মোটেই খুশি ছিলেন না, যা একটি স্বতন্ত্র ধারা তৈরি করে। এ বিষয়ে কোন আপোস বা অন্য কিছু করার সুযোগ ছিল না। ভারতীয় সেনাবাহিনী কেবলমাত্র অস্থায়ী সরকারের মতামত গ্রহণ করতো সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের মাধ্যমে। অন্য কোনো কর্তৃত্বকে স্বীকৃতি দিতে

www.pathagar.com

প্রস্তুত ছিল না— তা যতই ফলপ্রসু হোক কিংবা তাদের স্বদেশ প্রেম যতই তীব্র হোক না কেন।

"এই পরিস্থিতিতে স্পষ্টতই সুসংগঠিত, প্রতিষ্ঠিত, আত্মোৎসর্গীকৃত এবং তীব্র প্রেরণাদীপ্ত একটি তরুণ গ্রুপের গুরুত্ব আমি অনুধাবন করতে পারছিলাম। এই ধরনের একটি সংগঠন কি কারণে গোপনীয়তা অবলম্বন করে চলছে, তাও আমি বুঝতে পারছিলাম। কেননা, অবস্থা যেখানে এরকম,— যে কেউ মুক্তিযোদ্ধার পোশাক পরে ট্রেনিং নিতে পারে এবং কাঁধে অস্ত্র ঝুলিয়ে বাংলাদেশের ভেতরে চলে যেতে পারে। এই সাধারণ বোধ নির্দেশ করে যে মুজিব বাহিনীকে আমরা সমর্থন দেব এবং মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে এর সম্পর্ক সহজতর করে তুলতে যা করণীয়, তা আপ্রাণ করবো। কেননা, মুক্তিবাহিনী, যারা সরাসরি মিঃ তাজউদ্দীনের অধিনায়কত্বে রয়েছে, তারা ভারতীয় সেনাবাহিনীর স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং তিনি অস্থায়ী সরকারের প্রধান হিসেবে সংশ্লিষ্ট সকল মহলে স্বীকৃত।

"ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েটের সেক্রেটারি মি. আর এন কাও[১] ছিলেন আমার বেসামরিক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। আওয়ামী লীগ যুব শাখার এই সংগঠনটি এবং এর নেতৃত্ব সম্পর্কে খুঁটিনাটি খোঁজখবর করার সুবিধা ছিল তার। একই সাথে তার এই বিশ্বাস জন্মে যে একমাত্র তারাই ভাল কিছু দিতে পারেন এবং এই কারণে তিনি যুবনেতাদের আমার হাতে তুলে দেন। এও মনে করেন, বাংলাদেশের সবচেয়ে স্পর্শকাতর রাজনৈতিক এলাকায় কাজ করার সুযোগদানের জন্য তাদেরকে বিশেষ ধরনের মর্যাদা দেয়া দরকার। তাছাড়া যুব নেতাদের প্রতি অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রীদের ঈর্ষাপরায়ণতার বিষয়টি তার অগোচরে ছিল না। কেননা, যুবনেতারা ছিলেন মাথা গরম ধরনের এবং আপোসহীন দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন। কিন্তু তাদের মন্ত্রীরা ছিলেন উচ্চাভিলাষী ও মতলববাজ। আর তিনি (কাও) তার আয়ত্তের মধ্যে থেকে পরিস্থিতিকে সহজ করার চেষ্টা করেন কিন্তু সমালোচনার হুল আমাকেই সহ্য করতে হতো। যেহেতু আমি ছিলাম তাদের অধিনায়ক এবং তাদের প্রশিক্ষণদান ও কাজে লাগানোর দায়িত্ব ছিল আমার ওপরেই অর্পিত।

"আমার সমস্যা আরো বেড়ে গেল যখন এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী মি. ডি পি ধর আমাদের প্রাত্যহিক কাজ কর্মের খতিয়ান নেয়া শুরু করলেন। এর সাথে জড়িত ব্যক্তিদের সম্পর্কে কিছু কথা বলা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

"শেখ ফজলুল হক মণি

"হাল্‌কা পাতলা দেহের এক অগ্নিপুরুষ। মনে হল, এদের জন্য তিনি প্রকৃতি সৃষ্ট-নেতা। বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে প্রচণ্ড রকমের আত্মোৎসর্গী প্রাণ এবং যে কোনো ধরনের ত্যাগ স্বীকারের জন্য ছিলেন প্রস্তুত। প্রায়শই অসুস্থ থাকতেন কিন্তু কদাপিও

১. 'র'-এর ডাইরেক্টর

www.pathagar.com

কাজ থেকে বিরত থাকতেন না। সীমান্তের কাছাকাছি থাকতেন বলে সেখানে ডাক্তার পাঠিয়ে তার চিকিৎসা করানো আমার জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তথাপি যদ্দুর করণীয় ছিল আমার পক্ষে, তা করতাম।

"বন্ধুদের প্রতি তিনি ছিলেন আন্তরিক এবং অনুগত, শেখ মুজিবের প্রতি ছিলেন সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত প্রাণ। ছিলেন রাজনীতি সচেতন, ধীর, সতর্ক, চিন্তাশীল এবং নামকরা সাংবাদিক। আমি মনে করি, তিনি বাংলাদেশে তথ্য ও প্রচার মন্ত্রী হিসেবে ভাল করবেন। কিন্তু মনে হয় তার আকাঙ্ক্ষা আরো ওপরের দিকে।

"তিনি আমাকে বলেন, এই তরুণ নেতাদের কাছে আমি শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে সৃষ্ট শূন্যতা পূরণ করেছি।

"তোফায়েল আর রাজ্জাক তাকে শ্রদ্ধা করতেন। শ্রদ্ধা করতেন সিরাজও। তবে তার শ্রদ্ধা ছিল সীমিত পরিসরে। তাদের আলোচনা প্রায়শই উত্তপ্ত হয়ে উঠতো। সিরাজ আপোসহীন হয়ে উঠতেন কিন্তু সর্বদাই কাজ করতেন একটি টিম হিসেবে। যৌথ নেতৃত্বের একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন তারা।

"সিরাজ[২]

"প্রগতিবাদী (রেডিক্যাল) চিন্তাধারাকে তিনি লালন করতেন এবং ছিলেন আপোসহীন। যুদ্ধ করতেন ব্যাঘ্রের মতন, কাজ করতেন জান কবুল দাসের মত। একাদিক্রমে কয়েকদিন না খেয়ে না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিতে পারতেন। শুধু চায়ের ওপর বেঁচে থাকতে পারতেন। খেতে বসলে প্রচুর খেতেন। মুরগি—মাংস আর ভাত ছিল তার প্রিয় খাদ্য।

"আমার প্রতি ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান। স্বাধীনতার পর পর ঢাকার একটি আন্তর্জাতিক হোটেলে যেদিন তিনি আমার সাথে দেখা করতে আসেন, সেদিনের কথা ভুলতে পারব না। গায়ে জ্বর ছিল বেশ। তথাপি জোরাজুরি করেন তাকে আমার রুমে নিয়ে আসতে, এমন কি তিনি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছিলেন না। দু'জন তাকে ধরে রেখেছিল। অসুস্থ শরীরে আমার সঙ্গে দেখা করতে নিজের রুম ছেড়ে চলে আসার জন্য আমি তাকে বকাঝকা করলাম। তাতে তিনি বললেন : "যিনি আমাদের এবং আমাদের দেশের জন্য এত করেছেন, সেই ব্যক্তিটির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর সুযোগ হাতছাড়া করি কি করে? বিশেষত স্বাধীনতার পর আপনি যখন ঢাকায়।"

"তোফায়েল আহমদ

"তার কারিশমা হচ্ছে, জন্মগতভাবে তিনি অকৃত্রিম এবং রাজনৈতিক কাজে কঠিন পরিশ্রমী। কাজ করেছেন শেখ মুজিবের অনুচর হয়ে।

"তার পত্নী এবং অন্যান্য ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন তখন বাংলাদেশে। আমি তাদেরকে নিয়ে আসার একটি পরিকল্পনা দিলাম। জবাবে তিনি বলেন : 'আল্লাহর

২. সিরাজুল আলম খান

www.pathagar.com

হাতে তাদের নিরাপত্তার ভার ছেড়ে দেই না কেন আমরা? লাখো লাখো বাঙালি একই রকমের বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে। সবাই তো আসতে পারে না।"

"আবদুর রাজ্জাক

"সেই অগ্নিগর্ভ চার নেতার মধ্যে তিনিই ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ় চরিত্রের মানুষ। এর অর্থ এই নয় যে অন্যদের ভেতর দৃঢ়তার অভাব ছিল। ধীর স্থির ধরনের মানুষ তিনি এবং অতিমাত্রায় আবেগপ্রবণ নন। ছিলেন বিচারবোধসম্পন্ন এবং গভীর চিন্তাশীল। কোন পরিকল্পনায় নামার আগে সেটা নিয়ে ভাবতেন দীর্ঘ সময়। উৎকর্ষ অর্জনই ছিল তার লক্ষ্য। তাই প্রতিটি বিষয়ের খুঁটিনাটি দিক দেখতেন ভাল করে।

"এই চার নেতা বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে আসেন এবং এমন একজনকে খুঁজছিলেন যিনি তাদেরকে অস্ত্র সহায়তা দিয়ে তাদের দেশ মুক্ত করায় সাহায্য করতে পারেন। ভারতে তাদের কেউ চিনতো না। তাদের প্রবাসী অস্থায়ী সরকার তখন গঠন প্রক্রিয়ার মধ্যে ছিল এবং অস্থায়ী সরকারের লোকজন তাদেরকে অযৌক্তিক গুরুত্ব দেয়ার পক্ষপাতিও ছিলেন না।

"আমরাও এমনই কিছু যুবনেতা খুঁজছিলাম, যাদের দেশের ভেতর প্রভাব রয়েছে। কয়েকদিন আলোচনার পর আমরা উপলব্ধি করলাম তারাই খাঁটি দেশপ্রেমিক। সারা বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে তাদের সংগঠনের শাখা রয়েছে। এবং ভাল কাজ দিতে পারবে। তারা দ্রুতগতিতে বাংলাদেশের ভেতর এবং বাইরে থেকে তরুণদের জড় করে। এমন সব তরুণদের আনে, যাদেরকে তারা ভাল চেনে এবং জানে। গেরিলা যুদ্ধের জন্য বিশেষভাবে গঠিত ট্রেনিং সেন্টারে তাদেরকে আমরা প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু করি।

"প্রাথমিক পর্যায়ে শারীরিক দিক দিয়ে তারা দুর্বল ছিল। পাহাড়ি অঞ্চলের ঠাণ্ডা তাদের কাহিল করে তোলে। ভাল খাবার ও ভিটামিন সরবরাহে দ্রুত তারা গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে। ট্রেনিং সেন্টার ছেড়ে যাবার আগে সবার ওজন যায় বেড়ে...।

"রাজনৈতিক কোন্দল

"...সেনাবাহিনী কেবল নিয়মিত ও কমান্ডো পদ্ধতি অপারেশনের ট্রেনিং দিতে পারে আর এই প্রশিক্ষণ নিতে এগিয়ে আসে হাজারো তরুণ এবং একটি বাহিনী গঠনে ট্রেনিং দেয়া হচ্ছিল, যাকে মুক্তিবাহিনী নামে অভিহিত করা হয়। এই নেতারা (যুবনেতারা) আমাদের জানান, অনেক অবাঞ্ছিত লোক, যারা বাংলাদেশে নকশালদের সমতুল্য, তারা প্রশিক্ষণ নিচ্ছে, অস্ত্র পাচ্ছে। তারা আমাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেন, এই সব অস্ত্র পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে না। এগুলো তারা স্বাধীনতা উত্তরকালের জন্য বাংলাদেশের ভেতরে জমা রাখছে নকশাল ধরনের শাসন কায়েমের লক্ষ্যে। তারা কিছু চীনাপন্থী কমিউনিস্ট নেতার নাম বলেন— যারা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কয়েকজন অফিসারের আত্মীয় এবং এখন এই অফিসাররা মুক্তিবাহিনীতে। এদের সাহায্য ও

www.pathagar.com

সম্মতিতে তারা তাদের নিজস্ব কমিউনিস্ট ক্যাডারদের দলে দলে ভর্তি করাচ্ছে, প্রশিক্ষণ দেওয়াচ্ছে এবং অস্ত্রে সজ্জিত করাচ্ছে।

"এ বিষয়টি অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে সরাসরি তুলে ধরা হয়। স্পষ্টতই তা ফলোৎপাদনে ব্যর্থ হয়। মুক্তি বাহিনীর ভেতর আরেক ধরনের মুক্তিযোদ্ধা ছিল, যারা সাম্প্রদায়িক ও পাকিস্তানপন্থী। স্বাধীনতা অর্জিত হবার পর তারা তাদের অস্ত্র বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের হাতে যে তুলে দেবে না, এ ব্যাপারে তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। গোলযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে পাকিস্তানি শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ছিল তাদের। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যে নৃশংসতা সংঘটিত করে, তার কারণে এই সময়ে তাদের সংখ্যা বেশি ছিল না। তৃতীয় আরেকটি দল-ফ্রি ল্যান্স মুক্তিযোদ্ধা; এরা ছিল ডাকাত। এই সময়কে এরা আধুনিক অস্ত্র প্রাপ্তির এবং ভারতীয় খরচায় প্রশিক্ষণ নেবার এক মহা সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে।

"আমি স্পষ্ট ভাষায় আমার সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে বলি যে মুক্তিবাহিনীর এই তিন ধরনের লোকেরা ঐক্যবদ্ধ হবে, লুকিয়ে রাখা অস্ত্র ব্যবহার করে স্বাধীন বাংলাদেশে গোলযোগ পাকাবে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে।

"মুজিব বাহিনী নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে আমি মুক্তিবাহিনী সদস্য বাছাইয়ে একটি নিখুঁত প্রস্তাব দেই। প্রতিদিন মুজিব বাহিনী নেতারা আমার কাছে আসতে থাকে নতুন নতুন প্রমাণসহ। তাদের অস্তিত্বের পক্ষে ঘনায়মান বিপদ সম্পর্কে অভিযোগ তুলতে থাকে। একইভাবে তাদের আমি আশ্বাস দিয়ে বলি যে, এ বন্ধের জন্য আমার যা করণীয়, তা আপ্রাণ কষ্ট করব। কিন্তু আমি জানতাম, আমরা যে পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছি সেখানে এটা করা সম্ভব নয়। তাছাড়া ব্যাপকহারে মুক্তিবাহিনী যোদ্ধাদের ট্রেনিং প্রদানের চাপ ক্রমগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। সংখ্যার ওপর জোর দেয়া হচ্ছিল, পাওয়াও যাচ্ছিল চাহিদা অনুযায়ী। পূর্বতন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের দু'জন বাঙালি সদস্যকে মনোনীত করা হয়েছিল খাঁটি লোকদের সত্যায়নের জন্য। তারা সেটা করতেন তাড়াহুড়োর ভেতর। স্বার্থান্বেষী মহল তাদের সামনে তালিকা পেশ করতো এবং সেগুলো, এমন কি হালকা ধরনের কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই সে তালিকা আওয়ামী লীগের এই দুই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সত্যায়ন করে দিতেন। একবার সই হয়ে গেলে এবং তাতে যদি কোন ভুলও থেকে যেতো, সেটা তারা স্বীকারই করতেন না। পুরো ব্যাপারটা এত বেশি তাৎক্ষণিক ছিল যে মনে হতো এমএনএরা হয় স্বার্থন্বেষী মহল প্রেরিত না হয় স্বাধীন হবার পর দেশের কী হবে না হবে, তা নিয়ে তাদের কোন মাথা ব্যথা নেই।

"অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার মানেই অপরিহার্যভাবে মি. তাজউদ্দীন। তিনি মুজিব বাহিনী নেতাদের সহ্য করতে পারতেন না। তাদের প্রতিটি অভিযোগকে বাজে কথা বলে উড়িয়ে দিতেন। কর্নেল ওসমানী অস্থায়ী সরকারের কাছ থেকে নিজের নির্দেশ গ্রহণ করতেন। মুজিব বাহিনী নামে আলাদা একটি বাহিনীর অস্তিত্বকে তিনি সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি এবং সেই বাহিনীও সামগ্রিকভাবে তার অধিনায়কত্বে ছিল না।

www.pathagar.com

যদিও বাহ্যিকভাবে এর নেতাদের প্রতি বন্ধুতার ভাব দেখাতেন। জেনারেল আরোরা পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের সকল অপারেশন সমন্বয়ের দায়িত্বে ছিলেন। যেহেতু মুজিব বাহিনী সরাসরি তার অধিনায়কত্বে ছিল না, সে কারণে তিনিও এদের ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। এতদসত্ত্বেও মুজিব বাহিনীর অধিনায়ক—সৈনিক হিসেবে আমি তাকে এই আশ্বাস দেই যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তার দেয়া যে কোন দায়িত্ব মুজিব বাহিনী পালন করবে এবং তার (জেনারেল আরোরা) সঙ্গে আমি সর্বক্ষণ যোগাযোগ রক্ষা করে চলবো। যাবতীয় তথ্য তার জ্ঞাতার্থে পেশ করবো। এতে তিনি মোটেই খুশি হননি। কেননা, আমাকে তার অধিনায়কত্বে দেয়া হয়নি। আমি জেনারেল আরোরাকে বোঝানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছি তথাপি তিনি এই বিশেষ ধরনের অধিনায়কত্বের বৈশিষ্ট্য অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছেন।...

"বিক্ষুব্ধ হবার মূল কারণ

"যুব নেতারা সর্বদাই অভিযোগ করতেন যে জেনারেল আরোরা ও মি. তাজউদ্দীনের মধ্যে একটি রাজনৈতিক সমঝোতা রয়েছে। যে কারণে দু'জনেই চাপ প্রয়োগ করে চলেছিলেন যে যুব নেতাদের অধিনায়কত্বে নয়, তাদের অধিনায়কত্বে থাকবে মুজিব বাহিনী। কেননা, মি. তাজউদ্দীনের প্রতি এই যুব নেতাদের কোন আনুগত্যই ছিল না। আমি জানতাম যুব নেতারা মি. তাজউদ্দীনকে দু'চোখে দেখতে পারতেন না। তারা অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলামের প্রতি সর্বদাই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কিন্তু তাজউদ্দীনকে শ্রদ্ধা করতেন না।

"আমি এই ভুল বোঝাবুঝি অপনোদনের চেষ্টায় ত্রুটি রাখিনি কিন্তু এর সৃষ্টি অতীতে। পুরোনো দাগ মোছা তাই সম্ভব হয় না।

"যুব নেতারা প্রাক্তন এমএনএ ও এমপিএদের প্রভাবিত করেন মি. তাজউদ্দীনের বিরুদ্ধে এই রকম প্রচারণা চালিয়ে যে তিনি জবর দখলের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। তাদের মতে, প্রধানমন্ত্রিত্ব ন্যায়ত অন্য কারো পাওয়া উচিত ছিল। আমার মনে হয়, সৈয়দ নজরুল ইসলামই ছিলেন তাদের পছন্দসই ব্যক্তি। তারা যদি মি. তাজউদ্দীনের ব্যাপারে তাদের প্রভাব কার্যকর করতে নামতেন, তাহলে এক বিশ্রী পরিস্থিতির সৃষ্টি হত। অস্থায়ী সরকারের ভেতরে যদি বিভক্তি দেখা দিত, তবে তা সমগ্র সংগ্রামের জন্য বিপর্যয়কর হয়ে দাঁড়াতো। আমি মনে করি, এই নেতাদের আমি বোঝাতে সক্ষম হই যে তাদের পদক্ষেপ লক্ষ্য অর্জনের পথে হবে বিপজ্জনক। আর তা হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা। তাছাড়া স্বাধীনতার পর এর ফলাফল হবে আরো মারাত্মক। সৌভাগ্যবশত তারা আমার সাথে একমত পোষণ করেন। অবশ্যি ভেতরে ভেতরে তারা মি. তাজউদ্দীনকে চিবিয়ে খেতেন। আমার মত কয়েকজন বন্ধু ছাড়া বাইরের আর কেউ এ বিষয়টি জানতেন না। আমার মনে হয়, সৈয়দ নজরুল ইসলামও তাদেরকে সতর্ক করে দেন। এইভাবে একটি মারাত্মক রাজনৈতিক সঙ্কট পরিহার করা গেল।

www.pathagar.com

"আরো একটি এবং সম্ভবত সবচেয়ে স্পর্শকাতর বিষয় ছিল সেটা, তার প্রতি মনোযোগ দেবার আবশ্যকতা জরুরি হয়ে পড়ে। এই যুব নেতারা কয়েকজন পরিচিত বাংলাদেশী নকশালের সঙ্গে ভারতীয় কর্মকর্তাদের গল্পগুজব করতে দেখেছেন ভারতের কোন কোন বিলাসবহুল হোটেলে। তাদের মনে হয়েছে, ওই সব হোটেলে তারা আস্তানা গেড়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক আইন বলবৎ থাকাকালে যুবনেতারা এইসব লোকদের দেখেছে তাদের শত্রু হিসেবে। অনিবার্য কারণেই এদের মোকাবেলায় আওয়ামী লীগকে তার যুব শাখা গড়ে তোলার কাজ শুরু করতে হয়। অতএব, এটা তাদের বোধগম্যের বাইরে, কেন ভারত সরকার তাদের জাত শত্রুর সঙ্গে পক্ষপাতমূলক আচরণ করছে। তাই এ রকম ভুল সিদ্ধান্তে তারা উপনীত হন যে আমাদের সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে, বাংলাদেশে কমিউনিস্ট সরকার না হোক অন্তত কমিউনিস্ট পার্টিকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে দেয়া। তারা বিশ্বস্ত সূত্রে আরো জানতে পান, মার্কসবাদীদের হাতে অস্ত্র দেয়া হয়েছে। দেয়া হয়েছে মওলানা ভাসানীর অনুসারীদের হাতে। তাদেরকে আলাদাভাবে প্রশিক্ষণও দেয়া হচ্ছে।

"এটা তাদের কাছে অসহ্যই বটে এবং স্বভাবতই তারা হতাশ হয়ে পড়েন। ছুটে আসেন আমার কাছে। এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে কথাবার্তা হয় এই রকম :

"যুব নেতারা : "স্যার, আমরা আপনাদের কাছ থেকে আশা করি না যে গত পঁচিশ বছরে আমরা যা অর্জন করেছি, নকশালী ও মার্কসবাদীদের ট্রেনিং ও তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে সেটা শেষ করে দেবেন।" বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম আমি। রাগে চোখ মুখ আমার লাল হয়ে গেল। বললাম, "বলতে চাইছেন কী আপনারা।"

"যুব নেতারা : "আপনি বলতে চান আপনারা (জায়গার নাম উল্লেখ করে) নকশালদের ট্রেনিং দিচ্ছেন এবং অস্ত্রশস্ত্র দিচ্ছেন, সেটা আপনি জানেন না? ভারতীয় নেতারা তাদেরকে দামি হোটেলে রাখছে, তাদের সঙ্গে দহরম-মহরম করছে, বলতে চান তাও আপনি জানেন না?"

"আমি এ ধরনের বাজে কথা আগে কখনো শুনিনি। আমি সব সময় ভেবেছি কিছু শত্রু এজেন্ট ভেতরে বিভক্তির চেষ্টা করবে। এখন বলুন, আপনাদের মাঝে এই গুজব কে ছড়িয়েছে?

"যুব নেতারা : "আমরা স্বচক্ষে দেখেছি, স্বকর্ণে শুনেছি। এ ব্যাপারে ভুল হবার কোন সুযোগ নেই। এতে আমরা রীতিমত হতাশ এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাবার চিন্তাভাবনা করছি। আমরা কখনোই আপনার কাছ থেকে কোন কিছু গোপন করবো না। আমাদের লক্ষ্যের প্রতি আপনার আন্তরিকতার জন্য সব সময়ই আপনাকে ভালবেসে এসেছি। যেহেতু আপনি ধর্মভীরু লোক, সে কারণে আমাদের ভালবাসা আপনার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। কিন্তু আপনার সরকার এ ব্যাপারে আপনার ওপর আস্থা রাখেননি। এইভাবে তারা (ভারত সরকার) কিন্তু বিদেশী শক্তিকে সহযোগিতা করতে চান, খুশি করতে চান। অনুগ্রহ করে খোঁজ নিন। আপনার সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি আমাদেরকে জানান। আমাদের দেশের রুশপন্থী কমিউনিস্ট পার্টিকে আমরা জানি

www.pathagar.com

এবং বুঝি। এরা শুধু কাগজেই আছে। আবার সক্রিয় করা হয়েছে। কিন্তু চীনপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি কেন?"

"আমি অবাক হয়ে গেলাম। মুখ থেকে কোন কথা সরলো না আমার। একমাত্র ঈশ্বর জানেন আমার দেশে এ ধরনের কোন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে কিনা এবং আমি সে বিষয়ে কিছুই জানি না। ব্যক্তিগতভাবে আমি রাশিয়ার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কেননা, আমাদের প্রয়োজন কালে সে সমর্থন দিয়েছে। কিন্তু আমি নিশ্চিত, আমার দেশের প্রশাসনে এমন কাউকে পাওয়া যাবে না, যিনি বাংলাদেশে চীনপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবেন।

"যুব নেতাদের মতামত মি. আর এন কাওকে বলাতে তিনি আমাকে অবাক করে দিয়ে জানান যে মওলানা ভাসানীর নকশালীরা বাস্তবিকই ট্রেনিং পাচ্ছে কোথাও কোথাও।

"মি. কাও বললেন : "অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা কিছু করিনি। তারা ভাসানীর অনুসারীদের পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এক ধরনের বড় শক্তি বলে মনে করেন। তাদের পরামর্শ আমরা উপেক্ষা করি কীভাবে। আপনার যুবনেতাদের গিয়ে বলুন, এদরকে তারা যদি পছন্দ নাও করেন তবু সহ্য করতে হবে। আমরা তাদেরকে (মুজিব বাহিনী) সামগ্রিক পরিকল্পনার একটি অঙ্গ হিসেবে সমর্থন দেব, স্বতন্ত্র রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ নয়। আমাদের সঙ্গে তারা একমত না হলে আমাদের করার কিছুই থাকবে না। এতে তারা যেখানে খুশি যেতে অথবা যা খুশি বলতে পারে, তাতে আমাদের কিছু আসবে যাবে না।"

"আমি যুবনেতাদের বলি যে কর্তৃপক্ষ তাদেরই সাহায্য করছে যারা বাংলাদেশের মুক্তির জন্য যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। আর এদের সুপারিশ করেছে তাদেরই অস্থায়ী সরকার। কিছু অবাঞ্ছিত লোকজনের পক্ষে এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি পুরোপুরি সুযোগ নেয়া সম্ভব। এবং তাদেরকে অতিমাত্রায় সতর্ক থাকতে হবে।

"যুবনেতাদের মনে সন্দেহ থেকে গেল। সুতরাং তারা তাদের সেল, আস্তানা অথবা চলাচলের খবরাখবর একমাত্র আমাকে ছাড়া আর কাউকে দেবার ব্যাপারে সাবধানী হয়ে গেল। আমি তাদের কথা দিয়েছিলাম যে তাদের সংগঠন বা কারো সম্পর্কে তারা যা-ই আমাকে বলুক, তা কারো কাছে প্রকাশ করবো না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা প্রকাশ করছে। তথ্যগুলো আমার জন্য অপরিহার্য ছিল কেননা আমি তাদের সহযোগিতায় সব পরিকল্পনা প্রণয়ন করতাম। একসঙ্গে কাজ করতে গিয়ে আমার প্রতি তাদের গভীর বিশ্বাস জন্মে। এতে নিজেকে আমি সম্মানিত বোধ করতাম এবং কোন অবস্থাতেই বিশ্বাস ভঙ্গ করিনি।

"তারা তাদের নিজস্ব গোপনীয় বিষয়াবলি নিজেদের প্রধানমন্ত্রীসহ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কাছে ফাঁস করতেন না এই সন্দেহে যে দেশ স্বাধীন হবার পর তাজউদ্দীন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে শেখ মুজিবকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করার চেষ্টা করবেন এবং নিজেই তা কুক্ষিগত করবেন। পরে তারা খোলাখুলিভাবে আমাকে বলেন

www.pathagar.com

"তাজউদ্দীন আপনাদের কমিউনিস্ট মন্ত্রী ডি পি ধরের সঙ্গে যোগসাজশে আছেন। আমরা দু'জনের কাউকেও বিশ্বাস করি না। এমন কী আপনার সরকারও জানেন এই দু'জন স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের জন্য কী ধরনের পরিকল্পনা তৈরি করেছেন।"

"তারা কর্নেল ওসমানীকেও কোন তথ্য দেবেন না। কেননা, তিনিও মি. তাজউদ্দীনের হাতে হাত মিলিয়েছেন। লেফটেন্যান্ট জেনারেল আরোরাকেও কোন খবরাখবর দিতে চান না তারা। তাদের হিসেব অনুযায়ী, তিনিও তাদের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতে খেলছেন। এর কারণ তারা অনুধাবন করতে পারেন না। তারা প্রায়শই আমাকে বলতেন: "জেনারেল আরোরা তাজউদ্দীনকে অনুরোধ করেছেন মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে এবং বলতে যে, মুজিব বাহিনীর অধিনায়কত্ব যেন তাকে প্রদান করা হয়।"

"মুক্তিবাহিনী-মুজিব বাহিনী : নামকরণ জটিলতা

"... যুবনেতারা বাংলাদেশের বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে থাকা তাদের সংগঠন থেকে খবর পান যে কিছু কিছু মুক্তিবাহীনী ইউনিট অবাঞ্ছিত কাজ করছে। কোন কোন ইউনিট লুট করছে, সন্ত্রাসিত করছে সাধারণ মানুষকে। আর অন্যেরা ব্যক্তিগত শত্রুতার প্রতিশোধ নিচ্ছে। আগেই বলা হয়েছে, সকল ধরনের লোক এসেছে মুক্তিবাহিনীতে এবং যোদ্ধৃ বাহিনী হিসেবে মুক্তিবাহিনী চমৎকার কাজ দেখিয়েছে। কিন্তু কিছু লোক ছিল নিন্দনীয়। তারাই এই বাহিনীর জন্য দুর্নাম বয়ে আনে। তাই যুবনেতারা দৃঢ়তার সাথে এই অভিমত ব্যক্ত করে যে তাদের বাহিনীর গেরিলা নেতা যারা হবে, তাদের সকলকেই হতে হবে ব্যক্তিগতভাবে তাদের পরিচিত। 'মুক্তিবাহিনী' থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করার জন্য সে বাহিনীর নাম হবে 'মুজিব বাহিনী'।

"এই নামকরণের পক্ষে তাদের যুক্তি হল, 'মুজিব বাহিনী' নামটি বাংলাদেশে পবিত্র বিবেচিত। ফলে কেবল তাদের সংগঠনের পক্ষ থেকেই নয়, সাধারণ মানুষও তাদের সহায়তা দেবে।

"আমরা দশ হাজার মুজিব বাহিনী সদস্যকে প্রশিক্ষক হবার মত করে বিভিন্ন গেরিলা কৌশলের ওপর ট্রেনিং দেই। ধরে নেয়া হয়, তারা বাংলাদেশের ভেতরে অবস্থানকারী সংগঠনের লাখ লাখ সদস্যকে প্রশিক্ষণ দেবে। এটা একটি প্রতিষ্ঠিত এবং নির্ভরযোগ্য সংগঠন, যার নেতারা প্রাথমিক পর্যায়ে কাজ করেছেন শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে এবং পরে জানতে পাই যে, এদের ওপর তার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। এর অর্থ সমগ্র জাতির আস্থা রয়েছে তাদের ওপর।

"আমি এই বিশেষ বাহিনীর নাম 'মুজিব বাহিনী' রাখার প্রস্তাব দেই। কিন্তু ঊর্ধ্বতন কমান্ড আমার প্রস্তাব গ্রহণ করেন না। তাদের মতে, এই নামকরণ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে এবং মুক্তি বাহিনী ও মুজিব বাহিনীর ভেতর ভাঙনও ধরাতে পারে। আমি যুবনেতাদের ওপর কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারলাম না। তারা বললেন : "যে যা-ই বলুক, বাংলাদেশে এই ছেলেরা 'মুজিব বাহিনী' নামে

www.pathagar.com

পরিচিত হবে।" এতে নামকরণ নিয়ে সকল বিতর্কের অবসান ঘটে। আমার করণীয় কিছু আর থাকে না। কিন্তু সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কমান্ড কোন আলাদা সংগঠনের অস্তিত্ব মেনে নিতে রাজি ছিলেন না, তা সে সংগঠনের উদ্দেশ্য যাই-ই থাক না কেন। শুধু নামই নয়, তাদের পরিচিতির প্রশ্নটিও ছিল বিচার্য বিষয়। লেফটেন্যান্ট জেনারেল আরোরা বললেন, মি. তাজউদ্দীন জানতে চান এই সংগঠনটি কে গড়ে তুলছে এবং কী এর উদ্দেশ্য। আমার ব্যাখ্যা ছিল, এটা একান্তভাবে নিবেদিতপ্রাণ যুবনেতাদের সংগঠন। বাংলাদেশের অভ্যন্তরের আওয়ামী লীগের এই যুব সংগঠনের বিকাশ সাধন এবং গেরিলা যুদ্ধ কার্যক্রম চালানোই এদের লক্ষ্য। আমার ব্যাখ্যা তাকে (জেনারেল আরোরা) সন্তুষ্ট করতে পারলো না। সবকিছুই নিজের অধিনায়কত্বে আনার প্রতি তার সকল মনোযোগ ছিল নিবিষ্ট। তাই যে কোন যুক্তিই ছিল তার কাছে অবান্তর। চিফ অব আর্মি স্টাফ জেনারেল মানেকশ স্বাভাবিক কারণেই তার পরামর্শ মতো চলতেন এবং কলকাতার এক বৈঠকে তিনি আমার প্রতি রুঢ় আচরণ করেন। উপলব্ধি করি, কেউ তাকে বুঝিয়েছে আমি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে আমার ব্যক্তিগত অধিনায়কত্বে এই যুবনেতাদের নিয়ে একটি বাহিনী গড়ে তুলছি। মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে একীভূত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল মহল যুবনেতাদের সঙ্গে কথা বলার এবং তাদের ওপর চাপ সৃষ্টির চেষ্টা কয়েকবারই করে। অন্তত পক্ষে নির্দেশাদি আমার কাছ থেকে নয়,— সরাসরি সেনাবাহিনী হাই কমান্ড থেকে যাতে নেয়, সে চেষ্টাও করা হয়। এ জাতীয় প্রস্তাব তারা অগ্রাহ্য করেন। চাপের বিরুদ্ধে তাদের দৃঢ়তা এ সম্পর্কিত চেষ্টায় যতি টানে। আর যেহেতু আমি চাকরিতে ছিলাম, সে কারণে আমার ওপর চাপ ছিল অনবরত।

"মুজিব বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর দায়িত্ব নির্ধারণ সম্পর্কিত বিতর্ক অবসানের লক্ষ্যে আমি লেফটেন্যান্ট জেনারেল আরোরার সঙ্গেও কথা বলি। তিনি জানান, মুক্তিবাহিনী সীমান্তের বিশ মাইল পর্যন্ত আক্রমণ হানার দায়িত্বে থাকবে আর মুজিব বাহিনী যাবে অভ্যন্তরে। যুব নেতারা এটাই চাইছিলেন। কিন্তু জেনারেল অরোরা চাইছিলেন তারা তার অধিনায়কত্বে থাকবে। যুবনেতারা এই প্রশ্নে তার সাথে একমত ছিলেন না।

"আরেকটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার ছিল। সেটা বাংলাদেশের ভেতরে অনুপ্রবেশের পদ্ধতি সংক্রান্ত। সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিলে সীমান্ত দখল করে রেখেছিল মুক্তিবাহিনী।

"আমার ছেলেরা যে সব এলাকা দিয়ে বাংলাদেশের ভেতরে প্রবেশ করতো, যে সব পথ দিয়ে তাদের চলাচল এবং তাদের আস্তানা ও পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চান লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরা। এর জন্যে চাপাচাপিও করতে থাকেন। সীমান্তে তাদের অনুপ্রবেশ এলাকা সম্পর্কে অবহিত করায় কোন আপত্তি ছিল না যুবনেতাদের। কেননা, সেখানে অবস্থানরত সেনাবাহিনী ইউনিটকে তাদের অনুপ্রবেশে অনুমতি দানের জন্য আগে ভাগেই জানান দেয়া যেতো। কিন্তু তাদের অনুপ্রবেশ রুটির, আস্তানা এবং পরিকল্পনার কোন কিছুই প্রকাশ করতে রাজি ছিলেন না তারা। কেননা, মুক্তিবাহিনী নেতাদের মধ্যে কিছু লোকের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে তারা সন্দেহ পোষণ করতেন এবং তারা ছিল তাদের রাজনৈতিক শত্রু।

www.pathagar.com

"সেনাবাহিনী স্থাপনাকেও ওই সব তথ্য তারা দিতে চান না। কারণ, তাদের অধিনায়কত্বে রয়েছে মুক্তিবাহিনী। তারা নিশ্চয়ই মুক্তিবাহিনীর কাছে সকল তথ্য পাচার করে দেবে।

"বড় ধরনের ঝামেলা কাটিয়ে একটি আপোসমূলক সমাধানে পৌঁছানো গেল। সম্মত সিদ্ধান্ত হলো, মুজিব বাহিনী নেতারা কেবলমাত্র তাদের অনুপ্রবেশ এলাকা সম্পর্কে স্থানীয় সেনা ইউনিট কমান্ডারকে জানাবেন এবং তিনি তাদের ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেবেন। কমান্ড সদর দফতর সব সেনা ইফনিটকে গৃহীত এই ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত করবে।

"জেনারেল কে কে সিং (ডাইরেক্টর অব মিলিটারি অপারেটরস) সেনাবাহিনী প্রধানের পক্ষ থেকে মুজিব বাহিনীর অধিনায়কত্ব ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একটি স্পষ্ট নোট পাঠান জেনারেল অরোরার কাছে। এই বাহিনীর ওপর কি ধরনের কাজের দায়িত্ব অর্পিত, তাও উল্লেখ করেন। নোট প্রদান সত্ত্বেও কোন্দল চলতেই থাকে, মনের আগুনও জ্বলতে থাকে ধিকিধিকি।

"... আমাকে ডেকে পাঠানো হলো

"পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে পরিণত হবার সম্ভাবনা প্রতীয়মান হওয়ায় ভারত সরকার আমাকে অপ্রচলিত যুদ্ধের (গেরিলা যুদ্ধ) একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে ডেকে পাঠান। বলা হলো, সীমান্ত এলাকা সফরের মাধ্যমে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষে এবং বিভিন্ন ধরনের লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রিপোর্ট পাঠাতে। আমি দ্রুত সীমান্ত এলাকা সফর করি এবং বাংলাদেশের কতিপয় যুবনেতার সঙ্গে আলাপ করে রিপোর্ট পাঠাই।

"...যখন খুঁটিনাটি নিয়ে ভাবছিলাম তখন আমার এক বন্ধুর বাড়িতে কালোপানা পেটা শরীরের এক যুবকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। মনে হয় মাসটি ছিল মে। যুবকটি তোফায়েল আহমদ। তিনি তার অপর তিন সহকর্মীর কথা বলেন। তাদের দু'জন সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হন। একজন রাজ্জাক, আওয়ামী লীগের যুবনেতা। আরেকজন সিরাজ আলম,— একটি অগ্নিগর্ভ যুবক। শেখ ফজলুল হক মণির সঙ্গে দেখা হয় পরে। মণির সঙ্গে দেখা হবার পর আমি নিশ্চিত হই যে শ্রদ্ধা করার মত গুণাবলি এই চতুষ্টয়ের মধ্যে বিদ্যমান। তাদের অতুলনীয় আত্মনিবেদন মঙ্গল আনবে এবং দায়িত্ব অর্পণ করা যেতে পারে তাদের ওপর।

"এই যুবনেতারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে রেখে আসা তাদের নিবেদিত প্রাণ রাজনৈতিক কর্মীদের সাংগঠনিক রূপরেখা নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করেন। জানান তারা সাহসী এবং রাজনৈতিকভাবে পরিপক্ক। তাদের যা প্রয়োজন তা হলো গেরিলা/কমান্ডো ধরনের ট্রেনিং ও উপযুক্ত অস্ত্র। আলোচনায় তারা কিছু কমিউনিস্ট ক্যাডার এবং গোঁড়া সাম্প্রদায়িকদের ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধবাদিতার কথাও উল্লেখ করেন। বলেন, এই কমিউনিস্ট ও সাম্প্রদায়িকরা চীন ও পাকিস্তানে তাদের পৃষ্ঠপোষকদের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে। এদের সঙ্গে কোনক্রমেই সহযোগিতা করা

www.pathagar.com

যাবে না। এর অর্থ যদি হয় স্বাধীনতা আরো কয়েক বছর পিছিয়ে যাওয়া এবং অধিকতর আত্মত্যাগ— তাতেও সহযোগিতা নয়। তারা জানান, বাংলাদেশে তাদের এই বিরুদ্ধবাদীরা ছিল সুযোগ সন্ধানী এবং নীতির বালাইও ছিল না তাদের।

"... মোজাফফর গ্রুপে (রুশপন্থী কমিউনিস্ট) তাদের কিছু বন্ধু আছে। কিন্তু তাদের মতে, শ্রমিক ও ছাত্রদের মধ্যে এই গ্রুপের অনুসারী তেমন নেই। পরে মি. ডি পি ধরের অনুরোধে আমি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের সঙ্গে দেখা করি।

"... বাংলাদেশের এই দুর্বার গেরিলা বাহিনী গঠন ও প্রশিক্ষণদানের রাজনৈতিক এবং সাময়িক দায়িত্ব আমার ওপর অর্পিত হলো। বাহিনীর সদস্য সংগ্রহ করবেন যুবনেতারা। নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেই গেরিলা অপারেশন কার্যক্রম প্রণীত করতে হবে এবং সমগ্র পরিকল্পনার তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে আমাকেই। এর চেয়ে সন্তোষজনক কিছু আর আমি চাইতে পারি না।

"...পরে মুজিব বাহিনী "শ্যামের ছেলেরা" নামে অভিহিত হয়। জেনারেল শ্যাম মানেকশ'র নামে এই নামকরণ হয়। তিনি,—জেনারেল মানেকশ, মি. তাজউদ্দীন আহমদকে বলেন যে সেনাবাহিনীর বিশেষ দায়িত্ব সম্পাদনের লক্ষ্যে তিনি নিজেই গড়ে তুলেছেন এ বাহিনী। তার ওই কথায় পুরোনো সেই বিতর্ক— মুজিব বাহিনী কে গঠন করেছে এবং কী উদ্দেশ্যে গঠন করা হয়, তার অবসান ঘটে।"[৩]

৩. *ফ্যানটমস অব চিটাগং : দ্য ফিপ্থ আর্মি ইন বাংলাদেশ*, পৃষ্ঠা: ১৯-৪৩, ৫৭-৬১

www.pathagar.com

মুজিব বাহিনীর যুদ্ধ

মুজিব বাহিনী নেতা চতুষ্টয়ের অন্যতম আবদুর রাজ্জাকের ভাষ্য অনুযায়ী মুজিব বাহিনী তখনো যুদ্ধ শুরুই করেনি। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নিয়ে তারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একেবারে সামনাসামনি না পড়ে গেলে তারা যুদ্ধ করে না। এও সঠিক সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক এবং হাসানুল হক ইনুরা তখনো যুদ্ধে নামেননি কিন্তু 'র' যুদ্ধে নেমে পড়ে শেখ ফজলুল হক মনি গ্রুপের মাধ্যমে। যুদ্ধ শুরু করে দেয় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধরত বামপন্থীদের বিরুদ্ধে।

ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুজিব বাহিনী সদস্যরা ১৯৭১ সালের আগস্ট মাস থেকে বাংলাদেশের ভেতরে প্রবেশ করতে শুরু করে। কিন্তু তাদের দু'মাস আগেই মুক্তিবাহিনী সদস্যরা এসে যায় বাংলাদেশে এবং অভ্যন্তরে বিভিন্ন এলাকায়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধরত বামপন্থীদের সঙ্গে মিলে যুদ্ধে নেমে পড়ে। বৃহত্তর বরিশাল জেলায় পেয়ারা বাগানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে এক মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত হয় মুক্তিবাহিনী সিরাজ শিকদারের সর্বহারা পার্টির সঙ্গে মিলে। ওই যুদ্ধ সম্পর্কে ১৯৭১ সালের ৭জুন পূর্ববাংলা সর্বহারা পার্টির এক প্রচারপত্রে বলা হয় : "পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন (সর্বহারা পার্টির অঙ্গ শ্রমিক সংগঠন) প্রতিনিয়ত আওয়ামী লীগ ও তার নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী সকল দেশপ্রেমিক পার্টি ও জনসাধারণের প্রতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে সঠিক পথে সংগ্রাম পরিচালনা করতে আহবান জানায়। বরিশাল জেলার ঝালকাঠির মুক্তিবাহিনী ও আওয়ামী লীগের দেশপ্রেমিকরা এ আহবানে সাড়া দেয়। তাদের অংশগ্রহণসহ অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের নিয়ে স্থানীয় ভিত্তিতে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠন করা হয়।"

ঐক্যবদ্ধ মুক্তিবাহিনী তফশিলী হিন্দু সম্প্রদায় অধ্যুষিত পূর্ববাংলার বৃহত্তম পেয়ারা বাগান কুরিয়ানা, ডুমুরিয়া, ভীমরুলী এলাকায় গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করে।[১] সিরাজ শিকদারের সর্বহারা পার্টির যোদ্ধারাই শুধু নয়, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইরত সকল বামপন্থী সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক, হাসানুল হক ইনুদের কাছে সহযোদ্ধা গণ্য হলেও শেখ ফজলুল হক মণি গ্রুপের কাছে তা ছিল না। এদের কাছে তারা ছিল কেবলমাত্র বামপন্থী এবং শত্রু চর। অতএব, শেখ ফজলুল হক মণি গ্রুপের মুখ্য লড়াই হয়ে দাঁড়ায় বামপন্থী নির্মূল করা, পাকিস্তান সেনাবাহিনী নয় এবং

১. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫২০-২২

www.pathagar.com

আগস্ট মাসে শেখ ফজলুল হক মণি গ্রুপ বাংলাদেশে প্রবেশ করেই শুরু করে দেয় বামপন্থী নির্মূল অভিযান। সম্মুখ যুদ্ধে না নেমে তারা বেছে নেয় গুপ্তহত্যা প্রক্রিয়া। কোথাও কোথাও নেমে পড়ে সরাসরি লড়াইয়ে। শুধু বামপন্থী নির্মূলই নয়, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যুদ্ধরত মুক্তি বাহিনীর বিরুদ্ধেও অস্ত্র তুলে ধরে তারা। এমন কী মুজিব বাহিনীর সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক, হাসানুল হক ইনু গ্রুপের বামপন্থী চিন্তাচেতনার অনুবর্তী সহযোদ্ধাদেরও হত্যা করে নির্দ্বিধায়।

মুজিব বাহিনীর শেখ ফজলুল হক মণি গ্রুপের হত্যাকাণ্ডের দৃষ্টান্ত তুলে ধরার শুরুতে আসতে হয় প্রকাশিত একটি গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রে। বইটি *ইন্দিরা গান্ধীর বিচার চাই* লেখক অধ্যাপক আহসাব উদ্দীন আহমদ। লেখক তার গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন ষোলজন নিহতের নামে, যাঁদের চৌদ্দজনই মারা গেছেন মুজিব বাহিনীর হাতে, যারা ছিলেন বামপন্থী চেতনায় সিক্ত। চট্টগ্রামের বাঁশখালী থানার নাপোড়া পাহাড়ে রাতের আঁধারে ঘুমন্ত অবস্থায় স্টেনগানের ব্রাশ ফায়ারে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বিরুদ্ধে যুদ্ধরত এই মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করে শেখ ফজলুল হক মণি গ্রুপের মুজিব বাহিনীর সদস্যরা। একইভাবে গুপ্ত হত্যার শিকার হন আজকের সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার সৈয়দ কামেল বখত। নেহাৎ ভাগ্যের জোরে বেঁচে যান তার জ্যেষ্ঠ সৈয়দ দীদার বখত।[২] সৈয়দ কামেল ছিলেন কাজী জাফর-মেননের কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ববাংলার সমন্বয় কমিটির সাতক্ষীরা এলাকার নেতা। জ্যেষ্ঠ সৈয়দ দীদার ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইরত একজন মুক্তিযোদ্ধা।

সৈয়দ কামেল ১৯৭১ সালের মে মাসের গোড়ার দিকে একক প্রচেষ্ঠায় নিজ এলাকায় গড়ে তোলেন গণমুক্তিবাহিনী। জুন মাসের মাঝামাঝিতে নিজ বাহিনী নিয়ে দখল করেন তালা থানা এবং থানা ভবনে সর্বপ্রথম তোলেন বাংলাদেশের পতাকা। পরবর্তীকালে মুক্তিবাহিনীর সহযোগিতায় আক্রমণ হানেন কপিলমুণি থানায়। সালতা নদী, পাটকেল ঘাটা ও সাগরদাড়িতে প্রচণ্ড সম্মুখ সমরে তিনি অবতীর্ণ হন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে।

আগস্ট মাসে সীমান্ত পেরিয়ে ওই এলাকায় আসে মুজিব বাহিনীর এক গ্রুপ কমান্ডার। সৈয়দ কামেল ও সৈয়দ দীদারের আশ্রয়েই দিন কতক অবস্থানের পর সে ফিরে যায় ভারতে। এরপর আবার সে ফিরে আসে মুজিব বাহিনীর জনাকয়েক সদস্যের একটি দল নিয়ে। ওঠে সৈয়দ কামেল ও সৈয়দ দীদারেরই আস্তানায়। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময়, যখন মুক্তিবাহিনী অবিরাম আঘাত হেনে চলেছে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ওপর, সেই সময় রাতের অন্ধকারে স্টেনগানের ব্রাস ফায়ারে তারা হত্যা করে সৈয়দ কামেল বখতকে। তার সঙ্গে ছিলেন আরেক মুক্তিযোদ্ধা— নাম শংকর, তাকেও তারা শেষ করে। সৈয়দ দীদার ওই রাতে কনিষ্ঠের সঙ্গে ছিলেন না। তিনি বেঁচে গেলেন বটে; কিন্তু তাকে তাড়িয়ে ফিরতে থাকে মুজিব বাহিনী সদস্যরা এবং স্বাধীনতার পরও তাড়িয়ে ফেরে।

---

২. পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্ট এরশাদ সরকারের প্রতিমন্ত্রী।

www.pathagar.com

তালা এলাকায় যে পদ্ধতিতে প্রবেশ করে মুজিব বাহিনী সদস্যরা, একই পদ্ধতি অনুসরণ করে সেপ্টেম্বর মাসে মুজিব বাহিনীর তিনজনের একটি দল প্রবেশ করে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানায়। আশ্রয় লাভ করে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত বামপন্থীদের আস্তানায়। কয়েকদিন পর হাতিয়ারসহ পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে তারা। বাধা দিলে হত্যা করে এডভোকেট আবদুর রউফকে। আবদুর রউফ ছিলেন ওই এলাকায় সর্বজন শ্রদ্ধেয় মুক্তিযোদ্ধা। খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার ছ'জন বামপন্থী মুক্তিযোদ্ধাকে তারা হত্যা করে রাজাকারদের সহায়তায়। যেখানে গুপ্তহত্যার সুযোগ ছিল না, সেখানে মুজিব বাহিনীর শেখ ফজলুল হক মণি গ্রুপ নেমে যায় সরাসরি যুদ্ধে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত আলাউদ্দিন-মতিনের পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের বিরুদ্ধে পাবনার শাহপুরে তারা নেমে পড়ে সংঘর্ষে। এই যুদ্ধে আলাউদ্দিন-মতিনের কমিউনিস্ট পার্টির এমন কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা প্রাণ হারান-যারা এপ্রিলের শুরু থেকেই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে লড়ে আসছিলেন। মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র তাক করতেও দ্বিধান্বিত হয় না মুজিব বাহিনী। বিভিন্ন জায়গায় দুপক্ষের মধ্যে গোলাগুলি বিনিময় হয়। নরসিংদীতে প্রচণ্ড রকমের যুদ্ধ শুরু হয়ে যেত যদি না সেখানকার মুজিব বাহিনীর ভেতরকার সিরাজুল আলম খান-আবদুর রাজ্জাক-হাসানুল হক ইনুর সমর্থকরা বাধা দিত। নরসিংদীতে মুজিব বাহিনীর শেখ ফজলুল হক মণি গ্রুপের সদস্যরা দাবি করে মুক্তি বাহিনীকে তাদের অধিনায়কত্বে আসতে হবে। মুক্তি বাহিনী কমান্ড ওই দাবি প্রত্যাখান করলে শেখ ফজলুল হক মণি গ্রুপের সদস্যরা তাদেরকে বশে আনতে অস্ত্র তুলে নেয় হাতে। কিন্তু সমাজতন্ত্রকামী মুজিব বাহিনীর সদস্যদের প্রবল বাধার মুখে তাদেরকে নিরস্ত হতে হয়।

কেবল বামপন্থী মুক্তিযোদ্ধা এবং কখনো কখনো মুক্তি বাহিনীর সদস্যরাই শেখ ফজলুল হক মণি গ্রুপের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল না, নিজেদের বাহিনী তথা মুজিব বাহিনীর তথা মুজিব বাহিনীর ভেতরকার সমাজতন্ত্রকামীরাও তাদের আক্রমণের তালিকায় এসে যায়। যুদ্ধ চলাকালীন দেশের বিভিন্ন এলাকায় দু'গ্রুপের মধ্যে গোলাগুলি বিনিময় হয়। হত্যাকাণ্ড ঘটাতেও পেছপা হয় না শেখ ফজলুল হক মণি গ্রুপ। এই গ্রুপের লোকজন হত্যা করে চট্টগ্রামের ছাত্রলীগ নেতা ১৯৭০ সালে ১২ আগস্টে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রস্তাবের উত্থাপক স্বপন চৌধুরীকে। তিনি ছিলেন সিরাজুল আলম খান-আবদুর রাজ্জাক-হাসানুল হক ইনুদের চট্টগ্রাম এলাকার মুজিব বাহিনীর নেতা। যুদ্ধের শেষভাগে তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। ধরা পড়ার আগে তিনি প্রতিরোধ করেন এবং আহত হন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী তার পরিচয় পেয়ে সতর্ক হয়ে যায়। গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর সংগ্রহের আশায় তাকে সুস্থ করে তোলার জন্য রাঙ্গামাটি হাসপাতালে নিয়ে রাখে। ১৬ ডিসেম্বরের আগেই রাঙ্গামাটি মুক্ত হয়ে যায়। স্বপন চৌধুরী ওই তারিখে অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বর হাসপাতালে ছিলেন। কিন্তু পরদিন তার আর খোঁজ পাওয়া যায় না। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে স্বপন চৌধুরীর ধরা পড়া এবং নিখোঁজ হয়ে যাওয়া সম্পর্কে আমাকে দেয়া এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে হাসানুল

www.pathagar.com

হক ইনু বলেন : "আমাদের বিশ্বাস শেখ ফজলুল হক মণি গ্রুপের লোকজন তাকে পাক বাহিনীর হাতে ধরিয়ে দেয়। ... তাকে গোপনে সরিয়ে ফেলা হয়। তার খোঁজ পাওয়া যায়নি। যে নার্স তার চিকিৎসায় ছিলেন তিনিও ১৯৭২ সালেই গায়েব হয়ে যান। কেননা, স্বপন চৌধুরীর নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার সাক্ষী ছিলেন ওই নার্স।" আর এ বিষয়ে আবদুর রাজ্জাক বলেন : "আমি শুনেছি, আমার কাছে এ রকম একটি খবর আছে যে তাকে ধরিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু পাল্টাও শোনা যায় যে, রাজাকাররা ধরিয়ে দেয়। ওই ছেলেটি একটি ব্রিলিয়ান্ট ছেলে ছিল। আমার হাতেরই রিক্রুট ছিল। খুবই ভাল ছেলে ছিল।"

শেখ ফজলুল হক মণি গ্রুপের মুজিব বাহিনীর হত্যাকাণ্ডের নানা বিবরণ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, বই-পুস্তকে এসেছে। অধিক দৃষ্টান্তের বিবরণে এর কলেবরই বাড়বে মাত্র।

'র'-এর হয়ে যুদ্ধ চলাকালীন শেখ ফজলুল হক মণি এবং তার গ্রুপ বামপন্থী ও মুজিব বাহিনীর সমাজতন্ত্রকামীদের নির্মূলে যে অভিযানে নামে, স্বাধীনতার পর তা সম্প্রসারিত হয় তার ব্যক্তি উচ্চাভিলাষ চরিতার্থে। নেমে পড়েন অভিযানে বেসরকারি সশস্ত্র বাহিনী আওয়ামী যুবলীগ তৈরি করে। 'র' সৃষ্ট 'মুজিববাদ' নামক অদ্ভুত 'বাদ' প্রতিষ্ঠার শ্লোগানকে করা হয় হাতিয়ার।

এখানে অনিবার্য কারণে এসে পড়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় একটি বামপন্থী দল সংঘটিত হত্যাকাণ্ড বিষয়ক ঘটনাবলি। এ ঘটনার উল্লেখ এই কারণে আসে যে, তা না আনলে ওই দলটি তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে নতুন প্রজন্মের কাছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নামে ভুল ধারণা দেয়ার চেষ্টা করবে। ইতোমধ্যে এ দলটি কোন কোন পত্রিকায় 'শ্রেণী শত্রু খতমের' নামে নির্বিচারে সাধারণ মানুষের হত্যাকাণ্ডকে বিপ্লবী যুদ্ধ বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। তাই মুজিব বাহিনীর হত্যাকাণ্ডের পাশাপাশি অনিবার্য কারণে এসে পড়ে আবদুল হক-মোহাম্মদ তোয়াহার পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) সংঘটিত পেড়োলী হত্যাকাণ্ড।

পেড়োলী আজকের নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলার একটি গ্রাম। স্বাধীনতা যুদ্ধচলাকালীন এ গ্রামে শ্রেণী শত্রু খতমের নামে কয়েকশ' সাধারণ মানুষকে হত্যা করে আবদুল হকের কমিউনিস্ট পার্টি। এ তথ্য আমাকে দিয়েছেন শাহ মোহাম্মদ নাজমুল আলম।[৩] তখন তিনি খুলনার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি সর্বপ্রথম খুলনা কালেক্টরেট ভবনে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। এ কারণে তাকে তৎকালীন উপআঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক লেফটেন্যান্ট কর্নেল শামসের সহকারী মেজর হিশাম উদ্দীনের[৪] মুখোমুখি হতে হয় জবাবদিহি করার জন্য। আবদুল হকের কর্মীরা ওই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে তাদের হাতে তার তুলে দেয়া অস্ত্র দিয়ে। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে খুলনার পতন ঘটলে শাহ মোহাম্মদ নাজমুল

৩. পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সরকারের উপসচিব

৪. পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সরকারের সচিব

www.pathagar.com

আলম শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। পরে ভারত গমনের উদ্দেশ্যে সিরাজুল আলম খান ও কামাল সিদ্দিকীর[৫] সঙ্গে মিলে মেহেরপুরে এসে হাজির হন। মেহেরপুরের ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের[৬] মেজর ওসমান তার বাহিনীর অস্ত্রাগার থেকে এক ট্রাক ভর্তি ৩০৩ রাইফেলস, স্টেনগান, রকেট লাঞ্চার, গ্রেনেড, হালকা মেশিনগান তুলে দেন তাদের হাতে। পৌঁছাতে হবে পিরোজপুরে মেজর জলিলের কাছে। দায়িত্ব পড়লো শাহ মোহাম্মদ নাজমুল আলমের ওপর। পথে দেরি হওয়াতে পূর্ব নির্ধারিত টেকেরহাট থেকে পিরোজপুরগামী লঞ্চ না পাওয়াতে গোপালগঞ্জগামী একটি লঞ্চে উঠে পড়েন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এবং সেখানে পৌঁছে অস্ত্র তুলে দেন প্রাদেশিক পরিষদের এক সদস্যের হাতে। কিছু অস্ত্র— আটটি স্টেনগান, চার বাক্স গ্রেনেড ও একটি রকেট লঞ্চার রেখে দেন নিজ এলাকা পেড়োলীতে প্রতিরোধ ঘাঁটি গড়ে তোলার লক্ষ্যে। পেড়োলী পৌঁছে সেখানকার পীরের ছেলে নিয়াজ আহমদ নিয়াজী ওরফে মঞ্জুর হাতে তুলে দেন সে সব। মঞ্জুর সঙ্গে শাহ মোহাম্মদ নাজমুল আলমের জানাশোনা ছিল আগে থেকেই। তাকে তিনি প্রগতিশীল বলে জানতেন। জানতেন না সে আবদুল হকের শ্রেণীশত্রু খতম লাইনের লোক। জানলে তার হাতে অস্ত্র তুলে দিতেন না। নিয়াজ আহমদ নিয়াজী ওরফে মঞ্জুর হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে শাহ মোহাম্মদ নাজমুল আলম চলে যান অন্য এলাকায়।

এর আগেই এই এলাকায় ডাক্তার সাইফ-উদ-দাহারের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট কর্মী সংঘ স্থানীয় আওয়ামী লীগের সঙ্গে মিলে যৌথ প্রতিরোধ কমিটি করে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়ে। নিয়াজ আহমদ নিয়াজী ওরফে মঞ্জু এবং তার নেতা কায়সার শিকদারও নিজেদের কর্মীবাহীনী সঙ্গে নিয়ে এসে যোগ দেয় যৌথ প্রতিরোধ কমিটিতে। ১৯৭১ সালের জুলাই মাসের শেষের দিকে ওই গ্রামে আসেন আবদুল হক এবং কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করেন। এলাকা থেকে তার চলে যাওয়ার পর পরই মঞ্জু এবং কায়সার শিকদার তাদের কর্মীদের নিয়ে প্রতিরোধ কমিটি ছেড়ে চলে যায় এবং শুরু করে দেয় শ্রেণীশত্রু খতমের নামে সাধারণ মানুষ হত্যা। ঠিক এই সময় ভারত থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিবাহিনীর একটি দল কমিউনিস্ট কর্মী সংঘ ও আওয়ামী লীগ যৌথ বাহিনীতে এসে যোগ দিয়ে শক্তি বৃদ্ধি করে। পেড়োলী ইউনিয়নে আবদুল হকের বাহিনী, যা পরিচালিত হচ্ছিল মঞ্জু এবং কায়সার শিকদারের নেতৃত্বে, তাদের নির্বিচার হত্যালীলায় ভীত-সন্ত্রস্ত সাধারণ মানুষ যৌথ বাহিনীর কাছে ছুটে আসে প্রাণ বাঁচানোর আবেদন নিয়ে। যৌথ প্রতিরোধ বাহিনী আবদুল হকের বাহিনীর ওপর প্রথম আঘাত হানে আগস্ট মাসে। কিন্তু সে আক্রমণ ব্যর্থ হয়। সেপ্টেম্বর মাসে মুক্তি বাহিনীর নতুন আরেকটি দল এসে যোগ দেয় যৌথ প্রতিরোধ বাহিনীতে এবং এর শক্তি আরো বৃদ্ধি পায়। এই যৌথ বাহিনী অক্টোবর মাসে চূড়ান্ত আঘাত হানে আবদুল হকের বাহিনীর ওপর এবং তাদেরকে আত্মসমর্পণ ও এলাকা

৫. ওই সময় নড়াইলের এসডিও পরে বাংলাদেশ সরকারের যুগ্মসচিব

৬. পরবর্তীতে বাংলাদেশ রাইফেলস

www.pathagar.com

ছেড়ে যেতে বাধ্য করে। এ সম্পর্কে আমাকে দেয়া এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে কমিউনিস্ট কর্মী সংঘের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক কমরেড ডাক্তার সাইফ-উদ-দাহার বলেন : "আমারই প্রস্তাব মতে পেড়োলীর পাশের গ্রাম খড়লিয়ায় গঠিত হয় যৌথ প্রতিরোধ কমিটি। আমরা জুলাই মাস পর্যন্ত একসঙ্গে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও রাজাকারদের বিরুদ্ধে লড়েছি। জুলাই মাসে পেড়োলী গ্রামে আবদুল হকের সফরের পর পরই মঞ্জু-কায়সার শিকদাররা যৌথ প্রতিরোধ কমিটি পরিত্যাগ করে চলে যায়, নেমে পড়ে শ্রেণীশত্রু খতমের নামে সাধারণ মানুষ হত্যায়। তাদের হত্যাকাণ্ড রোধের আবেদন নিয়ে আমাদের কাছে ছুটে আসে স্থানীয় অধিবাসীরা। তাই যৌথ প্রতিরোধ বাহিনীকে নামতে হয় শ্রেণীশত্রু খতমকারীদের বিরুদ্ধে। অক্টোবর মাসে সাধারণ মানুষের জীবন রক্ষায় তাদের উৎখাতে সফল অভিযান চালাই আমরা। তারা আত্মসমর্পণ করে এবং তাদেরকে এলাকা ছেড়ে যেতে বাধ্য করি।"

এ ঘটনা উল্লিখিত হচ্ছে এই কারণে যে স্বাধীনতা যুদ্ধ যখন চলছিল, সে সময় মুজিব বাহিনী যে হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করে, তার সঙ্গে আবদুল হকের 'বিপ্লবী' বাহিনীর হত্যাকাণ্ডের মূলগত কোন পার্থক্য নেই। তবে এরা হত্যা করেছে নিরস্ত্র সাধারণ মানুষকে আর শেখ ফজলুল হক মণি গ্রুপের মুজিব বাহিনী হত্যা করেছে 'র'-এর প্ররোচনায় তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ স্বাধীনতা যোদ্ধাদের। কিন্তু তাদের মাধ্যমে 'র'-এর পক্ষে পুরো পরিকল্পনা কার্যকর করা সম্ভব হয়ে ওঠে না মুজিব বাহিনীর বেশিরভাগ অংশের সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক চেতনার অনুবর্তী হয়ে পড়ার কারণে—যাদের নেতৃত্বে ছিলেন সিরাজুল আলম খান–আবদুর রাজ্জাক এবং হাসানুল হক ইনুরা।

www.pathagar.com

শেখ মুজিবের রাজনৈতিক অস্থিরতা
'র' - সিআইএ মুখোমুখি

যে উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য নিয়ে মুজিব বাহিনী গঠন করা হয় ভারতের মাটিতে, তার বিনাশ ঘটায় 'র' তার উদ্দেশ্য সাধনে ভিন্নতর পরিকল্পনা নেয়। স্বাধীন বাংলার মাটিতে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধ চরাকালীন ভারতের সঙ্গে যে সাত দফা গোপন চুক্তি সম্পাদন করে, তাতে নতুন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা রক্ষায় যে আধাসামরিক বিশেষ বাহিনী গঠনের ধারা সন্নিবেশিত হয়, সেই বাহিনীই হচ্ছে সে পরিকল্পনার বাস্তবায়ন। রক্ষী বাহিনী হচ্ছে সে বাহিনী।

রক্ষী বাহিনী গঠনের ভেতর দিয়ে 'র' দু'টি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্য স্থির করে। এক, কমিউনিজম ও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী, যারা ভারতে গিয়ে এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়েছে, তাদেরকে এবং দুই. তার মার্কিনপন্থী প্রতিপক্ষকে—তারা মুক্তিযোদ্ধা হোক বা না-ই হোক, তাদেরকেও কায়িকভাবে নিশ্চিহ্ন করা।

শেখ মুজিব দেশ স্বাধীন হবার ২৫ দিন পর, ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পাকিস্তান জেল থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফেরেন। ক্ষমতায় বসার পর পরই যে বিষয়টির প্রতি তিনি সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেন, তা হল, প্রতিপক্ষকে নির্মূল করা। আর তার প্রতিপক্ষ হচ্ছে তারই ভাষ্যানুযায়ী বামপন্থীরা। এ বিষয়ে ফ্রান্সের দৈনিক *লা মঁদ*-এ প্রকাশিত তার সাক্ষাৎকার স্মর্তব্য। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের আগে কোন এক সময় *লা মঁদকে* দেয়া তার ওই সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয় ১৯৭১ সালের ৩১ মার্চে। তাতে শেখ মুজিব বলেন : "পশ্চিম পাকিস্তান সরকার কি এটা বোঝেন না যে আমিই হলাম একমাত্র লোক যে পূর্ব পাকিস্তানকে কমিউনিজম থেকে রক্ষা করতে সক্ষম। যদি তারা লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নেন তবে আমি ক্ষমতাচ্যুত হবো এবং আমার নামে 'নকশালরা' নেমে পড়বে। যদি বেশি ছাড় দেই, আমি কর্তৃত্ব হারাব। মুশকিলে আছি আমি।" অতএব, লক্ষ্য অনুযায়ী শেখ মুজিবের পক্ষে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে কায়িকভাবে বিনাশ করা সম্ভব সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণাধীন একটি বাহিনীকে ব্যবহার করে। উদ্দেশ্য সাধনে সেনাবাহিনীকে হয়তো ব্যবহার করা যেতো। কিন্তু সমস্যা ছিল অন্যখানে। প্রথমত, সেনাবাহিনী তখনো রয়েছে অসংগঠিত পর্যায়ে। উপরন্তু সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্য (তখনো পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালি সৈনিক ও

www.pathagar.com

অন্যান্য পেশার লোকজন ফিরে আসেনি বাংলাদেশে) অংশ নিয়েছে মুক্তিযুদ্ধে। তাদেরকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োগ, ভিন্ন ধরনের জটিলতা হয়তো সৃষ্টি করতো এবং সে জটিলতা অবশ্যিই রাজনৈতিক। অতএব, প্রতিপক্ষকে নির্মূলে এমন একটি বাহিনীর প্রয়োজন পড়ে, যা কোন রাজনৈতিক চেতনায় সিক্ত নয়। কিংবা কোন লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত নয়। এই কারণেই মুজিব বাহিনী নেতৃবৃন্দ দেশ স্বাধীন হবার পর স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে (দেশ স্বাধীন হবার পর স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ পুনরুজ্জীবিত করা হয়) অস্থায়ী সরকার বাতিল করে তারই নেতৃত্বে জাতীয় বিপ্লবী সরকার গঠন এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল রাজনৈতিক শক্তিকে ওই সরকারের অন্তর্ভুক্তির যে আহবান জানায়, শেখ মুজিব তা নাকচ করে দেন।

বিপ্লবী সরকারের প্রস্তাব বাতিল হয়ে যাবার পর স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আরো ছটি প্রস্তাব রাখে শেখ মুজিবের কাছে। হাসানুল হক ইনুর দেয়া তথ্য অনুযায়ী প্রস্তাবগুলো হলো : এক, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল দল ও মতের প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধাকে সরকারি ঘোষণাবলে অস্ত্রসহ ক্যাম্পে একত্রিত করে তালিকাভুক্ত করতে হবে এবং সরকারিভাবে স্বীকৃতিদানের মাধ্যমে মর্যাদাবান করতে হবে; দুই, পাকিস্তান ও ব্রিটিশের ছেড়ে যাওয়া ঔপনিবেশিক প্রশাসনের বদলে নতুন প্রশাসনের অবকাঠামো তৈরির লক্ষ্যে তাদেরকে মেধা অনুযায়ী কাজে লাগাতে হবে। এদের যারা স্বাধীন দেশের প্রতিরক্ষা ও প্রশাসনে আসতে চায়, তাদেরকে মেধানুযায়ী সুযোগ দিতে হবে; তিন, মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে সেনাবাহিনী গড়ে তুলেতে হবে,। তবে সে বাহিনী প্রচলিত (Conventional) বাহিনীর মত হবে না। এ বাহিনী হবে জনগণের বাহিনী। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে তাদেরকে নিয়োগ করতে হবে; চার? অস্থায়ী সরকার ও আওয়ামী লীগের এমএনএ ও এমপিএ যারা ভারতে অবস্থানকালে দুর্নীতি করেছে, স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, গণবিরোধী ও মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী কাজ করেছে, তাদেরকে আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কার করতে হবে এবং ট্রাইবুনাল গঠন করে বিচার করতে হবে। বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ—যারা জীবন বাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধে লড়েছে, তাদেরকে আওয়ামী লীগে আসার আহবান জানাতে হবে; পাঁচ, সরকার প্রধান নয়, দলীয় প্রধান হিসেবে শেখ মুজিব সরকারের বাইরে থেকে সরকারের ভুলভ্রান্তিকেই শুধু দেখিয়ে দেবেন না, সেটা নিরসনে নির্দেশ দান করবেন এবং দলীয় প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করবেন; ছয়, বাইরে থেকে যে বিপুল সাহায্য আসছে তা প্রধানত দেশ পুনর্গঠনে ও গণশিক্ষার কাজে ব্যবহার করতে হবে।

এবারও শেখ মুজিব এ প্রস্তাব নাকচ করে দেন। কেননা, প্রস্তাবের মধ্যে তিনি দেখেন জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ এমন এক সাচ্চা দেশপ্রেমিক তরুণ সমাজকে—যারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং মুজিব বাহিনীর মধ্যে তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুতরাং সঙ্গত কারণেই প্রস্তাব বাতিল হবার কথা। একই সময়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দল দাবি তোলে, স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিয়েছে যেসব দল তাদেরকে নিয়ে জাতীয়

www.pathagar.com

সরকার গঠন করতে হবে। শেখ মুজিব তাদের দাবিও অগ্রাহ্য করলেন। এ প্রেক্ষিতে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, যে শেখ মুজিব আজীবন গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছেন, জেল জুলুম নির্যাতন সয়েছেন, তিনি এই গণতান্ত্রিক দাবি অগ্রাহ্য করলেন কেন? এ কেমন ধারার মানসিকতা?

আদতে গণতান্ত্রিক সহনশীলতার কথা তার মুখে উচ্চারিত হলেও এক আশ্চর্য রকমের আধিপত্যকামী মানসিকতা আগাগোড়াই তার ভেতর ক্রিয়াশীল ছিল। এধরনের মানসিকতার অধিকারী ব্যক্তিরা রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে সহ্য তো করতে পারেনই না, অন্যের অবদানের স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠিত হন। যেমন, ১৯৬৯ সালে আইউব আহূত লাহোর গোলটেবিল বৈঠকে শেখ মুজিব যখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হিসেবে প্যারোলে যেতে রাজি হয়ে যান তখন এক গোয়েন্দা কর্মকর্তা শেখ মুজিবকে অনিবার্য রাজনৈতিক বিপর্যয় থেকে বাঁচিয়ে দেন। অথচ এর পুরো কৃতিত্ব তিনি দিয়েছেন নিজ পত্নীকে,—সাংবাদিক আবদুল গফফার চৌধুরীর সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপকালে। শেখ মুজিব ওই গোয়েন্দা কর্মকর্তার ভূমিকা সম্পর্কে আবদুল গাফফার চৌধুরীকে কোন আঁচ না দিলেও স্বীকার করেছেন অন্যখানে—জি ডবলিউ চৌধুরীর কাছে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং মেজর জেনারেল মুজাফফরউদ্দীনও জি ডবলিউ চৌধুরীর কাছে ওই গোয়েন্দা কর্মকর্তার ভূমিকার সত্যতা প্রতিপাদন করেন।[১] অবশ্যি জি ডবলিউ চৌধুরী তাঁর বইতে গোয়েন্দা কর্মকর্তার নাম উল্লেখ করেননি। গোয়েন্দা কর্মকর্তা ছিলেন শেখ মুজিবের সেই ঘনিষ্ঠতম ইনার সার্কেল—এ বি এস সফদার। স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবের সময় রাষ্ট্রপতির পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ টিমের প্রধান হন তিনি।

শেখ মুজিব করাচিতে অনুষ্ঠিত আইউব আহূত গোলটেবিল বৈঠকে যেতে রাজি হলেন কেন? কীভাবেই বা এ বি এস সফদার তাকে অনিবার্য রাজনৈতিক বিপর্যয় থেকে বাঁচালেন? ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের বন্দিখানায় শেখ মুজিবের সঙ্গে আইউবের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এডমিরাল এ আর খানের তিন ঘণ্টাব্যাপী যে গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, তার মূল প্রতিপাদ্য ছিল—পাকিস্তানের পরবর্তী সরকার হবে পার্লামেন্টারি—গণতান্ত্রিক। শেখ মুজিব হবেন তার প্রধানমন্ত্রী আর আইউব খান হবেন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান। এবং শেখ মুজিবের দেয়া দুটি শর্ত—তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু শিল্পপতি ইউসুফ হারুনকে পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর আর ডক্টর এম এন হুদাকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর করা হবে—যা কয়েকদিন পরই কার্যকর হয়ে যায়। এ বিষয়ে একই কথা বলেছেন জি ডবলিউ চৌধুরী তার *দ্য লাস্ট ডেজ অব ইউনাইটেড পাকিস্তান* গ্রন্থে।[২] আর ডক্টর এম এন হুদা[৩] আমাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন : "গোলটেবিল বৈঠকে

১. জি ডবলিউ চৌধুরী : *দ্যা লাস্ট ডেজ অব ইউনাইটেড পাকিস্তান*, পৃষ্ঠা -৩৭, ৪৫

২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা -৩৮

৩. এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সাবেক পূর্ব পাকিস্তান গভর্নর মোনায়েম খানের আমলে প্রাদেশিক অর্থমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি সাত্তারের সময় বাংলাদেশের উপরাষ্ট্রপতি।

www.pathagar.com

যোগদান করতে গিয়ে শেখ মুজিব উঠেছিলেন ইস্ট পাকিস্তান হাউজে। আমিও তখন ছিলাম সেখানে। আমার সঙ্গে দেখা হতেই তিনি বললেন, "আপনি এখনও এখানে? আপনি শিগগির ঢাকায় যান। মোনায়েম খানের কাছ থেকে গভর্নরের দায়িত্ব নিয়ে নিন।" শেখ মুজিবের সঙ্গে এ আর খানের বৈঠকের পরই রাষ্ট্র হয়ে যায় যে, "শেখ মুজিব প্যারোলে লাহোর যেতে রাজি হয়েছেন।" এই খবর ছড়িয়ে পড়া মাত্র সারা বাঙলা তার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। প্রতিবাদের ঝড় ওঠে সর্বত্র। এ সময়ই গোয়েন্দা কর্মকর্তা এ বি এস সফদার ছুটে যান বেগম মুজিবের কাছে। তাকে বলেন : "আইউবের পতন এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। এই সময় শেখ সাহেব যদি প্যারোলে গোলটেবিল বৈঠকে যান তবে তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার চিরকালের জন্য মসীলিপ্ত হয়ে যাবে। একমাত্র আপনিই পারেন তাকে প্যারোলে যাওয়া থেকে নিরস্ত করতে। পারেন তাকে বোঝাতে যে চাপাচাপি করলে আইউব খান তাকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে বাধ্য হবেন। দাবার ঘুটি এখন আর আইউবের হাতে নেই। তাকে আপনাকে গিয়েই বলতে হবে।" বেগম মুজিব রাজি হতেই তিনি গিয়ে দেখা করেন জেনারেল অফিসার কমান্ডিং মেজর জেনারেল মুজাফফর উদ্দিনের সঙ্গে। শেখ মুজিব ও বেগম মুজিবের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেন। "অকস্মাৎ এক জটিল পারিবারিক সঙ্কট উদ্ভুত হওয়ায় তার সঙ্গে বেগম মুজিবের দেখা করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে এবং বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি"—এই কারণ দেখিয়ে এ বি এস সফদার জেনারেল মুজাফফরকে সাক্ষাতের অনুমতি দিতে রাজি করান। এবং বেগম মুজিব সকল সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে আচমকা কুর্মিটোলা বন্দি শিবিরে গিয়ে হাজির হন। শেখ মুজিব পত্নীকে দেখে অবাক হয়ে যান। কেননা, তিনি জানতেন না স্ত্রী আসছেন দেখা করতে। তাকে জানতে দেয়া হয়নি। এবার দেখা যাক ক্যান্টনমেন্টের বন্দিশিবিরে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হওয়া নিয়ে শেখ মুজিব সাংবাদিক আবদুল গাফফার চৌধুরীকে কি বলেছিলেন।

১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আলজিরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে যাবার পথে বিমানে বসে শেখ মুজিব আবদুল গাফফার চৌধুরীকে বলেন : "হঠাৎ দেখি তোমার ভাবি কুর্মিটোলা বন্দি শিবিরে এসে হাজির। সেদিন তার সাথে আমার ইন্টারভিউ ছিল না। তাই বিস্মিত হলাম মিলিটারি গার্ড কী তবে তাকে ছেড়ে দিল! তিনি আমার কাছে এগিয়ে এলেন। বললেন : এসব কি শুনছি? তুমি সহবন্দিদের রেখে নাকি একা প্যারোলে মুক্ত হচ্ছো। তুমি আমার স্বামী। তুমি মুক্ত হলে আমার চাইতে খুশি দুনিয়াতে কেউ হবে না। কিন্তু এভাবে যদি মুক্ত হও, তাহলে আর কিছু না পারি, বাড়ি গিয়ে বটি দিয়ে ছেলেমেয়ে সবগুলোকে কেটে নিজে আত্মহত্যা তো করতে পারি। সেদিনই সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম প্যারোলে মুক্ত হব না। যদি ছাড়া পাই বিনাশর্তে সকলকে নিয়ে ছাড়া পাব।"[৪] এরপর শেখ মুজিব ঘোষণা দেন যে নিঃশর্ত মুক্তি ছাড়া তিনি গোলটেবিল বৈঠকে যাবেন না।

৪. দৈনিক *জনপদ* : ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩

www.pathagar.com

তাকে নিঃশর্ত মুক্তি দেয়া তো হয়ই, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাও হয় প্রত্যাহত। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, যে ব্যক্তিটির অনন্য ভূমিকা তাকে অনিবার্য রাজনৈতিক বিপর্যয় থেকে বাঁচায়, আবদুল গাফফার চৌধুরীর কাছে তিনি তার নামটি পর্যন্ত উচ্চারণ করলেন না।

অন্যের অবদানকে স্বীকার না করার শেখ মুজিবের এই মানসিকতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ছয় দফার প্রণয়ন নিয়েও। ছয় দফার প্রণেতা সম্পর্কিত প্রশ্নটি শেখ মুজিব ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত এড়িয়ে গেছেন। ওই বছরই অর্থাৎ দীর্ঘ সাত বছর পর এ বিষয়ে তিনি সর্বপ্রথম মুখ খোলেন। এর কারণ জানতে চেয়ে প্রশ্ন করা হলে ছয় দফার প্রণেতা রুহুল কুদ্দুস আমাকে বলেন : "অন্যের অবদানকে স্বীকৃতি দেবার উদারতার অভাব ছিল শেখ মুজিবের মানসিকতায়। তার অবর্তমানে দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে, এটা তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না। তাই আমাকে তিনি কখনো জিজ্ঞেস করেননি কী কষ্ট আমরা করেছি অথবা যন্ত্রণা আমরা সয়েছি কিংবা যুদ্ধ করেছি কীভাবে। সৈয়দ নজরুল ইসলামও[৫] আমাকে বলেছেন তাকেও যুদ্ধ সম্পর্কে শেখ মুজিব কোন প্রশ্ন করেননি। অন্যের অবদানকে স্বীকৃতি দেয়ার ব্যাপারটি শেখ মুজিব সর্বদাই সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। অথচ আশ্চর্য! পাকিস্তান জেল থেকে দেশে ফিরেই সোজা ক্যান্টনমেন্টে চলে যান পাকিস্তানি যুদ্ধ বন্দিদের দুঃখ-দুর্দশা দেখতে।" অন্যদিকে এই শেখ মুজিবই অতুলনীয় দার্ঢ্যের পরিচয় দেন সাত দফা গোপন চুক্তিকে অগ্রাহ্য করায় এবং অবলীলায় নিজেকে প্রতিভাত করান বাঙালি জাতীয়তাবাদের শ্রেষ্ঠতম পুরুষ হিসেবে। পাশাপাশি ওই গোপন চুক্তির প্যারামিলিশিয়া বাহিনী গঠনের ধারাটি কার্যকর করে তার আধিপত্যকামী মানসিকতাকেই স্পষ্ট করে তোলেন। এই ধরনের মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা যেমন অন্যের অবদানের স্বীকৃতি দিতে চান না, তেমনি প্রতিপক্ষকেও জিইয়ে রাখতে নারাজ। প্রতিপক্ষকে নির্মূল করাই তার সকল কর্মের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। শেখ মুজিব গোপন সাত দফা চুক্তির প্যারামিলিশিয়া বাহিনী গঠনের ধারায় প্রতিপক্ষ নির্মূলের সেই সম্ভাবনাকে স্পষ্ট দেখতে পান।

ছয় দফাতে প্যারামিলিশিয়া বাহিনী তৈরির কথা ছিল। সেটা পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যেই। কিন্তু স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে নতুন কোন প্যারামিলিশিয়া বাহিনী গঠনের যৌক্তিকতা আর থাকে না। কেননা, প্যারামিলিশিয়া বাহিনীর অস্তিত্ব ছিল বিদ্যমান এবং সেটা বাংলাদেশ রাইফেলস। সীমান্ত নিরাপত্তা এবং অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ওই বাহিনীকে কার্যকরভাবে ব্যবহারের সুযোগ ছিল অবারিত। উপরন্তু ওই বাহিনীর সদস্যরা যুদ্ধের ভেতর দিয়ে নিজেদেরকে করে পরিশুদ্ধ। এছাড়া নিজস্ব সেনাবাহিনী গঠনের দ্বার যেখানে উন্মুক্ত এবং যার প্রতিটি সদস্যের নবজন্ম ঘটে যুদ্ধের ভেতর দিয়ে, তাদেরকে গুরুত্ব না দিয়ে শেখ মুজিব তার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথে পা বাড়ান। গঠিত হলো রক্ষী বাহিনী। ১৯৭২ সালে ৭ মার্চে জাতীয় রক্ষী বাহিনী আদেশে করেন স্বাক্ষর। ১ ফেব্রুয়ারি থেকে এ আদেশ কার্যকর করার নির্দেশ দেয়া হলো। অপরদিকে 'র' রক্ষী বাহিনী গঠনের মধ্য দিয়ে তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নেমে পড়ে। সিআইএও তৎপর হয়ে ওঠে।

---

৫. অস্থায়ী সরকারের প্রেসিডেন্ট, দেশ স্বাধীন হবার পর উপরাষ্ট্রপতি

www.pathagar.com

২৫ মার্চের পর ভারতের মাটিতে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার এবং জাতীয়তাবাদী চেতনায় সিক্ত সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধাদের ভেতর সিআইএ যেমন সক্রিয় ছিল, দেশ স্বাধীন হবার পর একইভাবে তৎপর হয়ে ওঠে বাংলাদেশে 'র'-এর পরিকল্পনা ভণ্ডুল করণে এবং নিজস্ব পরিকল্পনা বাস্তবায়নে। সিআইএ দ্বিমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। একটা ব্যর্থ হলে আরেকটার হবে প্রয়োগ ১৯৬৫ সালে আইউব উৎখাত পরিকল্পনার মতোই।

পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সিআইএ একদিকে শেখ মুজিব সরকারের অভ্যন্তরে গা ঢাকা দিয়ে থাকা তার শিখণ্ডীর পরিচর্যায় নামে। ওই শিখণ্ডী খোন্দকার মোশতাক জোট—যাদের সিআইএ তৈরি করে ভারতের মাটিতে, অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের ভেতরে। আর রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলার লক্ষ্যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় দীপ্ত অমিততেজা মুক্তিযোদ্ধাদের সততাকে পুঁজি করে মাঠে নামে 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের' শ্লোগান নিয়ে। এই লক্ষ্যে অর্থাৎ বাংলার বুকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ওয়াশিংটন থেকে উড়ে আসেন সাংবাদিকের ছদ্মবেশে ল্যারি লিপৎসুলজ।[৬] তার পথ ধরে পরে আসেন রিলিফ কর্মীর ছদ্মবেশে পিটার কাসটারস। সিআইএ মোশতাক জোটকে তৈরির মাধ্যমে এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে 'র'-এর পরিকল্পনা নির্মূলের লক্ষ্যই শুধু স্থির করে না—শেখ মুজিবকে উৎখাতের পরিকল্পনাও গ্রহণ করে। এখানে একটি প্রশ্ন অনিবার্য কারণে এসে যায়, যে শেখ মুজিব আগাগোড়াই পশ্চিমা ঘেঁষা, তাকে সিআইএ উৎখাত করতে চাইলোই বা কেন? আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এক দ্বৈত মানসিকতাসম্পন্ন চরিত্রের মানুষ ছিলেন শেখ মুজিব। তার এই মানসিকতার প্রতিফলন শুধু তার ব্যক্তি জীবনেই ঘটেনি, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেও ছাপ পড়েছে স্পষ্ট। আর এ কারণেই মার্কিনীদের আস্থা তাকে হারাতে হয়, আস্থা হারান ভারত এবং রাশিয়ারও। তার রাজনৈতিক দ্বৈত মানসিকতার পরিচয় সর্বপ্রথম মেলে ১৯৭২ সালে পাকিস্তানি জেল থেকে মুক্ত হবার পর পরই।

পাকিস্তানি বন্দিদশা থেকে মুক্ত হবার পর ঢাকার উদ্দেশ্যে লন্ডনগামী বিমানে ওঠার আগে শেখ মুজিবের সঙ্গে পাকিস্তানের নতুন প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর দু'দফা বৈঠক হয়। বৈঠকে শেখ মুজিব ভুট্টোকে আশ্বাস দেন যে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে তিনি বাংলাদেশের কাঠামোগত সম্পর্ক রাখবেন। ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে বিশ্ববিখ্যাত ইতালীয় ফ্রিল্যান্স মহিলা সাংবাদিক ওরিয়ানা ফালাসিকে দেয়া সাক্ষাৎকারে জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন : "লন্ডন হয়ে ঢাকা ফেরার আগে আমি দু'বার তার সঙ্গে দেখা করি। তিনি কুরআন বের করেন, কুরআন স্পর্শ করে শপথ নেন যে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন।"[৭] লন্ডনে পৌঁছে হোটেলে বসে সাংবাদিক এ্যান্থনি মাসকারেনহাসের সঙ্গে আলাপকালে শেখ মুজিব যা বলেন, তাতে ভুট্টোকে দেয়া তার

৬. *ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউর* সংবাদদাতা হয়ে ল্যারী লিপৎসুলজ বাংলাদেশে আসেন। পুরো নাম লরেন্স লিপৎসুলজ

৭. ওরিয়ানা ফালাসি : *ইন্টারভিউ উইথ হিস্ট্রি* : পৃষ্ঠা -১৯৭

www.pathagar.com

প্রতিশ্রুতিরই সমর্থন মেলে। শেখ মুজিব এ্যান্থনি মাসকারেনহাসকে বলেন : "আপনার জন্য একটা দারুণ খবর আছে। এখানো কেউ জানে না খবরটি। আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে কোন না কোনভাবে সম্পর্ক রাখতে যাচ্ছি। যতক্ষণ না আর সবার সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলছি, তার আগে এরচেয়ে বেশি কিছু বলতে পারব না। দোহাই আল্লার! আমি বলার আগে কিছু লিখবেন না।"[৮] এ বিষয়ে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী[৯] আমাকে দেয়া এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে বলেন : "আমি বঙ্গবন্ধুর (শেখ মুজিব) কাছে এ নিয়ে প্রশ্ন রেখেছিলাম একবার। তিনি অস্বীকার করেছিলেন। বলেছিলেন, ভুট্টোকে তিনি এ ধরনের কোন কথা দেননি। আর ১৯৭৬ সালে জেদ্দায় আমার সঙ্গে ভুট্টোর দেখা হয়। আমি তখন সউদি আরবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত। ভুট্টো ওই সময় সউদি আরব সফরে যান। আমি ওরিয়ানা ফালাসিকে দেয়া তার সাক্ষাৎকারে তাকে দেয়া শেখ মুজিবের প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করে বলি যে, শেখ মুজিব আমাকে বলেছেন, তেমন কোন প্রতিশ্রুতি আপনাকে তিনি দেননি। ভুট্টো আমার কথায় বার বার জোর দিয়ে বলেন যে শেখ মুজিব তার কাছে ওয়াদা করেছিলেন। তিনি বলেন যে তিনি মিথ্যা বলছেন না।"

বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে পাকিস্তান ত্যাগের আগে শেখ মুজিব-ভুট্টোকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসেন যে পাকিস্তানের সঙ্গে তিনি বাংলাদেশের কাঠামোগত সম্পর্ক রাখবেন এবং লন্ডনের হোটেলে এ্যান্থনি মাসকারেনহাসকে সে সম্পর্কে আভাসও দেন কিন্তু লন্ডনের ওই হোটেলেই তৎকালীন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত বি কে নেহেরুর সঙ্গে আলাপের পর পরই যান বদলে এবং ঢাকা তেজগাঁ বিমান বন্দরে পৌঁছে ঘোষণা করেন, পাকিস্তানের সঙ্গে তিনি কোন সম্পর্কই রাখবেন না। অথচ এই তিনিই দিল্লী থেকে ভারতীয় বিমানে ঢাকায় আসতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। ওই সময় শেখ মুজিবের কাছে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে প্রস্তাব রাখা হয় যে যেহেতু ব্রিটেন বাংলাদেশকে এখনো স্বীকৃতি দেয়নি, সে কারণে দিল্লী থেকে ব্রিটিশ বিমানে করে তার ঢাকা যাওয়া সঙ্গত নয়। সে প্রেক্ষাপটে ভারতীয় বিমান বাহিনীর একটি বিশেষ বিমান প্রস্তুত রয়েছে তাকে ঢাকা পৌঁছে দেবার জন্য। শেখ মুজিব এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তার এ আচরণে মিসেস ইন্দিরা গান্ধী ক্ষুব্ধ হন। শেখ মুজিব ব্রিটিশ বিমান বাহিনীর বিশেষ বিমানেই ঢাকা আসেন।

শেখ মুজিবের এই দ্বৈত মানসিকতা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে ক্ষমতায় আরোহণের পর। অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারকৃত গোপন সাত দফা চুক্তি তিনি অগ্রাহ্য করলেও মাত্র দু'মাসের মধ্যে কার্যকর করেন প্যারামিলিশিয়া বাহিনীর ধারাটি। প্যারামিলিশিয়া বাহিনী গঠনের প্রস্তাবের মধ্যে 'র'-এর পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি অনবহিত ছিলেন, এ মেনে নেয়া যায় না। আর এই বাহিনীর সংগঠক মেজর জেনারেল এস এস উবান সম্পর্কে সম্যক ধারণা তিনি পেয়েওছিলেন। তার গোয়েন্দা দফতর তাকে সকল তথ্য সরবরাহ করে। তথাপি ভারতকে খুশি করার জন্য যেমন—তেমনি প্রতিপক্ষকে

৮. এ্যান্থনী মাসকারেনহাস : *বাংলাদেশ : এ লিগ্যাসি অব ব্লাড* : পৃষ্ঠা -৫

৯. প্রেসিডেন্ট এরশাদ শাসনামলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী

www.pathagar.com

নির্মূলের লক্ষ্যে রক্ষী বাহিনী গঠনের প্রস্তাব তিনি অনুমোদন করেন। আর মুজিব বাহিনীর দুই নেতা সিরাজুল আলম খান ও আবদুর রাজ্জাককে শেখ মুজিব অস্ত্র জমা দেয়ার ব্যাপারে যা বলেছিলেন, তাতে তার দ্বৈত মানসিকতা কেবল প্রতিভাত হয়ে ওঠে না, তার আধিপত্যকামী মনোভাবও স্পষ্ট ধরা পড়ে। ১৯৭২ সালে একদিকে তিনি সকল মুক্তিযোদ্ধাকে অস্ত্র জমা দেয়ার নির্দেশ দেন, অপরদিকে আবদুর রাজ্জাক ও সিরাজুল আলম খানকে অস্ত্র জমা দিতে বারণ করেন। শেখ মুজিবের ওই নিষেধ সম্পর্কে আবদুর রাজ্জাক বলেন : "সিরাজুল আলম খান আর আমাকে ডেকেই বঙ্গবন্ধু (শেখ মুজিব) বলেছিলেন সব অস্ত্র জমা দিও না। যেগুলো রাখার দরকার সেগুলো রেখে দাও। কারণ, সমাজ-বিপ্লব করতে হবে, প্রতিবিপ্লবীদের উৎখাত করতে হবে, সমাজতন্ত্রের দিকে এগোতে হবে। এটা আমাদের পরিষ্কারভাবে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন।"

কেবল অভ্যন্তরীণ রাজনীতিই নয়, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও শেখ মুজিবের দ্বৈত মানসিকতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে,—যা তাকে ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার কাছে বিরাগভাজন করে তোলে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের সাহায্য সহযোগিতার কথা অস্বীকার করার উপায় ছিল না বলেই ১৯৭২ সালে ১৭ মার্চে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ সফরে এলে শেখ মুজিব যে পঁচিশ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী-সহযোগিতা চুক্তি সাক্ষর করেন, যা ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্বাক্ষরিত ভারত-সোভিয়েত চুক্তিরই অনুরূপ, খুশি করে ভারতকে যেমন, রাশিয়াকেও তেমনি। কিন্তু এই চুক্তি শেখ মুজিবের স্ববিরোধী চরিত্রকে তুলে ধরে পশ্চিমা জগৎ বিশেষ করে মার্কিন প্রশাসনের কাছে। আবার মার্কিনিদের খুশি করার জন্য এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট (পরে প্রধানমন্ত্রী) জুলফিকার আলী ভুট্টোকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পালনের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালের শেষ দিকে লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম দেশসমূহের শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করে বিরাগভাজন হয়ে ওঠেন ভারতের। তার মন্ত্রিসভার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য তাজউদ্দীন আহমদ শীর্ষ সম্মেলনে শেখ মুজিবের অংশগ্রহণের ঘোর বিরোধিতা করে মন্ত্রিসভার বৈঠকে বলেন :"অন্যান্য দিকগুলো যদি আমরা ছেড়েও দিই, শুধুমাত্র এই কারণে তার লাহোর যাওয়া ঠিক হবে না যে পাকিস্তান এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে রাজি নয়।"[১০] শেখ মুজিব মার্কিনিদের খুশি করতে আরো এক পা এগোলেন। তার অবর্তমানে যিনি দীর্ঘ নমাস স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন দক্ষ হাতে, ২৫ মার্চের আগে যিনি ছিলেন তার সর্বক্ষণের অনুচর, সেই তাজউদ্দীন আহমদকে ১৯৭৪ সালের ২৬ অক্টোবর মন্ত্রিসভা থেকে অপসারিত করেন। অপসারণ করা হয় অত্যন্ত অবমাননাকরভাবে। ওইদিন বেলা ১১টায় শেখ মুজিব নিজ হাতে সই করে চিঠি পাঠান তাজউদ্দীন আহমদকে। তাতে তিনি তাকে 'বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে' মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করতে বলেন। চিঠি পাঠানোর পর তাড়াহুড়ো করে গণভবনে এক সংবাদ সম্মেলন ডাকা হয়। ওই সংবাদ সম্মেলনের বিবরণ আমরা শুনবো সাংবাদিক সুখরঞ্জন দাশগুপ্তের মুখ থেকে। তিনি সেটা এনেছেন

---

১০. সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত : *মিডনাইট ম্যাসাকার ইন ঢাকা*, পৃষ্ঠা ২১-২২

www.pathagar.com

তার *'মিডনাইট ম্যাসাকার ইন ঢাকা'* পুস্তকে : "ওইদিনের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। তাড়াহুড়ো করে নতুন গণভবনে সংবাদ সম্মেলন ডাকা হয়। মুজিব একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা দেবেন। পরিবেশ ছিল উত্তেজনাকর। ক্যাবিনেট সেক্রেটারি তওফিক ইমাম এবং কয়েকজন অফিসার ফাইল নিয়ে দৌড়ঝাঁপের মধ্যে ছিলেন। লিয়াঁজো অফিসার তোয়াব সাংবাদিকদের দেখ ভাল করছিলেন। মুজিব ভেতরে ঢুকলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গোয়েন্দা বিভাগ প্রধান তার সামনে গিয়ে দাঁড়ান। 'স্যার, তাজউদ্দীন সাহেব এখনো তার সমর্থকদের নিয়ে বসে আছেন এবং পদত্যাগ পত্রে সই করার ব্যাপারে সময় নিচ্ছেন,' তিনি প্রেসিডেন্টকে বললেন।

"মুজিব উচ্চকণ্ঠে আমাদের বললেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ আমি তাজউদ্দীনকে পদত্যাগ করতে বলেছি। যদি সে তা না করে তবে আমি তাকে আমার মন্ত্রিসভা থেকে তাড়াতাড়িই সরিয়ে দেব।' তিনি পাইপ থেকে ধোঁয়া ছাড়লেন এবং দেখলেন ফাইল হাতে ক্যাবিনেট সেক্রেটারি দরোজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। 'তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে কী করছো? তোমার হাতে কী ওটা?' তিনি তার প্রতি হুংকার ছাড়লেন।

" 'স্যার', মৃদুভাষী ইমাম সাহেব জবাব দিলেন, 'যে মুহূর্তে আমি তার বাসভবনে গিয়েছি তৎক্ষণাৎ অর্থমন্ত্রী পদত্যাগ পত্রে সই করেছেন। আমি আপনাকে সেটা দেখানোর জন্য অপেক্ষা করছি।"

"একটি হতবাক করা নৈঃশব্দ নেমে এলো। আমরা একে অপরের দিকে তাকালাম।"[১১]

তাজউদ্দীন আহমদ পদত্যাগ পত্রে সই করেন ওইদিন ২৬ অক্টোবর বেলা ১২টা ২২ মিনিটে।

শেখ মুজিব যাকে অসম্মানজনকভাবে পদত্যাগে বাধ্য করলেন তার প্রতি সেই তাজউদ্দীন আহমদের শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা সম্পর্কে সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত বলছেন: "আমার মনে পড়ে ১৯৭২ সালের সেই দিনগুলোর কথা। মুজিব সবেমাত্র ফিরেছেন। বঙ্গভবনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তার শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠান ছিল সেটা। তাজউদ্দীন সেখানে ছিলেন, সঙ্গে তার পরিবারবর্গও। আনন্দ-আভা ছড়িয়ে পড়েছে তার অবয়বে। সবার মধ্যে খুশির আমেজ। অনুষ্ঠান শেষে তিনি উপস্থিত ভারতীয় সাংবাদিকদের বললেন : 'এটা আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিন। নেতার অনুপস্থিতিতে আমি অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জাতিকে স্বাধীনতা অর্জনে পরিচালনা করেছি। সরকারের দায়িত্বভার তার হাতে অর্পণ করতে পারায় আমি এটাকে একটা বিরাট সুযোগ হিসেবে দেখছি। ইতিহাসে তা যতই তৎপর্যহীন হোক, আমার অন্তত একটা স্থান থাকবে।"[১২]

---

১১. সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত : *মিড় নাইট ম্যাসাকার ইন ঢাকা* : পৃষ্ঠা -২১-২২

১২. প্রাগুক্ত : পৃষ্ঠা-২২

www.pathagar.com

তাজউদ্দীনকে পদত্যাগ করতে মুজিবের লিখিত নির্দেশ

তাজউদ্দিন আহমদকে পদত্যাগ করতে শেখ মুজিবের নির্দেশ

প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা

২৬ অক্টোবর, ১৯৭৪

তাজউদ্দিন আহমদ,

য়র জাতীয় স্বার্থে আপনার মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত থাকা সমীচিন নয় বলে আমি মনে করি। আপনাকে আমি মন্ত্রীপদে ইস্তফা দেয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। এই সাথে আপনার স্বাক্ষরের · পদত্যাগপত্র পাঠানো হল।

ইতি

স্বাক্ষর

(শেখ মুজিবুর রহমান)

২৬/১০/৭৪

সময় : সকাল ১১ টা

ব তাজউদ্দিন আহমদ

এবং বন, মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয়

: দৈনিক *যায়যায়দিন প্রতিদিন*, ২৫ মার্চ, ১৯৯৯

www.pathagar.com

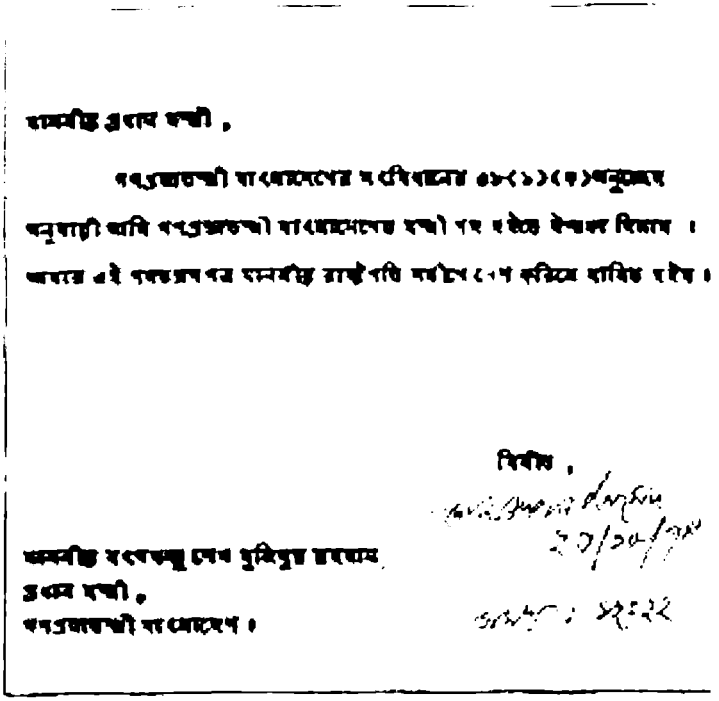

মুক্তিযুদ্ধ পাঠানো কাগজে সই দিয়ে তাজউদ্দীনের পদত্যাগপত্র

প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো
তাজউদ্দিন আহমদের
পদত্যাগপত্র

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৮ (১) (ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আমি গণপ্রজ বাংলাদেশের মন্ত্রীপদ হইতে ইস্তফা দিলাম। আমার এই পদত্যাগপত্র মাননীয় রাষ্ট্রপতি স পেশ করিলে বাধিত হইব।

বিনীত

মাননীয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
প্রধানমন্ত্রী,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

স্বাক্ষর
২৬/১০/৭৪
সময় ১২.২২

সূত্র : দৈনিক *যায়যায়দিন প্রতিদিন*, ২৫ মার্চ , ১৯৯৯

www.pathagar.com

এমন কী তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশে আসেন ২২ ঘণ্টার জন্য। সে সময় তার সম্মানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক ভোজের আয়োজন করে। কিন্তু তাজউদ্দীন আহমদকে আমন্ত্রণ জানানো হয় না। এহেন আচরণ তাকে ভয়ানক পীড়িত করে, ক্ষুব্ধ করে। *টাইমস অব ইন্ডিয়ার* ঢাকা সংবাদদাতা কিরিট ভৌমিক ও সুখরঞ্জন দাশগুপ্তকে তাজউদ্দিন আহমেদ বলেন : "আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং ঢাকার মার্কিন দূতাবাস কিসিঞ্জারের সম্মানে আলাদা আলাদাভাবে দুটো পার্টি দেয়। আমাকে বাদে সংসদের আর সব সদস্যকে আমন্ত্রণ জানানো হয়।" তিনি আমাদের বললেন আবেগে তার কণ্ঠস্বর কাঁপছিল, "আমি পরিত্যক্ত হওয়ায় মোটে অখুশী নই। কারণ, আমি ভালভাবে জানি যে, এই সেই কিসিঞ্জার যিনি পাকিস্তানকে সাহায্য ও সমর্থন করেছিলেন যখন কলকাতা থেকে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করছিলাম। যা হোক, একটিবার আমি কিসিঞ্জারের সঙ্গে দেখা করতে চাই তাকে মাত্র এই বলার জন্যে যে তাদের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ আজ মুক্ত।"[১৩]

তাজউদ্দীন আহমদকে ওই ভোজসভায় আমন্ত্রণ জানানো হয় না এই কারণে যে, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি অতিমাত্রায় ভারত ঘেঁষা। একই অভিযোগের কারণে মার্কিন চাপে মন্ত্রিসভা থেকে হন অপসারিত। তাকে সরিয়ে দেবার কারণ আরো রয়েছে। তা এখানে নয়।

শেখ মুজিবের এই দ্বৈত মানসিকতা অর্থাৎ সর্ব পক্ষকে খুশি রেখে চলার কৌশল, এতে সোভিয়েত ইউনিয়নও তার প্রতি বিরক্ত হয়ে ওঠে। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার প্রশ্নে সোভিয়েত ইউনিয়ন জানতে চায় জুলফিকার আলী ভুট্টোকে দেয়া শেখ মুজিবের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের মধ্যে কোন কাঠামোগত সম্পর্ক রাখা হচ্ছে কীনা। এর জবাব শেখ মুজিব নিজে লিখিতভাবে দেন। তাকে তিনি বলেন যে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের কোন কাঠামোগত সম্পর্ক রাখার কোনই সুযোগ নেই। এর পরই সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। এ সম্পর্কে হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী আমাকে বলেন : "প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান সোভিয়েত ইউনিয়নকে লিখিতভাবে জানান যে বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের কোন কাঠামোগত সম্পর্ক রাখার কোন সুযোগই নেই। প্রধানমন্ত্রীর ওই চিঠি আমি নিজ হাতে দিল্লীতে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতের হাতে দেই।" শেখ মুজিবের এই স্ববিরোধী চরিত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তার সম্পর্কে কতটা আস্থাহীন করে তোলে, তা আমরা জানতে পাব 'র'-এর পর্যবেক্ষণ থেকে। 'র'-এর সে পর্যবেক্ষণ কি ছিল? "... শেখ মুজিবুর রহমান দুই পরাশক্তির আস্থা হারিয়েছেন (সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) এবং ভারতেরও। তারা তাদের নিজস্ব লোক না পাওয়া পর্যন্ত তাকে ক্ষমতায় রাখছে। তার অস্থির নীতি তাকে বিশেষ কোন শক্তির প্রতি আসক্তিত না করায় তাকে ক্ষমতায় থাকতে সাহায্য করছে।" শেখ মুজিব 'র'-এর এই পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন।

---

১৩. *সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত : মিড নাইট ম্যাসাকার ইন ঢাকা:* পৃষ্ঠা -৩৩

www.pathagar.com

তার গোয়েন্দা বিভাগ তাকে জানিয়ে দেয়। তাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী যখন তাকে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকানো হচ্ছে বলে হুঁশিয়ার করে দেন, তা তিনি গায়ে মাখেন না। ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবকে দেয়া তার হুঁশিয়ারি সম্পর্কে মিসেস ইন্দ্রিরা গান্ধী ১৯৭৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রুটগার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপিকা মিসেস মেরী সি কাররাসকে সাক্ষাৎকার দানকালে বলেন : "আমি শুধু বলতে পারি, অনুগ্রহ করে সতর্ক হন। আমার মনে হচ্ছে মারাত্মক একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। তিনি (শেখ মুজিব) বললেন, না না, তারা আমার সন্তান।"[১৪] শেখ মুজিব যেহেতু 'র'-এর পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন, সে কারণে হয়তো মিসেস ইন্দিরা গান্ধীকেও আস্থায় আনতে পারছিলেন না। তাই ওই রকম একটি গাছাড়া জবাব দেন।

শেখ মুজিবের এই স্ববিরোধী রাজনৈতিক চরিত্রের কারণেই সিআইএ তার পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে আরম্ভ করে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে মন্ত্রিসভার ভেতর মোশতাক জোটকে সে পরিচর্যা শুরু করে, যাদের সঙ্গে তার সম্পর্কে গড়ে ওঠে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কলকাতায় মার্কিন কনসাল অফিসের মাধ্যমে। আর এর পাশাপাশি শেখ মুজিবের সমাজতন্ত্র, যার অপর নাম 'মুজিববাদ' জন্ম যার বামপন্থী ও মুজিব বিরোধীদের নির্মূলের লক্ষ্যে,—তার জবাবে 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' নামক এক চটকদারী স্লোগানকে হাতিয়ার করে মাঠে নামে। প্রক্রিয়াটা শুরু হয় ছাত্রলীগের ভাঙনের মধ্য দিয়ে।

স্বাধীন বাংলাদেশের বুকে ছাত্রলীগের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালের ২১, ২২ এবং ২৩ জুলাই। ছাত্রলীগের একটি গ্রুপ, যার নেতৃত্বে ছিলেন সিরাজুল আলম খান, সম্মেলন করে পল্টন ময়দানে। অপরটির সম্মেলন হয় রেসকোর্স ময়দানে। এর নেতৃত্বে ছিলেন শেখ ফজলুল হক মণি। দুই গ্রুপই শেখ মুজিবকে সম্মেলন উদ্বোধনের আমন্ত্রণ জানায়। শেখ মুজিব রেসকোর্সকেই বেছে নেন।

আবদুর রাজ্জাক বরাবরই সিরাজুল আলম খান ও শেখ ফজলুল হক মণির নেতৃত্বাভিলাষী দ্বন্দ্বের মাঝে দাঁড়িয়ে মুজিব বাহিনী ও ছাত্রলীগের পরস্পরবিরোধী দুই গ্রুপের ভেতর সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করে এসেছেন। এবার কোন দিকে যাবেন তিনি? কঠিন সমস্যা তার জন্যে। কেননা, দু'পক্ষের কাছেই সাদরে গ্রহণীয় রেসকোর্সকে বেছে নিলেন তিনি? আমরা তা আবদুর রাজ্জাকের মুখ থেকেই শুনি এবং তা সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আবদুর রাজ্জাক বলেন : "আমার কাছে খবর এল, কমরুদ্দিন আহমদ[১৫] বললেন, তিনি (সিরাজুল আলম খান) ট্রটস্কি লাইনের লোক। আর ট্রটস্কি লাইন সম্পর্কে আমার তো পরিষ্কার ধারণা আছে—এটা সিআইএ-'র লাইন, তখন আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম।" এও সত্য যে, পল্টন ময়দানে সিরাজুল আলম খান গ্রুপের সম্মেলনে মুজিব বাহিনীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যোগ দেয়। পল্টন সম্মেলনে মুজিব

১৪. জ্যোতি সেনগুপ্ত : *বাংলাদেশ ইন ব্লাড অ্যান্ড টিয়ার্স*, পৃষ্ঠা-৯১

১৫. প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত লেকক এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের অভ্যন্তরে সমাজতন্ত্র ও স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় আকাঙ্ক্ষী গ্রুপের তাত্ত্বিক গুরু।

www.pathagar.com

বাহিনীর বেশিরভাগ অংশ কেন গেল? আবদুর রাজ্জাককেই আবার স্মরণ করতে হয় : "তখন এমন অবস্থা হয়েছে, যুদ্ধ ফেরতা তরুণদের রক্ত টগবগ করছে। আর সেভাবে তো বিপ্লবী সরকার হয়নি—একটা সাধারণ পার্লামেন্টারি সরকার। সেখানেও কিছু গোলমাল শুরু হয়েছে। তখন ওই ছেলেদেরকে বোঝানো সহজ হয়েছে যে, এদেরকে দিয়ে হবে না। ছেলেরা কিন্তু অত্যন্ত সাচ্চা মনে সমাজতন্ত্র করার জন্য, সমাজবিপ্লব করার জন্য তৈরি হয়েছিল।"

পল্টন ময়দানে সিরাজুল আলম খান গ্রুপের সম্মেলন শেষ হলো বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়দীপ্ত স্লোগানের মধ্য দিয়ে এবং এই সম্মেলন থেকেই জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হলো। ওই বছর ৩১ অক্টোবর আহবায়ক কমিটি গঠিত হলো জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল তৈরির চূড়ান্ত রূপরেখা প্রণয়নের লক্ষ্যে।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের আত্মপ্রকাশে বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক নতুন ঝোঁকের জন্ম হলো। এর পতাকা তলে এসে জড় হলো বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী সৎ এবং দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধারা। যখন কেউ শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি উচ্চারণে সাহসী হচ্ছিল না, তখন এরাই সর্বপ্রথম তার বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ হল। স্বাভাবিক কারণেই এরা দ্রুত জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করে এবং জনগণের কাছাকাছি চলে যায়। দলের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের শ্লোগানে আকৃষ্ট হয় এদেশের হাজার হাজার সৎ দেশপ্রেমিক তরুণ। অন্তরাল থেকে এদের সততা এবং দেশপ্রেমকে ব্যবহারের পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নেমে যায় সিআইএ এবং নিজস্ব লক্ষ্য সিদ্ধির পথে পা বাড়ায়। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা সৃষ্ট রক্ষী বাহিনী মোকাবিলায় গড়ে তোলে গণবাহিনী।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, এর বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের শ্লোগান এবং তার গণবাহিনী সৃষ্টির পেছনের কথকতা নিয়ে অনেক কথা। বলা হয়েছে ওই সময় এবং বলা হয় পরবর্তীকালে এ দল তৈরির পেছনে বিদেশী শক্তির অদৃশ্য হস্ত ছিল সক্রিয়। বলা হয়, সিআইএ ছিল এ দল তৈরির প্রক্রিয়ায় এবং এর কার্যক্রমের সাথে যুক্ত। অথচ তথ্য প্রমাণসহ সিআইএ-'র সংযোগের বিষয়টি তুলে ধরতে পারেননি কেউই। ফলে এটা রয়ে যায় বিতর্কিত। আমরা এ ব্যাপারে পরে আসছি। তার আগে দেখা যাক তোফায়েল আহমদ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল সৃষ্টি সম্পর্কে কি বলেন। আমাকে দেয়া ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন : "তারা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের সঙ্গে নিজেদেরকে যুক্ত করে। সেই পিটার কাসটার্সের কথা কে না জানে? পিটার কাসটার্স নিজে বলেছে আমি জাসদকে (জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল) সাহায্য করেছি। হল্যান্ডের লোক এই পিটার কাসটার্স—কে তিনি? এগুলো আপনারা জানেন। জানেন কার সাথে কোন সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল।" আর এ সম্পর্কে আবদুর রাজ্জাকের ভাষ্য আমরাতো আগেই দেখেছি।

তোফায়েল আহমদের বক্তব্য অনুসরণ করে আমরা পিটার কাসটার্স-এর কথকতায় আসতে পারি। সে কথকতাই স্পষ্টভাবে বলে দেবে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক

www.pathagar.com

দল সৃষ্টি এবং এর নেতা সিরাজুল আলম খান ও কর্নেল তাহেরের নভেম্বর বিপ্লবের অন্তরালের কাহিনী, যার পুরোটা রহস্যঘন উপন্যাসকেও হার মানায়। সে পুরো কাহিনীতে আমরা যাব না। অংশ বিশেষ দেখবো।

১৯৭৬ সালের ২২ সেপ্টেম্বর সকালে সারা বাংলাদেশের মানুষ সকল দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত একটি খবরে চমকে ওঠে। খবরটি দুর্দান্ত রকমে নাড়িয়ে দেয় ইউরোপীয় দেশ হল্যান্ডকে। উদ্বেগের মধ্যে ফেলে মার্কিন প্রশাসন এবং তার গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএকে। খবরটিতে বলা হয়, সরকার উৎখাত ষড়যন্ত্র মামলায় একজন বিদেশীসহ সাতজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। স্বাধীনতা পূর্ব এবং উত্তরকালে এদেশে সরকার উৎখাত ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত কোন বিদেশীর সম্ভবত ওই প্রথম কারাদণ্ড প্রদান। অতএব, বাংলাদেশের মানুষের চমকাবারই কথা। ওই বিদেশী, নাম পিটার কাসটার্স, পুরো নাম পিটার জোসেফ জোয়ান মারিয়া কাসটার্স, হল্যান্ডের অধিবাসী বটে, কিন্তু ঢাকায় উড়ে আসেন সরাসরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন থেকে, বাংলাদেশের বুকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে। বাংলাদেশে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চিন্তা ভাবনার উদয় তার মস্তিষ্কে ঘটে ১৯৭১ সালে ওয়াশিংটনে জন হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে। টেলিভিশনের পর্দায় বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গণহত্যার ছবি দেখে তার কোমল হৃদয় কেঁদে ওঠে এবং এদেশের হতভাগা আদম সন্তানদের দুঃখ-কষ্ট নিরসনের প্রশ্নে রীতিমত উদভ্রান্ত হয়ে পড়েন। দুঃখ-দুর্দশা নিরসনের উপায়ও আবিষ্কার করে ফেলতে তার দেরি হয় না। তার সে আবিষ্কার "বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র"। অবশ্যি তার আগে আরেকজন বাংলাদেশে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় 'মন প্রাণ' ঢেলে কাজ করছিলেন। তিনি ল্যারি লিপৎসুলজ— *ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ*'র তৎকালীন ঢাকা প্রতিনিধি।

ল্যারি লিপৎসুলজকে ১৯৭৬ সালের জুলাই মাসে অবাঞ্ছিত বিদেশী ঘোষণা করে বাংলাদেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়। ওই মাসে ঢাকা কেন্দ্রীয় জেল অভ্যন্তরে রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল আবু তাহেরের বিচার কাজ চলছিল। সে সময় ল্যারি লিপৎসুলজকে সাংবাদিকের দায়িত্ব বহির্ভূত কার্যকলাপে লিপ্ত হতে দেখা যায়। জেলখানার সম্মুখে গিয়ে তিনি জেলখানার বহিরঙ্গ ও জেলখানার ভেতরে প্রবেশকারি প্রতিটি ব্যক্তির ছবি তুলতে থাকেন। ইতোমধ্যে পিটার কাসটার্সের সঙ্গে তার যোগাযোগের বিষয়টিও বাংলাদেশ সরকার জেনে যায়। সুতরাং তার বহিষ্কার অনিবার্য হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশ থেকে ল্যারি লিপৎসুলজের বহিষ্কার ও অবাঞ্ছিত ঘোষণার ঘটনাটি দারুণ চমকপ্রদ। ওই সময় জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই) মহাপরিচালক ছিলেন এবিএস সফদার। জেলখানার সমানে দাঁড়িয়ে লিপৎসুলজের ছবি তোলার ব্যাপারটি তাকে উৎকণ্ঠিত করে তোলে। এ ঘটনা যদি কোন বাংলাদেশী ঘটাতো তবে তাকে আটক করা হতো। লিপৎসুলজ যেহেতু বিদেশী এবং একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পত্রিকার সাংবাদিক সেহেতু তাকে আটক করায় কিংবা ডেকে

www.pathagar.com

এনে জিজ্ঞাসাবাদে বিদেশী প্রচার মাধ্যমে হইচই পড়ে যাবে। বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি হবে সরকারের জন্য। কিন্তু তাই বলে একজন বিদেশীকে সাংবাদিকতার নামে এই ধরনের আইন বিরুদ্ধ কাজ করতে দেয়া যায় না। বিষয়টি দেখার এবং সামাল দেয়ার জন্য তিনি তার সংস্থার অন্যতম পরিচালক এ এফ জহিরুন্নবীর ওপর দায়িত্ব অর্পণ করেন। বলেন, নিজের পরিচয় দিয়ে তাকে কোন এক হোটেলে ডিনারের আমন্ত্রণ জানাতে হবে। বলতে হবে, তিনি যা করছেন তা আইন বিরুদ্ধ। তিনি এ ধরনের কাজ করা থেকে বিরত না হলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। সেই মতো এ এফ জহিরুন্নবী তাকে হোটেল পূর্বাণীতে ডিনারে আমন্ত্রণ জানান। ইতোমধ্যে এনএসআই কর্তৃপক্ষ লিপৎসুলজের কার্যকলাপ সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জ্ঞাত করে এবং তার ওপর কড়া নজর রাখতে বলা হয়।

এনএসআই'র হুশিয়ারী পাবার পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অতিমাত্রায় তৎপর হয়ে ওঠে। তাদের তৎপরতা দেখে হতবাক হয়ে যান এ বি এস সফদার এবং এ এফ জহিরুন্নবী।

আমন্ত্রণ রক্ষার্থে ল্যারি লিপৎসুলজের স্কুটার সন্ধ্যায় হোটেল পূর্বাণীর প্রবেশদ্বারে যেই মাত্র ঢুকতে যাচ্ছে সেই মুহূর্তে একটি জীপ এগিয়ে এসে সেটার পথরোধ করে দাঁড়িয়ে পড়ে। এবং দুদ্দাড় নেমে পড়ে কয়েকজন সাদা পোশাকধারী এবং চোখের পলকে তাকে পাঁজা কোলা করে জীপে তুলে হাওয়া হয়ে যায়। এ এফ জহিরুন্নবী প্রবেশদ্বারের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য। ঘটনার আকস্মিকতায় তিনি বোবা বনে যান।

আসলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও সতর্ক ছিল লিপৎসুলজ সম্পর্কে। গোয়েন্দা বিভাগের কড়া নজর ছিল তার ওপর। এনএসআই'র হুশিয়ারী পাওয়ায় তারা সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় তাকে বহিষ্কারের। কারণ এমনিতেই তখন কর্নেল তাহেরের বিচার কার্য তাদেরকে ব্যতিব্যস্ত রেখেছিল। দেশে এ ঘটনার কী প্রতিক্রিয়া হয় এনিয়ে তারা ছিল উৎকণ্ঠার মধ্যে। এর সাথে লিপৎসুলজের কার্যকলাপ আরেক সমস্যার জন্ম দেবে না, তাই-ই বা কে বলতে পারে। এই উটকো ঝামেলা যত তাড়াতাড়ি বিদায় করা যায় ততই মঙ্গল। সুতরাং এনএসআই-এর অজান্তে তারা লিপৎসুলজকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয় এবং সাদা পোশাকধারী পুলিশ পাঠিয়ে জিপে করে তুলে আনে। পরদিনই তাকে ব্যাংককগামী বিমানে চড়িয়ে দেয়া হয়।

ল্যারি লিপৎসুলজ শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ডের ওপর সিআইএ-র অদৃশ্য হস্তের ভূমিকা নিয়ে লেখেন *'দ্যা আনফিনিশড রেভুলিউশন'* নামে একটি বই। বইটি এদেশে দারুণ সাড়া জাগায়। তাতে তিনি নিজেকে সিআইএ বিরোধী হিসাবে প্রতিপন্ন করার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছেন।

পিটার কাসটার্সের সঙ্গে ল্যারি লিপৎসুলজ, সিরাজুল আলম খান, লেফটেন্যান্ট কর্নেল আবু তাহের এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের তাত্ত্বিক গুরু ডক্টর আখলাকুর রহমানের যোগাযোগের বিষয়টি আমরা কাসটার্সের মুখ থেকেই শুনবো ধরা পড়ার পর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দেয়া তার জবানবন্দি থেকে। তার আগে ১৯৭৬ সালের ২২ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের দৈনিক খবরের কাগজগুলোয় প্রকাশিত তার বিরুদ্ধে আনীত

www.pathagar.com

মামলা ও রায়ের বিবরণ তুলে ধরা হচ্ছে : "দুই নম্বর বিশেষ সামরিক আদালত হল্যান্ডের নাগরিক পিটার কাসটার্সসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মামলার রায় ঘোষণা করেছেন।

"পিটার কাসটার্সসহ সাতজনকে ১৪ বছর কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। আদালত অন্য সাতজনকে তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। অভিযুক্তরা হলেন পিটার কাসটার্স ওরফে পি জে জে এম কাসটার্স ওরফে রেভোকন্টি ওরফে আমিনুল ইসলাম ওরফে আনোয়ার সিদ্দিকী ওরফে রফিকুল ইসলাম; জামাল উদ্দীন ওরফে হামিদ ওরফে নজরুল ইসলাম ওরফে খসরু ওরফে আবদুল হামিদ, তাহমিনা বেগম ওরফে সুফিয়া খাতুন, আবদুল জলিল হাওলাদার ওরফে মাসুদ কবির, মোহাম্মদ হানিফ ওরফে সামাদ, খোরশেদ আহমদ ওরফে সাজু মিয়া এবং আবদুল গোফরান ওরফে রাজু আহমদ।

"আদালত বাংলাদেশ ব্যবহারিক শিক্ষার নামে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের ১,৯৬,৬৫৬.৪৮ পয়সা বাজেয়াপ্তেরও আদেশ দিয়েছেন।

"৮-১২-৭৫ তারিখে পিটার কাসটার্সকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দেয়া এক স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে তিনি স্বীকার করেন যে, তিনি বাংলাদেশে আসেন সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে সরকার উৎখাত করে "বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র" প্রতিষ্ঠার জন্য। বাংলাদেশ বিপিসি'র ১২১ এ ধারার অধীনে তার এবং সহঅভিযুক্তদের বিরুদ্ধে একটি নির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়।

"পিটার কাসটার্স বাংলাদেশে আসেন ১৯৭৩ সালে। তিনি নিজেকে একজন ফ্রিল্যান্স রিলিফ কর্মী পরিচয় দেন বাংলাদেশে অবস্থানকালে। তিনি অধুনালুপ্ত[১৬] জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) ও তথাকথিত গণবাহিনীর নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তার ভাষায় 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে সরকার উৎখাতের উদ্দেশ্যে কর্মী জোগাড়ের জন্য তিনি অধুনালুপ্ত জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের নেতা প্রয়াত লে. কর্নেল (অবসরপ্রাপ্ত) আবু তাহের এবং তার কিছু সহযোগী ও অন্যদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেন।

"তিনি 'সর্বহারা ঐক্য আন্দোলন' নামে গোপন রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। তার সর্বোচ্চ কেন্দ্রীয় পরিষদের নাম দেয়া হয় "কেন্দ্রীয় বিকাশ গ্রুপ"। তার পরিকল্পিত বিপ্লবের সাফল্যের জন্য তিনি প্রয়াত সিরাজ শিকদারের 'সর্বহারা পার্টি'র সঙ্গে জাসদের (জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল) গণবাহিনীর ঐক্য সাধনের প্রচেষ্টা নেন। কাসটার্স ও তার সহযোগীরা তাদের লক্ষ্য সাধনে রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকর লিফলেট ও বুকলেট ছাপান এবং বিলি করেন। সংগঠনের অফিস ও সদস্যদের থাকার জন্য তিনি শহরে তিনটি বাড়ি ভাড়া করেন এবং বিভিন্ন তারিখে সদস্যদের সঙ্গে তিনি সেখানে গোপন বৈঠক করেন। বিভিন্ন সর্বহারা গ্রুপকে অস্ত্র চালনা প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদেরকে 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের' কৌশল ও ধ্যান ধারণায় উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে

১৬. ওই সময় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।

www.pathagar.com

ঐক্যবদ্ধ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি রংপুর, চট্টগ্রাম ও ঢাকার বিভিন্ন এলাকাসহ বাংলাদেশের অন্যান্য জেলা সফর করেন এবং 'বাংলাদেশ ব্যবহারিক শিক্ষা সংস্থা' নামের সমাজ সেবামূলক সংগঠনের আড়ালে কর্মী সংগ্রহ ও তাদেরকে অস্ত্র চালনা প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে সারা বাংলাদেশে সশস্ত্র ক্যাডার সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। বিপ্লবী গ্রুপের সদস্যরা (কেন্দ্রীয় বিকাশ গ্রুপ) সকলেই ছদ্মনাম গ্রহণ করে এবং গোপন কার্যকলাপ চালাবার সুবিধার্থে ভাড়াকৃত বাড়িগুলিরও ছদ্মনাম দেয়া হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'সবুজদের বাড়ি' 'শাপলা' এবং 'পেয়ারাবাগ',—এই ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়। কাসটার্স নিজেই আমিনুল ইসলাম ও রফিকুল ইসলাম ছদ্মনাম ব্যবহার করেন।

"কাসটার্স বাংলাদেশে কর্মরত বিভিন্ন বিদেশী স্বেচ্ছাসেবকমূলক সংগঠন থেকে কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের নাম করে অর্থ সংগ্রহ করতেন এবং ওই অর্থ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের কিছু নেতাকে প্রদান করেন এবং নিজের সামগ্রিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ব্যবহার করেন। তিনি তার দলের লোকদের দেশের অভ্যন্তর থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহের পরামর্শ দেন এবং নিজের বৈদেশিক সূত্র থেকে অস্ত্র সংগ্রহের আশ্বাস দেন।

"তদন্তকালে প্রতিভাত হয় যে নিজের গোপন সংগঠনের কাজের জন্য ১৯৭৩ সালের বিভিন্ন সময়ে পিটার কাসটার্স অন্য অভিযুক্তদের সংগ্রহ করেন।"[১৭]

পিটার কাসটার্সের ওপর এই একটিমাত্র সংবাদই বের হয় বাংলাদেশের সংবাদপত্রে। মামলার রায় বের হবার পরের দিনই তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার এবং তাকে তার স্বদেশ হল্যান্ডে পাঠিয়ে দিতে হয়। অথচ তৎকালীন সরকার এ খবরটি চেপে যায়। অন্যদিকে পিটার কাসটার্সের গ্রেফতার ও তার বিচার শুরু হবার প্রথম খবরটিও জানতে পায় না বাংলাদেশের মানুষ।

পিটার কাসটার্সের গ্রেফতার ও বিচার সংক্রান্ত প্রথম খবরটি ছাপা হয় বিদেশী পত্রিকায়-মার্কিন দৈনিক *'নিউইয়র্ক টাইমসে'*, ১৯৭৬ সালের ২৪ আগস্ট। খবরে বলা হয়, "বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে হল্যান্ডের সাংবাদিক পিটার কাসটার্সকে সামরিক আদালতে বিচার করা হবে।" খবরে পিটার কাসটার্সের সঙ্গে আর কতজন অভিযুক্ত হয়েছে, তা উল্লেখ করা হয় না। তাছাড়া খবরে তাকে 'সাংবাদিক' হিসাবে উল্লেখ করা হয়। অথচ বাংলাদেশে তিনি 'ফ্রিল্যান্স রিলিফ কর্মী'র পরিচয় দেন। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে লক্ষ্য করার দাবি রাখে। *'নিউইয়র্ক টাইমস'*-এ অভিযুক্তদের সংখ্যা উল্লেখ করে খবর করা হয় তিনদিন পর, ২৭ আগস্ট, ১৯৭৬-এ। খবরে পিটার কাসটার্সের সঙ্গে আরো যাদের বিচার হচ্ছে তাদের সংখ্যা ষোল বলা হয়।

সামরিক আইনে পিটার কাসটার্সের বিচারের সংবাদে অস্বস্তিতে পড়ে তৎকালীন মার্কিন প্রশাসন। সিআইএ পড়ে বিপাকে। বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়ে হল্যান্ড

---

১৭. *দ্য বাংলাদেশ অবজারভার*, ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬

www.pathagar.com

সরকার। ৬ দিন পর মার্কিন প্রশাসন ও হল্যান্ড সরকারের উদ্বেগ নিরসনে ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাস বলে : 'পিটার কাসটার্স' যুক্তিসঙ্গত ও পক্ষপাতহীন বিচার পাবেন। বাংলাদেশ দূতাবাসের এই বক্তব্য *নিউইয়র্ক টাইমসে* প্রকাশিত হয় ২৯ আগস্ট, ১৯৭৬-এ।

পিটার কাসটার্সের দণ্ডাদেশের খবর বের হয় ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬-এ। আর আমাদের এখানকার পত্রিকায় ছাপা হয় একদিন আগে অর্থাৎ ১৯৭৬ সালের ২২ সেপ্টেম্বর। *নিউইয়র্ক টাইমস*-এর ওই খবরে বলা হয়, গোপন সামরিক আদালত পিটার কাসটার্সকে উৎখাত ষড়যন্ত্রের অভিযোগে বাংলাদেশে চৌদ্দ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে ৬ জন বাংলাদেশী প্রত্যেককে চৌদ্দ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত এবং সাতজন অভিযুক্তকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। খবরে আরো বলা হয়, হল্যান্ড সরকার পিটার কাসটার্সকে হল্যান্ডে ফেরত পাঠানোর জন্য বাংলাদেশ সরকারকে সম্মত করানোর চেষ্টা চালাচ্ছে।

নিউইয়র্ক টাইমস-এ পিটার কাসটার্স সংক্রান্ত সর্বশেষ খবরটি ছাপা হয় ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬-এ। খবরে বলা হয় পিটার কাসটার্সকে হল্যান্ডে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। এ খবরটি বাংলাদেশের পত্রিকায় আসে না। জানানো হয় না কাগজকে।

বিচারের রায় ঘোষণার পরদিনই যাকে স্বদেশ হল্যান্ডে পাঠিয়ে দেয় বাংলাদেশ সরকার, সেই পিটার কাসটার্স 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বৈপ্লবিক' কর্মকাণ্ডের কথা এবার আমরা তার নিজের মুখ থেকেই শুনব।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, পিটার কাসটার্স গ্রেফতার হন ৮ ডিসেম্বর, ১৯৭৫ সালে। গ্রেফতারের পর জবানবন্দি দেবার আগে তাকে রাখা হয় ঢাকার অভিজাত এলাকার একটি দোতলা বাড়ির ছাদের ওপর একটি কক্ষে। একটি মাত্র কক্ষই ছিল ছাদের ওপর। বন্দিদশা থেকে পলায়নের চেষ্টায় তিনি দোতলা ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়েন। হিসেবে ভুল হওয়ায় সীমানা প্রাচীরের বাইরে না পড়ে ভেতরে পড়েন। সতর্ক প্রহরী তাকে সঙ্গে সঙ্গে জাপটে ধরে। এবং প্রহরী তৎক্ষণাৎ খবর পাঠায় তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে। কর্মকর্তা, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার তৎকালীন প্রধান এ বি এস সফদার এবং তার সহকর্মী এ এফ জহিরুন্নবী ছুটে আসেন সেই বাড়িতে। অপার বিস্ময়ে তারা দেখতে থাকেন কাসটার্সকে। কারণ, অত উঁচু থেকে লাফিয়ে পড়ায় তার হাত-পা ভেঙ্গে যাবার কথা। কিন্তু একটু-আধটু ছড়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই হয়নি তার। তাদের বিস্ময় অপনোদনের জন্য পিটার কাসটার্স যা বলেন এতে এ বি এস সফদার ও এ এফ জহিরুন্নবী একেবারে থ বনে যান। কাসটার্স বলেন : "আমি তো পিটি করতাম।" অর্থাৎ কমান্ডো ট্রেনিং ছিল তার। এ এফ জাহিরুন্নবী ছিলেন পিটার কাসটার্স রহস্য উদঘাটনে মূল নায়ক। তিনিই তাকে পাকড়াও করেন।

এ ঘটনার প্রায় তিনমাস পর জবানবন্দি দেন পিটার কাসটার্স। জবানবন্দি গ্রহণ করেন ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট এ আর মজুমদার; ১৯৭৬ সালের মার্চ মাসের ৯ তারিখে।

www.pathagar.com

ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দেওয়া পিটার কাসটার্সের জবানবন্দি : "আমার নাম পিটার জোসেফ জোয়ান মারিয়া ওরফে পিটার কাসটার্স। আমার বয়স অনুমান ২৭ বৎসর। আমি লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯৭০ সনে আন্তর্জাতিক আইনে এম এ পাশ করি এবং ঐ বৎসর ওয়াশিংটন জন হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট নেওয়ার জন্য ভর্তি হই (আন্তর্জাতিক রিলেশনে)। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি চাইনিজ, রাশিয়ান এবং ইউরোপীয় ভাষা শিক্ষা করি। এছাড়াও আমি নিজে হিন্দি এবং বাংলায় লেখাপড়া এবং বলা শিক্ষা করি। আরবি এবং উর্দু ভাষাও কিছু কিছু শিক্ষা করি। দেশে থাকাকালীন আমি ডাচ, ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ল্যাটিন, গ্রিক ও স্পানিশ ভাষাও শিখিয়াছি। ১৯৭০ সনে ওয়াশিংটনে যাওয়ার পূর্বে আমি বেলজিয়াম, রাশিয়া, পূর্ব এবং পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়াছি। ওয়াশিংটনে থাকাকালীন এশিয়ার বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, এবং সামাজিক ইতিহাস ও ভাবধারা সম্পর্কে পড়াশুনা করি। তখন আমার মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও মাওবাদের উপর বিশ্বাস জন্মে এবং আমি সেই লাইনে কাজ করার মনস্থ করি। ১৯৭১ সনে ওয়াশিংটনে থাকার সময় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের উপর লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এবং টেলিভিশনে জেনোসাইডের প্রমাণ্য ছবি দেখিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করিতে থাকি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি মাসের ২৫ তারিখে ঢাকা পৌঁছি।"

জবানবন্দি অনুযায়ী পিটার কাসটার্স ওইবার জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের নেতা মেজর জলিল ও আ স ম আবদুর রবের সঙ্গে দেখা করেন। ওই বছর এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে ফিরে যান ওয়াশিংটনে পিএইচডি'র থিসিস জমা দিতে এবং ডক্টরেট লাভ করেন। এরপর ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ফিরে আসেন ঢাকায় 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। বাংলাদেশে আসেন তিনি স্বেচ্ছাসেবী রিলিফ কর্মী পরিচয়ে। আসার কিছুদিন পর শুরু করেন ফ্রি-ল্যান্স সাংবাদিকতা। ইংরেজি সাপ্তাহিক *দ্য হলিডে*তে 'আনোয়ার সিদ্দিকী' নাম নিয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ওপর লেখা শুরু করেন। এই ছদ্ম পরিচয়ের আড়ালে তিনি 'র'-সৃষ্ট রক্ষী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার প্রস্তুতিতে নামেন। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দরের নেতা লেফটেন্যান্ট কর্নেল আবু তাহের, সিরাজুল আলম খান ও দলের তাত্ত্বিক গুরু ডক্টর আখলাকুর রহমানকে তার 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' মতবাদের অনুসারী দেখতে পান এবং রক্ষী বাহিনীর মোকবিলায় "গণবাহিনী" তৈরির পরিকল্পনা নেন। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, সর্বহারা পার্টি ও অন্যান্য দলের সঙ্গে তার যোগসাজশের বিবরণ ম্যাজিস্ট্রেট এ আর মজুমদারের কাছে দেওয়া জবানবন্দিতে তিনি উল্লেখ করেন : "১৯৭৩ সনের ২৫শে জানুয়ারি তারিখে আমি পুনরায় ঢাকায় আসি।...বামপন্থী জাসদ (জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল) মস্কোপন্থী ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে আমার বিশেষভাবে আলাপ-আলোচনা হয়। তাহারা তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের কার্যকলাপের নিন্দা করে। ঢাকায় থাকাকালীন জাসদ নেতা মেজর জলির, আ স ম আবদুর রব, মমতাজ বেগম প্রমুখ নেতৃবৃন্দের

www.pathagar.com

সহিত রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা হয়। ইহা ছাড়া মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে দেশের সম্পদ জাতীয়করণ সম্পর্ক আলাপ-আলোচনা করি।

"ইহার পর এপ্রিল মাসের ৭ কি ৮ তারিখে আমি কলকাতা-দিল্লী হইয়া ওয়াশিংটনে যাই। ... ওয়াশিংটনে যাইয়া আমি বাংলাদেশের অবস্থা সম্বন্ধে আমার মতাদর্শে বিশ্বাসী বন্ধু ও কমরেডদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করি। ... তাহারা মন্তব্য করেন যে এখন বাংলাদেশে মার্কস বা লেনিনবাদ প্রয়োগের ক্ষেত্র প্রস্তুত এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সহজতর হইবে।

"১৯৭৩ সনের সেপ্টেম্বর মাসে আমি পুনরায় ঢাকায় আসি। ইহার পূর্বে হল্যান্ডে থাকাকালীন আমার রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজন আমাকে বাংলাদেশে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকল্পে সশস্ত্র বিপ্লব সংগঠনের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

"... আমেরিকার সাংবাদিক ল্যারি লিপৎসুলজের সঙ্গে আমার ঢাকায় পরিচয় হয়। তাহাকে আমার চিন্তাধারায় সমগোত্রীয় হিসেবে চিনিতে পারিয়া তাহার নিকট আমার প্লান-প্রোগ্রাম সম্পর্কে বলি। তাহার নিকট হইতে লেফটেন্যান্ট কর্নেল তাহের সাহেবের চিন্তাধারা সম্পর্কে অবগত হইয়া তাহার নির্দেশমত ১৯৭৪ সালের জুলাই মাসে তাহের সাহেবের নারায়ণগঞ্জের বাসায় যাইয়া তাহাকে না পাইয়া ক্যান্টনমেন্ট সিএমএইচ-এ অসুস্থ অবস্থায় তাহার সহিত দেখা করি। তাহাকে আমি আমেরিকান সাংবাদিক ল্যারির কথা বলি।"

"১৯৭৪ সালের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি মমতাজউদ্দীন খান ঢাকা আসিলে তাহাকে সঙ্গে নিয়া ড. আখলাকুর রহমান সাহেবের বাসায় যাই। ইহার ২/৩ দিন পর মমতাজউদ্দীন আমাকে নিয়া সিরাজুল আলম খানের বাসায় যান। সিরাজুল আলম খান মত প্রকাশ করেন যে, কৃষকদের মনে ঘৃণার সৃষ্টি করিতে হইবে এবং এই লাইনে কাজ করিলে তাহার দল জাসদ পার্টি সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত আছে।"

"১৯৭৪ সালের সম্ভবত ২৮ নভেম্বর তারিখে অনুমান বেলা ১টার সময় আমি সিরাজুল আলম খানের বাসায় পুনরায় যাই। সেখানে তাহার সঙ্গে জাসদ দলের খসড়া থিসিস এবং সিরাজ শিকদার সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা হয়।"

"ইহার পর কয়েকবার কর্নেল তাহেরের সঙ্গে আমার দেখা এবং আলাপ হয়। তিনি আর্ম ক্যাডার সৃষ্টির জন্য ক্যাডারদের সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন এবং সেজন্য তাহাকে ৫০,০০০ ডলার দিতে হইবে বলিয়া দাবি করেন। পরবর্তী পর্যায়ে আমি কর্নেল তাহেরকে আমার মিশনে সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন সময়ে বাহার এবং আনোয়ারের মাধ্যমে তাহাকে মোট ৬০,০০০/- টাকা দেই।

"কর্নেল তাহের সর্বহারা পার্টির লোকদের সঙ্গে দেখা করিতে চাহিলে ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসের কোন এক রবিবারে জলিলকে সঙ্গে লইয়া তাহের সাহেবের বাসায় যাই। তাহের সাহেব জলিলের নিকট হইতে ক্যাপটেন আলতাবের বিষয় জানিতে চাহিলে জলিল তাহাকে বলে যে, আলতাব সাহেব সুন্দরবন এলাকায় আছেন

www.pathagar.com

এবং তাহার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব নহে। কর্নেল তাহের রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা করেন। পরে আমরা চলিয়া আসি।...

"কর্নেল তাহের সাহেবকে আমি পূর্বে যে ৬০,০০০/- টাকা প্রদান করি তাহা রক্ষী বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণের জন্য এবং রাজনৈতিক প্রচারণার জন্য ব্যবহৃত হইবে বলিয়া প্রফেসর আনোয়ার আমাকে জানান।...

"১৯৭৫ সালের মার্চ মাসের মাঝামাঝি আমি ড. আখলাকুর রহমান সাহেবের সঙ্গে তাহার মোহাম্মদপুরের বাসায় দেখা করি। আমাকে জানান যে কর্নেল তাহেরকে আমি যে টাকা দিয়াছি তাহা তিনি শুনিয়াছেন। তিনি আমাকে বিদেশ হইতে অস্ত্র আনার ব্যবস্থা করিতে বলেন যাহাতে ১০ বৎসরের মধ্যে বিপ্লব সংগঠন করা যায়।...

"ড. আখলাকুর রহমানের গুলশানের বাড়ি দেখিয়া আমার ধারণা জন্মে তাহাদের গণঅভ্যুত্থান ব্যক্তিগত লাভ ও ক্ষমতা লাভের জন্য, জনগণের স্বার্থে নহে।...

"১৯৭৫ সালের ১৬ই আগস্ট সন্ধ্যার সময় এলিফ্যান্ট রোডে কর্নেল তাহেরের ভাই আবু ইউসুফের বাসায় কর্নেল তাহেরের সঙ্গে দেখা করি। তিনি প্রকাশ করেন যে, শীঘ্রই তাহার পক্ষে ক্ষমতা দখল করা সম্ভব হইবে।

"১৫ নভেম্বর তারিখ রাত ৮টার সময় বেলাল আর বাহার আমার ৫৩ নং এলিফ্যান্ট রোডের বাড়িতে আসে। তাহারা আমাকে রংপুর ক্যান্টের এবং কুমিল্লায় সৈনিক বিদ্রোহের সংবাদ দিয়া আমার মতামত জানিতে চায়। আমি সম্পূর্ণ সংবাদ না পাইয়া কোন মতামত ব্যক্ত করা সম্ভব নয় বলিয়া জানাই। তবে আমি ইহাও বলিয়াছিলাম যে, ভারত ইহার সুযোগ লইতে পারে। এই কথা শুনিয়া তাহারা আমাকে সিআইএর দালাল বলিয়া অভিহিত করে। আমি তখন তাহাদিগকে বাসা ছাড়িয়া যাওয়ার কথা বলিলে তাহারা উভয়ে পকেট হইতে রিভলবার বাহির করিয়া আমাকে গুলি করিতে উদ্যত হয়। এই সময় টিএন্ডটির সৈয়দ আনোয়ার পাশের ঘর হইতে আসিয়া মাঝখানে দাঁড়ায় এবং গোলমাল মিটমাট করিয়া দেয়। অতঃপর বেলাল ও বাহার চলিয়া যায়।"....

সিআইএ সৃষ্ট গণবাহিনীর ভেতর 'র' এরও যে অনুপ্রবেশ ঘটে তার ইঙ্গিত মেলে কর্নেল তাহেরের মামলার রায় ঘোষণার পর পরই ঢাকার ভারতীয় হাই কমিশনের ডিফেন্স অ্যাটাশের বহিষ্কারের মধ্যে। ওই সময় ডিফেন্স অ্যাটাশে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার ভোরা। তাকে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ঘোষণা করে সরকার বাংলাদেশ থেকে বহিষ্কার করে। এরও আগের এক ঘটনায় 'র'-এর অনুপ্রবেশ আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯৭২ সালে 'র'-এর ডিরেক্টর আর এন কাও আসেন ঢাকায়। তিনি ওঠেন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের[১৮] সাত তলার একটি স্যুইটে। শেখ মুজিবর রহমান তখন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বাংলাদেশ গোয়েন্দা বিভাগের তৎকালীন প্রধান প্রয়াত আহমদ ইব্রাহিমকে কাওয়ের সঙ্গে দেখা করতে বলেন। আহমদ ইব্রাহিম কাওয়ের স্যুইটে গিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে রহস্যময় পুরুষ বলে কথিত এক ব্যক্তিকে দেখে অবাক হয়ে

১৮. পরবর্তীতে হোটেল শেরাটন।

www.pathagar.com

যান। কাও তখন বলেন : He is our man, Try to help him. (তিনি আমাদের লোক। তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করবেন)।"

ম্যাজিস্ট্রেট এ আর মজুমদারের কাছে দেওয়া পিটার কাসটার্সের জবানবন্দির প্রেক্ষাপটে আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' এবং তার সশস্ত্র ক্যাডার 'গণবাহিনী" তত্ত্ব কোথা থেকে আসে, কি-ই বা তার লক্ষ্য। পিটার কাসটার্স 'গণবাহিনী' তৈরির পরিকল্পনা নেন দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে 'র' কে মোকাবিলা এবং শেখ মুজিবকে উৎখাতে। এই পিটার কাসটার্স পরবর্তীতে সমবায় আন্দোলনের ছদ্মাবরণে বাংলাদেশে 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' কায়েমের প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন, যোগাযোগের সূত্র তৈরি করেন বামপন্থী বলে কথিত কোন কোন দলের সঙ্গে। ১৯৮৮ সালের নভেম্বর মাসে বামপন্থী বলে কথিত একটি দলের এক নেতা এবং একটি কৃষক সংগঠনের এক নেতা তার আমন্ত্রণে যান হল্যান্ডে সমবায় আন্দোলন-এর মাধ্যমে বাংলাদেশে 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' কায়েমের সবক নিতে।

অন্যদিকে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের পাশাপাশি সিআইএ মোশতাক জোটকে পরিচর্যা করতে থাকে তাৎক্ষণিক আঘাত হানার জন্য। শেখ মুজিব উৎখাতে এই জোটের ষড়যন্ত্রের ওপর লেখালেখি হয়েছে অনেক। পুস্তকাকারেও এসেছে। অতএব, সে বিষয়ে আমরা যাব না। আমরা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে রক্ষী বাহিনীর ব্যবহারে 'র' এবং একাধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সকল রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বিনাশে রক্ষী বাহিনীর ব্যবহারে শেখ মুজিবের ভূমিকা এবং অপরদিকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্লোগানের মধ্য দিয়ে গণবাহিনী সৃষ্টি করে 'র' কে প্রতিহত করতে এবং শেখ মুজিব উৎখাতে স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে সিআইএ যে যুদ্ধে নামে, তার মাঝেই আমাদের আলোচনা সীমিত থাকবে।

www.pathagar.com

রক্ষী বাহিনী ও গণবাহিনীর যুদ্ধ

গোপন সাত দফা চুক্তি মোতাবেক বাংলাদেশে একটি আধাসামরিক বাহিনী তৈরির প্রস্তুতি আগেভাগেই ছিল ভারতের এবং 'র' মনোনীত ব্যক্তি তৈরি হয়েই বসেছিলেন বাংলাদেশ থেকে ডাক আসার অপেক্ষায়। তিনি মুজিব বাহিনীর সংগঠক আমাদের পূর্ব পরিচিত মেজর জেনারেল এমএস উবান— বিশেষ ধরনের ঠ্যাঙ্গাড়ে বাহিনী তৈরির অভিজ্ঞতায় যিনি সমৃদ্ধ। রক্ষী বাহিনী গঠন করে দিতে জেনারেল উবানকে বাংলাদেশে প্রেরণের জন্য শেখ মুজিব ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর কাছে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি পাঠালে উবান বিলম্ব মাত্র না করে চলে আসেন ঢাকায়। রক্ষী বাহিনীতে জেনারেল উবানের সম্পৃক্ত হবার বিষয়টি তার নিজের ভাষায় তুলে ধরা হচ্ছে :

"একদিন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব পি এন হাকসার আমার নামে একটি বার্তা পাঠালেন। বার্তায় বলা হয় যে শেখ মুজিবুর রহমানের অনুরোধে প্রধানমন্ত্রী আমাকে শেখ-এর ব্যক্তিগত উপদেষ্টা হিসেবে ঢাকায় পাঠাতে সম্মত হয়েছেন এবং আমি যেন সেই মতো তৈরি হই।"

"আমার নামে ওই বার্তা, যাতে শেখ মুজিবের উপদেষ্টা করা হয়েছে আমাকে এবং তিনি সেই ব্যক্তি, যিনি ওই সময় সারা বিশ্বের সবচেয়ে বড় খবরে পরিণত হয়েছেন, আমার জন্য সেই বার্তাটি ছিল এক বিরল সম্মানের বস্তু। ঢাকায় পৌছলে শেখ-এর পররাষ্ট্রমন্ত্রী মি. সামাদ আমাকে বিমান বন্দরে অভ্যর্থনা জানান। শহরে যাবার আগে বিমান বন্দরে বসে এক কাপ চা পান করে যাবার জন্যে তিনি জোরাজুরি করতে থাকেন।"

"শেখ সাহেব আমাকে আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করলেন। বললেন, তাদের সঙ্গে তার সরকারি বাসভবনেই যেন আমি থেকে যাই। আমি তার অনুরোধ বিনয়ের সঙ্গে ফিরিয়ে দেই। তার বাসভবনে খালি রুম ছিল না। তথাপি এতে আমার কোন সন্দেহ নেই যে, তার এবং তার পরিবারের সকলের সাথে থাকলে তিনি খুশিই হতেন। কেননা, তার পরিবারের সবাই আমাকে ইতোমধ্যে ভালোভাবে জেনেছেন। ....."

"বিখ্যাত শিল্পপতি আদমজির বাসভবনে আমাকে রাখা হল। আমি নিরামিষভোজী। সেই মতো আমার খাবার-দাবারের চমৎকার ব্যবস্থা করা হলো।"

"তিনটি ব্যাপারে মুজিব সে সময় উদ্বেগের মধ্যে ছিলেন। একটি হলো, একটি বিশেষ গ্রুপের লোকদের অস্ত্র সমর্পণ না করা। সুযোগ এলেই এরা সরকারের বিরুদ্ধে এই অস্ত্র ব্যবহার করবে। বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় এই তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র ও

www.pathagar.com

গোলাবারুদ লুকিয়ে রাখার জন্য প্রচুর গোপন গুদামঘর তৈরি করেছিল এবং শেখ মুজিব সে সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন।...

"তৃতীয়টি হলো, খাঁটি যুব ক্যাডারদের পুনর্বাসন, যাদেরকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ভালো প্রশিক্ষণ দেন এবং অস্ত্রে সজ্জিত করেন। এদের সকলেই ছিলেন বেকার। তার (শেখ মুজিব) ছোট্ট সেনাবাহিনীতে এদের আত্মীভূত করার স্থানও ছিল না। তিনি ঠিক জানতেন না এদের সর্বোত্তম ব্যবহার হবে কিভাবে ...।

"শেখ একটি নতুন বাহিনী গঠনের চিন্তাভাবনা করছিলেন, যাতে তার ভেতর মুক্তি বাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশ এবং মুজিব বাহিনীর সদস্যদের আত্মীভূত করা যায়।...."

"নিজের এই চিন্তাভাবনা নিয়ে তিনি (শেখ মুজিব) আমার সঙ্গে আলাপ করেন এবং আমি ঐকমত্য পোষণ করাতে তিনি নতুন একটি বাহিনী গঠনের আদেশ দেন। এর নামকরণ করেন জাতীয় রক্ষী বাহিনী (জে আর বি অথবা ন্যাশনাল সিকিউরিটি ফোর্স) প্রাথমিক পর্যায়ে এই বাহিনীর সদস্য সংখ্যা হবে অফিসার নিয়ে বার হাজার। বাহিনীর সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য অধিনায়কত্ব রাখেন নিজেরই হাতে এবং ঢাকাকে মুখ্য কেন্দ্র করেন। এক সুদক্ষ অফিসার, নাম কর্নেল নুরুজ্জামান, তাকে করেন এই বাহিনীর কমান্ডার। আর এই বাহিনী গঠনে, প্রশিক্ষণ দান এবং অস্ত্র সজ্জিতকরণে সহায়তা দানে আমাকে অনুরোধ করেন।"[১]

রক্ষী বাহিনীর প্রশিক্ষণদানকারী ভারতীয় সেনা অফিসারদের মধ্যে ছিলেন মেজর মালহোত্রা। তানদুয়া মুজিব বাহিনী ট্রেনিং ক্যাম্পে সমাজতন্ত্রের ওপর বক্তৃতা প্রদান বন্ধের আদেশ দেন যে কর্নেল, তার সঙ্গেও ছিলেন মেজর মালহোত্রা। তার কথা আবদুর রাজ্জাক আমাকে দেয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন। সুতরাং বুঝে নিতে বেগ পেতে হয় না যে, রক্ষী বাহিনী সর্বপ্রথম ঝাঁপিয়ে পড়ে বামপন্থী এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের বামপন্থী চিন্তাধারায় অনুবর্তী কর্মীদের ওপর এবং আক্রমণ হানে শেখ মুজিবের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের ওপর।"

নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড চালাবার অবাধ লাইসেন্স পেয়ে যায় রক্ষী বাহিনী। কেননা, এই বাহিনী তার কার্যকলাপের জন্য একমাত্র প্রধানমন্ত্রী, পরে প্রেসিডেন্টের (শেখ মুজিব) কাছেই দায়ী ছিল। কোন আদালতে রক্ষী বাহিনীর কার্যকলাপ চ্যালেঞ্জ করে মামলা দায়েরের কোন সুযোগই ছিল না। যখন যাকে খুশি গ্রেফতার করতে পারতো একজন রক্ষী বাহিনীর সদস্য। গুম করে দিলেও তার গায়ে আঁচড় কাটার ক্ষমতা ছিল না কারোরই। বলা হয়, কর্যক্রম শুরুর কাল থেকে ভেঙ্গে দেয়ার আগ পর্যন্ত রক্ষী বাহিনী প্রায় দশ হাজার লোক হত্যা করে।

শেখ মুজিব নিহত হবার পর রক্ষী বাহিনীর নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ডের বিবরণ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আসতে শুরু করে। ওই বিবরণ পাঠককে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অত্যাচার ও হত্যাযজ্ঞকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। শেখ মুজিবের জীবৎকালেই বিদেশী

১. মেজর জেনারেল এস এস উবান : *ফ্যান্টমস অব চিটাগং 'ফিফথ আর্মি' ইন বাংলাদেশ*, পৃষ্ঠা-১৩৮-১৩৯।

www.pathagar.com

পত্র-পত্রিকায় নির্যাতনের নানা বিবরণ প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত একটি রিপোর্টে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন এক বিদেশী সাংবাদিকের ওপর। তার জন্য বাংলাদেশ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। বিদেশী পত্র-পত্রিকায় রক্ষী বাহিনীর নির্যাতনের ওপর যেসব রিপোর্ট বের হয়, তার কয়েকটি তুলে ধরা হচ্ছে :

মার্কিন মাসিক *রিডারস ডাইজেস্ট*-এর ১৯৭৫ সালের মে মাসের সংখ্যায় লেখা হয় : "শেখ মুজিব দু'টি বেসামরিক সংগঠনের ওপর নির্ভরশীল। একটি হচ্ছে তার ভাগ্নের নেতৃত্বাধীন এক লাখ সশস্ত্র একগুঁয়ে যুবকের সংগঠন যুবলীগ। এটি জাতীয় শুদ্ধি অভিযানে নিয়োজিত। অপরটি হচ্ছে, তার নিরাপত্তা বাহিনী। নিষ্ঠুর রক্ষী বাহিনী। শেষোক্ত দলটি যে কোন সময় যখন-তখন বন্দুক উঁচিয়ে কল-কারখানায় ঢুকে পড়ে, শ্রমিক নেতাদের ওপর খবরদারি করে, গ্রামাঞ্চলে আকস্মিক সান্ধ্য আইন জারি করে সন্ত্রাসের রাজত্ব চালায়। এরা সাধারণ লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় এমন নির্যাতন চালিয়ে থাকে, যার পরিণতিতে এ যাবৎ বহু লোকের মৃত্যু হয়েছে।"[২] মার্কিন সাপ্তাহিক *নিউজউইক* ১৫ জুলাই, ১৯৭৫-এর সংখ্যায় লেখে "রক্ষী বাহিনী নামক একটি আধাসামরিক বাহিনী পুনরায় নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠেছে। বিদেশী সাংবাদিকের কাছে দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আজো পাকিস্তানি আমলের মতোই জনসাধারণ ভয়ে কেঁপে ওঠে। সম্প্রতি এক মন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাওকারী একটি মিছিলের ওপর রক্ষী বাহিনীর মেশিনগানের গুলি বর্ষিত হয় এবং ঠাণ্ডা মাথায় মিছিলের ১৯ জনকে হত্যা করে।"[৩]

পশ্চিম বাংলার *ফ্রন্টিয়ার* পত্রিকার 'ভলিউম বি, নম্বর-২'এ প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয় : "ময়মনসিংহ জেলার একটি থানাতেই শত শত তরুণ, কৃষক ও ছাত্রকে হত্যা করা হয়েছে। এদের অনেকেই সিরাজ সিকদারের পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টির সদস্য ছিল। অন্যদের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দলের প্রতি সহানুভূতিশীল বলে সন্দেহ করা হয়েছিল। এমনকি অনেক যুবক, যারা রাজনীতিতে ততটা সক্রিয় ছিল না, তারাও সন্ত্রাসী অভিযানে প্রাণ হারিয়েছে।

"যারা সৌভাগ্যবশত রক্ষী বাহিনী-ক্যাম্প থেকে ছাড়া পেয়েছে, তাদের মুখে মধ্যযুগীয় নির্যাতন পদ্ধতি অনুসৃত হবার কথা শোনা গেছে। নির্যাতনের সাধারণ হাতিয়ার লৌহদণ্ড, সুঁচ, গরম পানি প্রভৃতি। বিরোধী রাজনৈতিক দল সম্পর্কে তথ্য উৎঘাটনে এগুলো যথেষ্ট কার্যকর। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিপ্লবের রাজনীতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এর প্রধান দিক হচ্ছে বাংলাদেশের বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম।"[৪]

রক্ষী বাহিনী কার্যক্রম আরম্ভ করে ১৯৭২ সালের শেষের দিকে। শুরুতেই তাকে কয়েকটি বামপন্থী গ্রুপের সশস্ত্র প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হয়। ১৯৭৪ সালে

---

২. আহমেদ মুসা : *ইতিহাসের কাঠগড়ায় আওয়ামী লীগ*, পৃষ্ঠা-২০৬

৩. প্রাগুক্ত।

৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২০৩-২০৪। এই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয় সর্বহারা পার্টি নেতা সিরাজ সিকদারের মৃত্যুর পর। তাকে ১৯৭৫ সারের ২ জানুয়ারি রক্ষী বাহিনী হত্যা করে।

www.pathagar.com

প্রতিরোধে নামে গণবাহিনী—জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সশস্ত্র ক্যাডার গ্রুপ। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে এই ক্যাডার গ্রুপের শত শত তাজা তরুণ অকাতরে জীবন দেয় রক্ষী বাহিনীর স্টেন আর মেশিনগানের গুলিতে। অথচ এই তরুণরা জানতো না তথাকথিত ডাচ রিলিফ কর্মী পিটার কাসটার্স আর তার বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের সঙ্গে গণবাহিনীর সম্পর্কের কথা। আর এই সম্পর্কটির আলোকে বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয় যে রক্ষী বাহিনীর সঙ্গে গণবাহিনীর লড়াইটি ছিল 'র' আর সিআইএ'র লড়াই এবং এ কথাও ঠিক, কোথাও কোথাও বামপন্থীদের সঙ্গে মিলে রক্ষী বাহিনীর প্রতিরোধে নেমেছে গণবাহিনী। এদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ওপর নির্যাতনের অভিযোগও নেই।

www.pathagar.com

উপসংহার

এ যাবত আমরা যা দেখে এসেছি, তাতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাশক্তি ও আঞ্চলিক শক্তির ভূমিকা আমাদের কাছে স্পষ্ট। নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধিতে পরাশক্তি ও আঞ্চলিক শক্তি ক্ষুদ্র দেশের গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আবেগ আর সংগ্রামী চেতনাকে সে দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ন্ত্রণে কী কৌশলে ব্যবহার করে তাও আমাদের কাছে কম বেশি পরিষ্কার। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মুজিব বাহিনী রক্ষী বাহিনী এবং গণবাহিনী তার দৃষ্টান্ত।

বিরোধী রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ নির্মূলে পরাশক্তি এবং আঞ্চলিক শক্তির এই যে রাজনীতি, এর প্রতিফলন বাংলাদেশের বুকে ঘটে ব্যক্তিগত প্রতিপক্ষকে নির্মূল করার রাজনীতিতে যার প্রকাশ ঘটে রক্ষী বাহিনী, আওয়ামী যুবলীগের যুববাহিনী এবং লাল বাহিনী তৈরির রাজনীতির মধ্যে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে পরমত অসহিষ্ণুতা ও প্রতিপক্ষকে কায়িকভাবে বিনাশের যে রাজনীতি আমরা দেখতে পাচ্ছি—যা বিষাক্ত সাপের ভয়ঙ্কর নিঃশ্বাসের মতই ছড়িয়ে পড়েছে গ্রামগঞ্জ শহরের রাজনীতিতে, এ সেই রাজনীতিরই প্রতিফলন।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

সাক্ষাৎকার

হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী
রুহুল কুদ্দুস
আবদুর রাজ্জাক
তোফায়েল আহমদ
হাসানুল হক ইনু

www.pathagar.com

সা ক্ষা ৎ কা র

হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের দিল্লী মিশন প্রধান, স্বাধীনতার পর দিল্লীতে বাংলাদেশ হাই কমিশনার, পরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং এক সময় জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি।

প্রশ্ন : তিনজন সংখ্যালঘু নেতা ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন এবং তার কাছে বাংলাদেশকে ভারতের একটি অংশ করে রাখার প্রস্তাব দেন। আপনি এ সম্পর্কে কতটুকু জানেন?

হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী : মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের যোগাযোগ রক্ষা করার দায়িত্ব আমার ওপর অর্পিত ছিল। সেই সূত্রে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত স্টাফদের সঙ্গে আমার হার্দিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রধানমন্ত্রীর এক ব্যক্তিগত স্টাফ আমাকে ২৯ ডিসেম্বর ১৯৭১ এ জানান যে, আগের দিন অর্থাৎ ২৮ ডিসেম্বর তিনজন সংখ্যালঘু নেতা যাদের মধ্যে চিত্তরঞ্জন সুতার ছিলেন একজন, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। তারা তাঁর কাছে বাংলাদেশকে ভারতের অংশ করে রাখার প্রস্তাব রাখেন। প্রধানমন্ত্রী তাদের প্রস্তাবের জবাবে বলেন : "ইয়ে না মুমকীন হ্যায়।" প্রধানমন্ত্রীর ওই ব্যক্তিগত স্টাফ সেই সময় সেখানে ছিলেন। তিনিই ওই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে দেন।

পরে আমি বাংলাদেশে সরকারকে বিষয়টি অবহিত করি। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয় হয় না। আসলে, তারা, কিছু সংখ্যালঘু নেতা চেয়েছিলেন বাংলাদেশকে সিকিম ধরনের ভারতীয় অংশ করতে।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালের ১০ জানুয়ারি শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তানি বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে লন্ডন দিল্লী হয়ে ঢাকা আসেন। তিনি লন্ডন থেকি দিল্লী আসেন ব্রিটিশ বিমান বাহিনীর একটি বিমানে। দিল্লী থেকে নিজস্ব বিমানে তাকে ঢাকায় পৌঁছে দেবার প্রস্তাব রাখে ভারত সরকার। কিন্তু শেখ মুজিব ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। সত্য কি?

হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী : কথাটি সত্য। ভারত সরকারের তৎকালীন প্লানিং কমিশনের চেয়ারম্যান ডি পি ধর, তার ওপর অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার সংক্রান্ত বিষয়াবলি দেখা শোনার দায়িত্ব ছিল অর্পিত। তিনিই আমাকে ভারত সরকারের ওই প্রস্তাবটি জানিয়ে বলেন : "ব্রিটিশ সরকার এখনো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। সেখানে শেখ সাহেব কী করে তাদের বিমানে ঢাকা যাবেন।" অস্থায়ী সরকারের

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ আমাকে একদিন বলেছিলেন : 'ডি পি ধর যা বলবেন, সেটাকে বাংলাদেশ সরকারের আদেশ বলে মনে করতে হবে।' তাজউদ্দীন আহমদের সে কথা মনে রেখেও আমি বঙ্গবন্ধুকে (শেখ মুজিব) ভারত সরকারের ওই প্রস্তাবের বিষয় জানাতে সাহস পাইনি। শেষ পর্যন্ত আমারই অনুরোধে তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ বঙ্গবন্ধুকে ওই প্রস্তাবের কথা জানান। বঙ্গবন্ধু তাতে বলেছিলেন : "আমি ভারতীয় বিমানে ঢাকা যাব না। এটাই আমার শেষ কথা। ওদের বলে দিও।" আমি বঙ্গবন্ধুর এ জবাবে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলাম। স্বস্তিবোধ করেছিলাম।

প্রশ্ন : ইতালীয় ফ্রি-ল্যান্স মহিলা সাংবাদিক ওরিয়ানা ফালাসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেছেন যে, শেখ মুজিব তার সামনে পবিত্র কুরআন শরীফ স্পর্শ করে বলেছিলেন তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন। শেখ মুজিবকে এ বিষয়ে আপনি কখনো কি কোন প্রশ্ন করেছিলেন।

হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী : ওরিয়ানা ফালাসিকে দেয়া জুলফিকার আলী ভুট্টোর ওই সাক্ষাৎকারটি আমি ১৯৭২ সালেই পড়ি। আমি বঙ্গবন্ধুর কাছে এ নিয়ে প্রশ্ন রেখেছিলাম একবার। তিনি অস্বীকার করেছিলেন। বলেছিলেন, ভুট্টোকে তিনি এ ধরনের কোন কথা দেন নি। আর ১৯৭৬ সালে জেদ্দায় আমার সঙ্গে ভুট্টোর দেখা হয়। আমি তখন সউদি আরবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত। ভুট্টো ওই সময় সউদি আরব সফরে যান। আমি ওরিয়ানা ফালাসিকে দেয়া তার সাক্ষাৎকারে তাকে দেয়া শেখ মুজিবের প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করে বলি যে শেখ মুজিব আমাকে বলেছেন তেমন কোন প্রতিশ্রুতি আপনাকে তিনি দেন নি। ভুট্টো আমার কথায় বার বার জোর দিয়ে বলেন যে, শেখ মুজিব তার কাছে ওয়াদা করেছিলেন। তিনি এও বলেন যে, তিনি মিথ্যা বলছেন না।

প্রশ্ন : বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়ার আগে সোভিয়েত ইউনিয়ন লিখিতভাবে জানতে চায় যে বাংলাদেশ পাকিস্তানের সঙ্গে কোন কাঠামোগত সম্পর্ক রাখবে কিনা? ঘটনাটি কতটুকু সত্য?

হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী : ঘটনাটি সত্য। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান সোভিয়েত ইউনিয়নকে লিখিতভাবে জানান যে বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের কোন কাঠামোগত সম্পর্ক রাখার কোনই সুযোগ নেই। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। এরপরই সোভিয়েত রাশিয়া বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়। প্রধানমন্ত্রীর ওই চিঠি আমি নিজে দিল্লীতে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতের হাতে দেই।

প্রশ্ন : অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার ভারতের সঙ্গে যে গোপন সাত দফা চুক্তি করে, প্যারামিলিশিয়া বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা কি সেই সাত দফার মধ্যেই একটি? রক্ষী বাহিনী কি সেই প্যারামিলিশিয়া বাহিনী?

হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী : ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে ভারত সরকারের সঙ্গে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার এক লিখিত চুক্তিতে, প্যাক্ট নয় এগ্রিমেন্টে-এ আসেন। ওই

www.pathagar.com

চুক্তি বা এগ্রিমেন্ট অনুসারে দু'পক্ষ কিছু প্রশাসনিক, সামরিক ও বাণিজ্যিক সমঝোতায় আসেন। প্রশাসনিক বিষয়ে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার ভারতের যে প্রস্তাবে রাজি হন, তা হলো : যারা সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধ করেছে, শুধু তারাই প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে নিয়োজিত থাকতে পারবে। বাকিদের চাকুরিচ্যুত করা হবে এবং সেই শূন্য জায়গা পূরণ করবে ভারতীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তারা।

স্বাধীনতার পর বেশ কিছু ভারতীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা বাংলাদেশে এসেও গিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু (শেখ মুজিব) এসে তাদেরকে বের করে দেন।

সামরিক সমঝোতা হলো : বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশে অবস্থান করবে (কতদিন অবস্থান করবে তার সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় না)। ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাস থেকে আরম্ভ করে প্রতিবছর এ সম্পর্কে দু'দেশের মধ্যে পুনরীক্ষণের জন্য বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশের নিজস্ব কোন সেনাবাহিনী থাকবে না।

অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য মুক্তি বাহিনীকে কেন্দ্র করে একটি প্যারামিলিশিয়া বাহিনী গঠন করা হবে।

ওই লিখিত সমঝোতাই হচ্ছে বাংলাদেশে রক্ষী বাহিনীর উৎস। আর ভারত-পাকিস্তান সর্বাত্মক যুদ্ধ বিষয়ক সমঝোতাটি হলো : সম্ভাব্য ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে অধিনায়কত্ব দেবেন ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান, মুক্তি বাহিনী সর্বাধিনায়ক নন। যুদ্ধকালীন মুক্তি বাহিনী ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়কত্বে থাকবে।

চুক্তির ওই অনুচ্ছেদটির কথা মুক্তি বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীকে জানান হলে তীব্র ক্ষোভে তিনি ফেটে পড়েন। এর প্রতিবাদে রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত থাকেন না।

১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতা সফরে গিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান সাধারণ কথাবার্তার মাঝে প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীকে অপ্রস্তুত করে দিয়ে বলেন : "আমার দেশ থেকে আপনার সেনাবাহিনী ফিরিয়ে আনতে হবে।" শেখ মুজিব এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এত সহজভাবে তুলতে পারেন ভাবতেও পারেন নি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী। তার ওই অপ্রস্তুত অবস্থার সুযোগ নিয়ে শেখ মুজিব নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেন: "এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর আদেশই যথেষ্ট।" অস্বস্তিকর অবস্থা পাশ কাটাতে মিসেস ইন্দিরা গান্ধীকে রাজি হতে হয় এবং জেনারেল মানেকশকে বাংলাদেশ থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের দিনক্ষণ নির্ধারণের নির্দেশ দেন।

বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে যে চুক্তি হয়, সেটা খোলা বাজার (ওপেন মার্কেট) ভিত্তিক। খোলা বাজার ভিত্তিতে চলবে দু'দেশের বাণিজ্য। তবে বাণিজ্যের পরিমাণের হিসাব-নিকাশ হবে বছরওয়ারি এবং যার যা প্রাপ্য, সেটা স্টার্লিং-এ পরিশোধ করা যাবে।

স্বাধীনতার পর পরই চুক্তি অনুসারে খোলা বাজারভিত্তিক বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। দু'দেশের সীমান্তের তিন মাইল খুলে দেয়া হয়। শেখ মুজিব এটা বন্ধ করে দেন।

www.pathagar.com

বৈদেশিক বিষয়ে প্রবাসী বাংলদেশ সরকার যে চুক্তিতে আসেন, সেটা হলো : বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের প্রশ্নে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে এবং যতদূর পারে ভারত এ ব্যাপারে বাংলাদেশকে সহায়তা দেবে।

মূলত বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে ভারত।

এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। চুক্তি স্বাক্ষরের পর মুহূর্তেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

ভারত সরকারের সঙ্গে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার গৃহীত এই পুরো ব্যবস্থাকেই অগ্রাহ্য করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। এ কারণে আমি বিনা দ্বিধায় বলতে পারি যে, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১-এ বাংলাদেশ পাকিস্তান সৈন্য মুক্ত হয় মাত্র। কিন্তু স্বাধীন সার্বভৌম হয় ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারিতে যেদিন শেখ মুজিব পাকিস্তান জেল থেকে মুক্ত হয়ে ঢাকা আসেন। বস্তুত শেখ মুজিব ছিলেন প্রকৃত সাহসী এবং খাঁটি জাতীয়তাবাদী।

(হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী)
২৭ ডিসেম্বর, ১৯৮৯

www.pathagar.com

রুহুল কুদ্দুস

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত প্রাক্তন সিএসপি, অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের মুখ্যসচিব এবং স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকারের মুখ্য সচিব।

রুহুল কুদ্দুস সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেন যে, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বাইরে শেখ মুজিবর রহমানের একটি ইনার সার্কেল ছিল। ওই ইনার সার্কেলে তিনি এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আরেক অভিযুক্ত প্রাক্তন সিএসপি আহমদ ফজলুর রহমানও ছিলেন। রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে একজনই ছিলেন ইনার সার্কেলের লোক— তিনি তাজউদ্দীন আহমদ।

ছয়দফা প্রণয়ন সম্পর্কিত পূর্ব কথায় রুহুল কুদ্দুস বলেন : ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণের সূত্রপাত ঘটায়। এই সময় পাকিস্তানের আয়কৃত মোট বৈদেশিক মুদ্রার শতকরা ৭০ ভাগ আয় করতো পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিম পাকিস্তান আয় করতো শতকরা ৩০ ভাগ। অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন বাজেটে শতকরা ৭০ ভাগ ব্যয় বরাদ্দ থাকতো পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য। পূর্ব পাকিস্তান পেতো শতকরা ৩০ভাগ। উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য যে বৈদেশিক ঋণ আসতো, তার প্রায় সবটাই যেতো পশ্চিম পাকিস্তানে। অথচ ঋণ পরিশোধ করা হতো পূর্ব পাকিস্তানের আয়কৃত অর্থ থেকে। ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন ঘোষণার মাধ্যমে পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় আইউব খানের আগমনে এতদঞ্চলের মানুষের ভাগ্য এক অনিশ্চয়তার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। শোষণ আরো তীব্রতর হতে থাকে এবং পাকিস্তানের মানুষ তাদের রাজনৈতিক, মানবিক ও অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। যেহেতু আমি প্রশাসনের মধ্যেই ছিলাম, সে কারণে বৈষম্যের মেকানিজম এবং মাত্রা আমার কাছে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। ১৯৬১ সালের আগ পর্যন্ত পূর্ব ও পশ্চিমে পাকিস্তানের বৈষম্যের সঠিক পরিসংখ্যানসহ কোন বক্তব্য আসেনি। তবে এতদিনে পূর্ব পাকিস্তানি জনগণ এবং এখানকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পশ্চিম পাকিস্তানি শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে উচ্চকিত হয়ে ওঠেন।

আমি ১৯৬১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানি শোষণের পুরো তথ্য ও পরিসংখ্যানসহ ইংরেজিতে একটি নিবন্ধ রচনা করি। নিবন্ধটি প্রকাশ করার জন্য শেখ মুজিব মারফত দৈনিক *ইত্তেফাক*-এ দেই। দৈনিক *ইত্তেফাক* সেটার বাংলা করে ধারাবাহিকভাবে ছাপান।

www.pathagar.com

১৯৬২ সালে আইউব খান নতুন শাসনতন্ত্র দেন। সে সময় থেকে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পাকিস্তানি শোষণ ও বৈষম্যের অবসান প্রশ্নে আমি প্রায়শই পূর্ব পাকিস্তানি নেতাদের সঙ্গে মত বিনিময় করতাম। শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে আলোচনাটা হতো বেশি। অবশ্যিই সেটা গোপনে। সরকারি কর্মচারী ছিলাম বলেই গোপনীয়তার আশ্রয় নিতে হতো। আমি তখন কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব।

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পর শেখ মুজিব আমাকে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ অবসানের লক্ষ্যে স্বায়ত্ত শাসনভিত্তিক একটি দলিল তৈরি করে দিতে বলেন। আমার রচিত ওই খসড়া দলিলটি ছিল সাত দফার। তৈরির পর সেটা নিয়ে শেখ মুজিব এবং তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে আলোচনায় বসি। আলোচনার পরে একটি দফা বাদ দেওয়া হয়। বাদ দেওয়া ওই দফাটি ছিল—প্রাদেশিক গভর্নরকে নির্বাচিত হতে হবে।

দলিল তৈরির পর আমি সেটা টাইপ করাই খায়রুল কবিরের অফিস থেকে। খায়রুল কবির তখন তৎকালীন ইউনাইটেড ব্যাংক লিমিটেডের (স্বাধীনতার পর জনতা ব্যাংক) এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট। আর আমি কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের ফাইন্যান্স ডাইরেক্টর।

প্রশ্ন : ছয় দফা দলিলটি সম্পূর্ণই আপনার তৈরি?

রুহুল কুদ্দুস : শতকরা একশত ভাগ আমারই তৈরি। খসড়া দলিলটি চূড়ান্ত হবার পর আমি শেখ মুজিবকে সেটা নিয়ে নূরুল আমিনের সঙ্গে কথা বলতে বলি। তিনি তখন ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের (এন ডি এফ) নেতা। নূরুল আমিনের সঙ্গে আলোচনা করতে বলি এই কারণে যে, এ বিষয়ে সকল বাঙালি নেতাকে এক প্লাটফরমে আনা যায় কিনা, সে উদ্দেশ্যে। প্রথম দিকে শেখ মুজিব নূরুল আমিনকে ছয় দফার কপি দেখাতে রাজি ছিলেন না। কারণ, নূরুল আমিন সম্পর্কে তার সন্দেহ ছিল যে, এই বিষয়ে তিনি ঐকমত্যে আসবেন না। তথাপি আমার পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত রাজি হন এবং নূরুল আমিনের কাছে যান। তার হাতে ছয় দফার একটি কপি তুলে দেন। ওই সময় গণতন্ত্রী দলের নেতা মাহমুদ আলি সেখানে ছিলেন। নূরুল আমিন ছয় দফার কপিটি পড়েন এবং মাহমুদ আলীর হাতে তুলে দিয়ে বলেন, এ নিয়ে তিনি পরে আলাপ করবেন।

পরদিন শেখ মুজিব আমাকে রেগেই বললেন : "তোমাকে বলেছিলাম নূরুল আমিনকে দেখিয়ে কাজ হবে না। লাহোর সম্মেলনের আগেই ছয় দফা সরকারের কাছে চলে যাবে। সেখানে মাহমুদ আলী বসেছিলেন। সম্ভবত ইতোমধ্যেই তিনি জানিয়ে দিয়েছেন।" মাহমুদ আলীকে আমরা সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের লোক বলে মনে করতাম।

পরে কেন্দ্রীয় তথ্য সচিব আলতাফ গওহর তার প্রভু আইউব খানকে তাসখন্দ চুক্তি উদ্ভূত সংকট থেকে বাঁচানোর জন্যে ছয় দফাকে ব্যবহার করেন। ছয় দফার ব্যাপক প্রচারের জন্য তৎকালীন পাকিস্তানের সকল পত্রিকা সম্পাদককে গোপন নির্দেশ

www.pathagar.com

দেন। তিনি এই অপকৌশল অবলম্বন করে তাসখন্দ চুক্তি সৃষ্ট বিক্ষুব্ধ পশ্চিম পাকিস্তানিদের দৃষ্টি পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদের দিকে ঠেলে দিতে চেয়েছিলেন। ছয় দফার ব্যাপক প্রচারে প্রথম দিকে আমরা হতবাক হয় যাই। অবশ্যি সরকারের অপকৌশল অনুধাবনে আমাদের দেরি হয় না।

প্রশ্ন : ছয় দফার রচয়িতা একা আপনি, এ কথা শেখ মুজিব কখনো বলেননি কেন?

রুহুল কুদ্দুস : কারো কারো সামনে তিনি বলেছেন। বলেছেন এইভাবে—"এই যে ইনিই ছয় দফা তৈরি করেছিলেন।" আদতে অন্যের অবদানকে স্বীকৃতি দেবার উদারতার অভাব ছিল শেখ মুজিবের মানসিকতায়। তার অবর্তমানে দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে, এটা তিনি মেনে নিতে পারেন নি। তাই কখনো তিনি একবারও আমাকে জিজ্ঞেস করেন নি কী কষ্ট আমরা করেছি, কী যন্ত্রণা আমরা সয়েছি অথবা কীভাবে আমরা যুদ্ধ করেছি। সৈয়দ নজরুল ইসলামও আমাকে বলেছেন, তার কাছেও স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পর্কে কিছুই জানতে চান নি শেখ মুজিব। অন্যের অবদানকে স্বীকৃতি দেবার বিষয়টি তিনি সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। ১৯৬৯ সালে ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের পর রেসকোর্স ময়দানের সংবর্ধনা সভায় মামলায় অভিযুক্ত আসামীদের মঞ্চে তুলে পরিচয় করিয়ে দিতে পারতেন। তা করেন নি একই কারণে। অন্যদিকে ১৯৭২ সালে পাকিস্তান জেল থেকে মুক্ত হয়ে ঢাকা ফেরার কয়েকদিন পরই তিনি সোজা চলে যান ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে পাকিস্তানি যুদ্ধ বন্দিদের দুঃখ-দুর্দশার খোঁজ খবর করতে। এ ব্যাপারটি আমাদেরকে তখন বিক্ষুব্ধ করে তোলে দারুণভাবে।

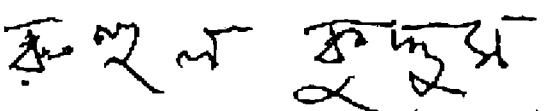

(রুহুল কুদ্দুস)
২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯

www.pathagar.com

আবদুর রাজ্জাক

সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)
মুজিব বাহিনী নেতা চতুষ্টয়ের অন্যতম

প্রশ্ন : স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ কবে গঠিত হয়? বিপ্লবী পরিষদের প্রস্তাবটি কে উত্থাপন করেন এবং সদস্য কে কে ছিলেন?

আবদুর রাজ্জাক : বাংলাদেশে স্বাধীনতার কথা আমরা চিন্তা-ভাবনা শুরু করি ১৯৬০-৬২ সাল থেকে। ১৯৬২ সালে আমরা একটি লিফলেট পাই স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের; যে লিফলেটটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কাছ থেকে এসেছিল এবং লিফলেট বিলি করার দায়িত্ব ছিল আমাদের। সেখান থেকে আমরা অনুপ্রাণিত হই।

প্রশ্ন : আপনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন?

আবদুর রাজ্জাক : আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। সেই সময় থেকে আমরা চিন্তা-ভাবনা শুরু করি কী করে স্বাধীনতা লাভ করা যায়। তবে স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের প্রয়োজন, এই চিন্তাটা আমাদের ছিল এবং ১৯৬৪ সালে আমরা স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ গঠন করার সিদ্ধান্ত নিই। প্রথমে এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেন সিরাজুল আলম খান। তিনিই প্রথম আলাপ করেন।

প্রশ্ন : কোন সালে?

আবদুর রাজ্জাক : এর শুরু ১৯৬২ সাল থেকে। কিন্তু সশস্ত্র বিপ্লব করার জন্য একটা সংগঠন তৈরি করতে হবে, এ বিষয়টি আলাপ আলোচনা হয় ১৯৬৪ সালে।

প্রশ্ন : প্রস্তাবটা প্রথম তোলেন সিরাজুল আলম খান?

আবদুর রাজ্জাক : প্রস্তাবটা তিনিই প্রথম তোলেন। বলেন :"এসো আমরা একটা কিছু করি।" কারণ, তিনি ছিলেন তখন দলের (ছাত্রলীগ) সাধারণ সম্পাদক আর আমি ছিলাম সহসাধারণ সম্পাদক। আমরা আলাপ আলোচনা করতাম ইকবাল হলের মাঠে বসে। তখন চিন্তা করা হলো আরেকজন কাকে নেব। ঠিক করা হয় কাজী আরেফ আহমেদকে আমরা আমাদের সঙ্গে নিতে পারি। কাজী আরেফের সঙ্গে তার (সিরাজুল আলম খান) আগেই আলাপ হয়েছিল। অবশেষে কাজী আরেফকে নিয়ে নেয়া হয়।

প্রশ্ন : মূল ছিলেন আপনারা তিনজন?

আবদুর রাজ্জাক : আমরা তিনজন এবং সেটাই স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন স্বাধীনতার প্রশ্নটি কাছাকাছি এসে গেল অর্থাৎ ১৯৭১ সালে, তখন

www.pathagar.com

আমরা চিন্তা-ভাবনা করলাম যে আরো কিছু লোক আমাদের সঙ্গে আনত হবে এবং স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদে তাদেরকে না নিয়ে একটা ব্যাপক সংগঠন করা যায় কিনা, সেই চিন্তাভাবনা থেকেই আমরা শেখ ফজলুল হক মণি ও তোফায়েল আহমদকে নিই।

প্রশ্ন : শেখ ফজলুল হক মণি ও তোফায়েল আহমদ স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না?

আবদুর রাজ্জাক : না। জানতেন না। জানানো হয় নি।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের আগ পর্যন্তও জানানো হয় নি?

আবদুর রাজ্জাক : আগে এবং পরেও জানতেন না। তাদেরকে পরেও আমরা জানতে দেই নি। এটা জানাজানি হয় স্বাধীনতার পর পর যখন মতপার্থক্যটা শুরু হয়ে যায়। এর আগে জানতে দেইনি।

প্রশ্ন : কেন জানতে দেন নি?

আবদুর রাজ্জাক : কেননা, এটা তো আমাদের সংগঠন ছিল। গোপন সংগঠন।

প্রশ্ন : তাদেরকে বিশ্বাস করতে পারেন নি বলেই কি স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের অস্তিত্বের কথা তাদেরকে জানান নি?

আবদুর রাজ্জাক : আমরা তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিনি বিভিন্ন কারণে। যেমন, শেখ ফজলুল হক মণি ও সিরাজুল আলম খানের মধ্যে একটা ঠাণ্ডা লড়াই ছিল, যেটা অতীতেও ছিল। আর তোফায়েল আহমদের তখনো অতটা রাজনৈতিক পরিপক্কতা আসেনি। যাহোক, স্বাধীনতা সংগ্রাম যাতে এগিয়ে নেয়া যায়, এই চিন্তা থেকে ব্যাপক ঐক্যের জন্য তাদেরকে আমরা নিয়েছি এবং আমরা চারজনে মিলে ১৮ জানুয়ারি, ১৯৭১-এ ফাইনাল কথা বলি। কি করতে হবে না হবে, সেটা বঙ্গবন্ধু বলে দেন।

প্রশ্ন : শেখ মুজিবর রহমানকে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের কথা কখন জানান?

আবদুর রাজ্জাক : ১৯৬৯ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তুলে নেবার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান আইয়ুব খানের জেল থেকে বেরিয়ে এলে আমি আর সিরাজুল আলম খান তার কাছে যাই এবং আমাদের পরিকল্পনা তাকে খুলে বলি। স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের অস্তিত্বের কথা তখনই জানাই। বলি, আপনিই আমাদের সর্বাধিনায়ক।

প্রশ্ন : ১৯৭০ সালের ১২ আগস্ট পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটি স্বাধীন বাংলাদেশের যে প্রস্তাব নেয়, শেখ মুজিব তার বিরোধিতা করেছিলেন, সত্য কি?

আবদুর রাজ্জাক : হ্যাঁ কথাটা ঠিক। তবে, তিনি বলেছিলেন কৌশলগত কারণে। বলেছিলেন, তোমরা এমন প্রস্তাব নাও, যাতে সবটাই বোঝায়। আমরা স্বাধীনতার পক্ষে এটা যেমন বোঝায়, তেমনি ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ যাতে না হয়, সে ব্যবস্থাও রাখ। এর মানে এই নয় স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা করা হয়েছে।

প্রশ্ন : ১৮ জানুয়ারি আপনাদের চারজনকে শেখ মুজিব কি বলেছিলেন?

আবদুর রাজ্জাক : তিনি পরিষ্কার বুঝিয়ে বললেন যে স্বাধীনতার প্রশ্নে সংগ্রাম করতে হবে এবং সশস্ত্র বিপ্লব করতে হবে। আমি তোমাদের জন্য সে ব্যবস্থা করে রেখেছি।

www.pathagar.com

তোমাদের চারজনকে কো-অরডিনেটর হিসেবে ঠিক করে যাব এবং সময় মতো যাতে সাহায্য পাও, অস্ত্র পাও—যাতে যুদ্ধ করতে পার সে ব্যবস্থা করবো। তিনি আরো বলেছিলেন, তাজউদ্দীন আহমকে সঙ্গে নেবে। এ কথা তিনি বলেছিলেন। ২৫ শে মার্চ রাতে যখন ক্র্যাকডাউন হয়ে যায়, তখন আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। আমাদের কাছে একটা ঠিকানা ছিল। আমার কাছেও ছিল। তাজউদ্দীন আহমদের কাছেও ছিল— যেখানে ভারতে কলকাতায় গিয়ে দেখা হবে। ভাবলাম নিশ্চয়ই তাজউদ্দীন আহমদ সেই ঠিকানায় চলে গেছেন। কলকাতায় গিয়ে শুনলাম তিনি দিল্লী চলে গেছেন। ভাবলাম জায়গা মত যাই। জায়গা মতো গিয়ে দেখি শেখ ফজলুল হক মণি ও তোফায়েল আহমদ।

প্রশ্ন : সেই জায়গাটা কোথায়?

আবদুর রাজ্জাক : সে জায়গাটা কলকাতায়, –২১ রাজেন্দ্র রোড, যেখানে চিত্তরঞ্জন সুতার বঙ্গবন্ধুর রিপ্রেজেনটেটিভ হিসেবে ছিলেন। ভেবেছিলাম নিশ্চয়ই তাজউদ্দীন আহমদ চিত্তরঞ্জন সুতারের সঙ্গে যোগাযোগ করেই (দিল্লী) গেছেন। গিয়ে শুনলাম যে কোন যোগাযোগই করেন নি। তাকে (চিত্তরঞ্জন) জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন বঙ্গবন্ধুর বিশ্বস্ত তিনি। তার কাছে ওই নামটাও (তাজউদ্দীন আহমদ) আছে। বিশ্বস্ত লোক—বিশ্বাস করা যাবে। এ কথা বঙ্গবন্ধু বলে দিয়েছেন।

ইতোমধ্যে আমরা খবর পেয়ে গেলাম যে, তিনি সরকার গঠন করেছেন নিজেকে প্রধানমন্ত্রী করে। প্রধানমন্ত্রী তিনি নিজেকে ঘোষণা করলেন, এই হলো ক্ষোভের কারণ। কারণ, বঙ্গবন্ধু ১৮ জানুয়ারি আমাদের সঙ্গে বসলেন। পরবর্তীকালে তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে বসে যে কথা বলে দিলেন, বলেছিলেন, কমান্ড কাউন্সিল হবে এবং কমান্ড কাউন্সিলের মাধ্যমে স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালিত হবে। এমনি কি তিনি বলেছিলেন স্বাধীনতার পরেও এই কমান্ড কাউন্সিলের মাধ্যমে দেশ পরিচালিত হবে পাঁচ বছর পর্যন্ত। পাঁচ বছর পর গণতন্ত্র এবং বহুদল ব্যবস্থা চালু হবে। পাঁচ বছরের মধ্যে নির্বাচন হবে না। কারণ অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, সশস্ত্র বিপ্লবের পর দেশে অস্ত্র থেকে যায় বিভিন্ন রকমের লোকের কাছে। অথচ আমরা দেখলাম এর উল্টোটি। এটা কেমন হলো। বঙ্গবন্ধু যা বলেছিলেন সে অনুযায়ী কাজ হচ্ছে না। দ্বিতীয় কারণ হলো, প্রধানমন্ত্রী যদি কেউ হন তো বঙ্গবন্ধুই হবেন। বঙ্গবন্ধুকে প্রধানমন্ত্রী করে তিনি উপপ্রধানমন্ত্রী হতে পারেন। আর উপপ্রধানমন্ত্রী হলে তো সৈয়দ নজরুল ইসলামই হবেন। কেননা, বঙ্গবন্ধু ছিলেন পার্লামেন্টের নেতা। আর সৈয়দ নজরুল ছিলেন উপনেতা। তাজউদ্দীন আহমদ ছিলেন তৃতীয় ব্যক্তি। তিনি এটা কেন করলেন? কমান্ড কাউন্সিল না করে তিনি নিজেকে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন। বঙ্গবন্ধু যদি সরকার প্রধান না হন, সেই সরকার দুর্বল সরকার হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : তাজউদ্দীন আহমদ শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী হবার জন্যই এই ষড়যন্ত্রটি করেছিলেন?

আবদুর রাজ্জাক : আমার ধারণা, তিনি মনে করেছিলেন বঙ্গবন্ধু আর ফিরে আসবেন না। সুতরাং তিনি প্রধানমন্ত্রী এবং মুক্তিযুদ্ধের নায়ক হিসেবে থাকবেন এবং এই বুদ্ধিটি অন্য জায়গা থেকে দেয়া হয়েছিল।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : বুদ্ধিটা কে দিয়েছিলেন?

আবদুর রাজ্জাক : আমার ধারণা আওয়ামী লীগের আমিরুল ইসলাম অথবা আরো কেউ এর পেছনে ছিলেন।

প্রশ্ন : ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামের স্বার্থটা কি ছিল?

আবদুর রাজ্জাক : নিশ্চয়ই কোন একটা মটিভ ছিল।

প্রশ্ন : সেটা কি আঁচ করতে পেরেছিলেন?

আবদুর রাজ্জাক : পরবর্তীকালে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে তারা আমেরিকান লবির লোক। আর এই আমেরিকান লবি কীভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধকে দেখেছে, সে তো বুঝতেই পারেন। এবং আজ আমার কাছে এটা পরিষ্কার যে, তারা প্রথম থেকেই চেষ্টা করেছে বঙ্গবন্ধু এবং তাজউদ্দীন আহমদের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টির। মতপার্থক্যটা প্রথমে ওখান থেকেই শুরু হয়।

প্রশ্ন : এখানে প্রচার আছে যে তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে আমেরিকার কোন সম্পর্ক ছিল না। এটা কিভাবে সম্ভব?

আবদুর রাজ্জাক : এখানেই কথা। তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে তখনও আমেরিকার কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু এই ব্যক্তিকে— এই আমিরুল ইসলামকে তিনি চিনতে ভুল করেছিলেন। তারপরেই এখান থেকে তার সঙ্গে (তাজউদ্দীন আহমদ) আমাদের চরম মতানৈক্য শুরু হয়ে যায়।

আমার চিন্তা হলো বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হবে, আমি তার মধ্যে থাকবো না। যা হয় হবে, আমি ভেতরে চলে যাব। যুদ্ধ করবো আমাদের তো স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের কর্মীরা ভেতরেই আছে। তাদের সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ করবো। রবকে (আসল আবদুর রব) বললাম, 'আমার সঙ্গে যাবে তুমি?' রব বললো, 'আপনার সঙ্গে আমিও আছি।' এরপর একটা পরিকল্পনা নিলাম যে, আমরা চলে যাব। শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান এবং তোফায়েল আহমদকে বললাম, 'আপনারা থাকেন।' আমরা চলে আসব, এটা ভেবে ওরা চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

প্রশ্ন : আপনি ভেতরে এসে যুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন? আপনি একা এবং আ স ম আবদুর রব?

আবদুর রাজ্জাক : হ্যাঁ, একদম ভেতরে এসে যুদ্ধ করতে চাইলাম। তখন ওরা আমাদেরকে নিয়ে রাতে চিত্তরঞ্জন সুতারের সঙ্গে বসলেন। কারণ, আমাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিচ্ছে। চিত্তরঞ্জন সুতার বললেন, আপনাদের মধ্যে মতপার্থক্য কেন হচ্ছে। আপনারা এক থাকেন। আপনারা সরকারের সঙ্গে কথা বলেন। ঠিক হলো, সরকারের সঙ্গে কথা বলবো।

প্রশ্ন : মিটিংয়ে আপনারা চারজনই ছিলেন— শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান, তোফায়েল আহমদ এবং আপনি?

আবদুর রাজ্জাক : হ্যাঁ, আমরা চারজন ছিলাম। আ স ম রবও ছিলেন। তিনি বললেন, (চিত্তরঞ্জন সুতার) সরকার আপনাদেরকেই তো চেনে। বঙ্গবন্ধু আপনাদের চারজনের নাম দিয়েছেন। আপনারাই তো যুদ্ধ করবেন। সরকার তো আপনাদেরকেই চেনে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : এরা আগে চিত্তরঞ্জন সুতারের সঙ্গে স্বাধীনতা সম্পর্কে কোন আলাপ আলোচনা হয়েছিল?

আবদুর রাজ্জাক : আমরা এর আগে তার কাছে লোক পাঠিয়েছিলাম। ডা. আবু হেনাকে পাঠিয়েছিলাম। ২৫শে মার্চের আগে পাঠান হয় তাকে। জানতে চেয়েছিলাম, আমাদের অস্ত্রের কি হবে? তখন তিনি (চিত্তরঞ্জন সুতার) বলেছিলেন যে সব রেডি হচ্ছে। তা আমাদের ওই বৈঠকে তিনি (চিত্তরঞ্জন সুতার) প্রস্তাব দিলেন, বললেন, 'তাহলে আপনাদের কথা বলি, আপনার কি বলেন?' আমি বললাম, আলাদা কিছু হলে আমি আছি। আমি ষড়যন্ত্রের সঙ্গে নেই।' তিনি বললেন, 'সরকারকে জিজ্ঞেস করি।' তখন ভারত সরকারের সঙ্গে তিনি আলাপ করলেন। এই আলাপের প্রেক্ষিতে একজন অফিসার এলেন। তিনি সিভিল ড্রেসেই এসেছিলেন। তখনও আমাদের পরিচয় হয়নি। জেনারেল উবানই এসেছিলেন।

প্রশ্ন : কলকাতার সেই বাড়িতে?

আবদুর রাজ্জাক : সেই বাড়িতে।

প্রশ্ন : কত তারিখে?

আবদুর রাজ্জাক : এপ্রিলের সতের বা আঠার তারিখটা ঠিক মনে নেই। তিনি আমাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাদের কি কোন পরিকল্পনা আছে?' তখন আমরা একটা খসড়া পরিকল্পনা তৈরি করলাম—সামগ্রিক পরিকল্পনা। আমাদের পরিকল্পনা দেখে তিনি খুব খুশি হলেন। বললেন, "এ নিয়ে আলাপ করতে হবে।" তিনি গিয়ে রিপোর্ট করলেন যে এরাই পারবে। তার বিষয় ছিল গেরিলা যুদ্ধ। তিনি গেরিলা যুদ্ধের লোক পেয়ে গেছেন। আমাদের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা সংবলিত রিপোর্ট ছিল। ভারত সরকার সেটা গ্রহণ করলেন। আমাদের পরিকল্পনার মূল কথা ছিল, এটা রাজনৈতিক যুদ্ধ এবং যুদ্ধটা রাজনৈতিকভাবে পরিচালিত করতে হবে, যাতে যুদ্ধটা আমাদের হাতে থাকে। যে কারণে আমরা অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারকে প্রস্তাবও দিয়েছিলাম যে, রিক্রুটমেন্টটা আমাদের হাতে থাকবে। রাজনৈতিক মটিভেশন আমরা দেবো। ট্রেনিংটা আপনাদের। এই ছিল আমাদের প্রস্তাব। কিন্তু অস্থায়ী সরকার গ্রহণ করেন নি। এই সব কারণেই আমাদের ভেতর মতবিরোধ দেখা দেয়।

প্রশ্ন : সরকার আপনাদেরকে ট্রেনিং দিতে চাইলেন কেন?

আবদুর রাজ্জাক : মূল কারণ হচ্ছে, আমরাই ছিলাম বঙ্গবন্ধুর মূল লক্ষ্যের সৈনিক। সেই সৈনিক হিসেবে যাদের নাম তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন, সে তো আমরা। শুধু আমাদেরকেই চেনে তারা, এ হলো এক নম্বর কারণ। দুই নম্বর হচ্ছে— আমরা যে রাজনৈতিক যুদ্ধটা করতে চেয়েছি সেটার ব্যাপারে তাদের বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছিলাম।

প্রশ্ন : ভারত সরকার মুখে সমাজতন্ত্রী ছিল বটে কিন্তু মূলত ছিল দক্ষিণপন্থী। সমাজতন্ত্রের ব্যাপারে আপনাদের যে রাজনৈতিক মটিভেশন ছিল তাতে তারা আপনাদেরকে কেন গ্রহণ করলো? তারা কি বুঝতে পারে নি?

আবদুর রাজ্জাক : হয়তো তারা আমাদের লাইনটা এতটা চিন্তা করেনি। তারা ভেবেছে এরা শেখ মুজিবের অনুসারী। এরা যাতে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়,

www.pathagar.com

সেটাও তাদের কাম্য ছিল। তাছাড়া তাদেরও তো নীতি ছিল সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা।

প্রশ্ন : সমাজতন্ত্রে আপনি ও সিরাজুল আলম খান বিশ্বাসী ছিলেন। শেখ ফজলুল হক মণি এবং তোফায়েল আহমদও কি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন?

আবদুর রাজ্জাক : শেখ ফজলুল হক মণির পরবর্তীকালের যেসব লেখা দেখেছি তাতে তিনি এ ব্যাপারে পরিষ্কার ছিলেন। তোফায়েল আহমদ অতটা পড়াশোনা করতেন না। আমাদের ভেতর সবচেয়ে তরুণ ছিলেন তিনি, অতটা পরিপক্কও ছিলেন না।

প্রশ্ন : মেজর জেনারেল উবান তার বইতে বলেছেন "যুব নেতারা বলেছেন যে ভারত সরকার নকশাল ও মার্কসবাদীদের ট্রেনিং ও অস্ত্র দিচ্ছে তাদের পঁচিশ বছরের অর্জিত সাফল্য নস্যাৎ করার জন্য" আপনারা তাকে কী এ কথা বলেছিলেন।

আবদুর রাজ্জাক : এ কথা ঠিক নয়। এটা তার নিজের বক্তব্য হতে পারে। কিন্তু আমাদের কথায় আমরা পরিষ্কার ছিলাম। আমাদের রাজনীতি ছিল স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্র, এ ব্যাপারে আমরা পরিষ্কার ছিলাম। আর একটা বিষয়— আন্তর্জাতিকভাবে আমাদের লাইনটা পরিষ্কার ছিল যে সোভিয়েত ইউনিয়নই সাম্রাজ্যবাদ প্রতিহত করতে পারে। সেই লাইনটিও আমাদের কাছে পরিষ্কার ছিল। এবং দেখা গেছে, চীন আমাদের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছে প্রত্যক্ষভাবে। সুতরাং, চীন বিরোধী মনোভাব আমাদের ছিল। সেখানেই আলোচনায় নকশালদের কথা এসেছে। যেহেতু, নকশালপন্থীরা স্বাধীনতা বিরোধী, তারা আমাদের বাধা দিয়েছে অনেক জায়গায় এবং তারা চীনপন্থী। সুতরাং, সেখানে তাদের সঙ্গে কিছুটা মতপার্থক্য আমাদের আছে। সে মতপার্থক্য রাজনৈতিক।

প্রশ্ন : নকশাল যাদের বলেছেন বা চীনপন্থী যাদের বলেন,— তারাও কিন্তু একই সময়ে ভেতরে থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়েছে।

আবদুর রাজ্জাক : এখানে পার্থক্যটা আপনাকে বুঝতে হবে। প্রথমে কিছু কিছু লোক, নকশালরা নয়—চীনপন্থীদের মধ্যে কিছু লোক যুদ্ধ করেছে। কিন্তু পরবর্তীকালে চীন সরাসরি বিরোধিতা শুরু করলে তখন তাদের অবস্থানও ধীরে ধীরে পাল্টাতে শুরু করে। তখন তাদের সঙ্গে আরো ব্যাপক মতপার্থক্য আমাদের শুরু হয়ে যায়। সেই কারণেই, প্রাথমিকভাবে শুরু করলেও তারা,—যেমন, সর্বহারা পার্টি স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলেছে, পরে কিন্তু তারা স্বাধীন বাংলাদেশকে গ্রহণ করেনি। তারা অর্থাৎ পূর্ববাংলা সর্বহারা পার্টি এবং সাম্যবাদীরা মানে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী); আবদুল হক-মোহাম্মদ তোয়াহা যখন এক সঙ্গে ছিলেন, তখন তারা পরিষ্কার বলেছিলেন দেশ স্বাধীন হয়নি অর্থাৎ স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছে এবং চীনের নির্দেশেই তারা এসব কাজ করেছে।

প্রশ্ন : কিন্তু এ তো সত্য যে তারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধেও লড়েছে।

আবদুর রাজ্জাক : প্রথম দিকে লড়েছে। পরে কিন্তু তারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। পাকবাহিনী অস্ত্র তো দিয়ে গেছে তাদের কাছে। আপনি শুনে অবাক হবেন যে অস্ত্র দিয়ে গেছে মোহাম্মদ তোয়াহার গ্রুপের লোকদের হাতে— যারা এই গ্রুপের চীনপন্থী তাদের কাছে, যাতে আমাদের সঙ্গে লড়াই বাধে। এই

www.pathagar.com

লাইনটাকেই তারা ঢোকানোর চেষ্টা করেছে। এটা প্রমাণিত হয়েও গেছে। এখানে, স্বাধীনতার পর যখন জুলফিকার আলী ভুট্টো আসেন, সঙ্গে নিয়ে আসেন চল্লিশজন লোক। বিমান থেকে নেমেই তারা বিভিন্ন জায়গায় গেছেন। তারা খোঁজ করেছেন মোহাম্মদ তোয়াহা কোথায় থাকেন। মশিহুর রহমান[১] কোথায় থাকেন। তারা খোঁজ করেছেন অলি আহাদের,[২] জানতে চেয়েছেন কোথায় থাকেন। বঙ্গবন্ধুর কাছে রিপোর্ট যায় এই লোকগুলোকে এরা খুঁজতেন। জুলফিকার আলী ভুট্টোর সম্মানে এক ভোজ দেয়া হয়। ভোজ সভায় আমার পাশে বসেছিলেন ভুট্টোর এক মন্ত্রী। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন এখন মোহাম্মদ তোয়াহার অবস্থাটা কী? মশিহুর রহমান, অলি আহাদের অবস্থাটা কি? এখন এদের সঙ্গে কি ধরনের আচরণ করছি— এইসব। তারা এই সমস্ত লোক সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন। সরকারের কাছে এসবের ওপর রিপোর্ট আছে শুনেছি। কিন্তু আমি তো একটা সাক্ষী। আমার কাছে এসব প্রশ্ন করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে দেখা গেল, স্বাধীনতার পর আমাদের বিরুদ্ধে সোজা বিদ্রোহ ঘোষণা করলো যে অস্ত্র নিয়ে, সেগুলো পাকিস্তানিরা পরিকল্পনা মাফিকই দিয়ে গেছে। যেগুলো ফেলে গেছে তারা, সে সম্পর্কে অন্য কথা। রাজশাহীর তানোর অঞ্চলে টিপু বিশ্বাসের সঙ্গে সরাসরি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর যুদ্ধ হয়েছে। সুতরাং, এইখানে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে তারা ছিল। অবশ্যি প্রাথমিকভাবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। যেমন, মশিহুর রহমান ভারতে গিয়েছিলেন, আবার ফিরে আসেন। ফিরে এসে পাকিস্তানের সঙ্গে সহযোগিতা করেন— খোলাখুলি সহযোগিতা। এরা সব চীনের লোক। পরবর্তীকালে চীন এদেরকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে একত্রিত করেছে। তারা বলেছে বাংলাদেশ ভারতের একটি আশ্রিত রাষ্ট্র হবে, ভারত গ্রাস করে নেবে। তোমরা ওদেরকে সহযোগিতা দিও না অর্থাৎ পাকিস্তানি লাইনে তাদেরকে চালিত করেছে। সুতরাং, সেই দিক দিয়ে নকশালদের ব্যাপারে আমাদের অ্যালার্জি আছে ঠিকই যে, তারা স্বাধীনতার বিরুদ্ধে— সেই কারণে নয় যে তারা মার্কসবাদী। আমরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ওপর পড়াশোনা করেই সমাজতন্ত্র করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলাম। সেই কারণে মস্কোপন্থীদের সঙ্গে আমাদের কোন মতানৈক্য ছিল না। তবে বলতে পারেন, কেন আপনারা তাদেরকে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারে নিলেন না। সেটা অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের ব্যাপার, তাজউদ্দীন আহমদের সরকারের ব্যাপার। এখানে আমাদের করণীয় কিছুই ছিল না। মস্কোপন্থীদের সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষও হয়নি।

প্রশ্ন : কিন্তু জেনারেল উবান বলেছেন, 'আপনারা তাকে বলেছেন যে, ভারত সরকার নকশাল ও মার্কসবাদীদের অস্ত্র দিচ্ছে আপনাদের পঁচিশ বছরের অর্জিত সাফল্য নস্যাৎ করার জন্য।' আপনারা তাকে কি এ কথা বলেন নি?

আবদুর রাজ্জাক : কথাটা আমরা তাকে কখনোই এভাবে বলিনি। আমরা আমাদের কথাটাই বলেছি। নকশালরা কিছু কিছু অস্ত্র নিয়েছে। সেটা নিয়ে তারা তো আমাদের বিরোধিতা করেছে। স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছে।

---

১. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী) নেতা, পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সিনিয়র মন্ত্রী।

২. পরবর্তীকালে ডেমোক্রেটিক লীগ নেতা।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : মঈদুল হাসান তার 'মূলধারা '৭১' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আপনারা অর্থাৎ মুজিব বাহিনী নেতারা নাকি এই রকম প্রচারণা চালিয়েছেন যে, তাজউদ্দীন আহমদ অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী থাকলে দেশ স্বাধীন হবে না। তাজউদ্দীন আহমদ শেখ মুজিবের গ্রেফতার হবার কারণ...

আবদুর রাজ্জাক : তিনি একজন বিভ্রান্ত মার্কসবাদী এটা প্রমাণিত এবং আজকেও হচ্ছে। এক সময় মার্কসবাদী ছিলেন। ছাত্র ইউনিয়ন করতেন এবং কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। পরবর্তীকালে যা দেখা যাচ্ছে তাতে তো তিনি বিভ্রান্তই বটে। তাজউদ্দীন আমাদের ওপর ভর করেছিলেন। তাকে দক্ষিণ দিকে নেয়ার চেষ্টা করেছেন। ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামের মতোই তিনি একজন। মঈদুল হাসানের পরিচয় তো এখন পরিষ্কার আমাদের কাছে যে তিনি আমেরিকান লবির লোক। দক্ষিণপন্থী লবির লোক। যদিও ভাব-ভঙ্গিটা প্রগতিশীল। এ রকম অনেকেই কিন্তু ধরা পড়েননি। যেমন এনায়েতুল্লাহ খান[৩] বহুদিন ধরা পড়েননি। এখন তো পরিষ্কার। এ ধরনের মার্কিনপন্থী কমিউনিস্ট বাংলাদেশে অনেকেই আছেন। তার মধ্যে মঈদুল হাসানও একজন। তিনি তাজউদ্দীন আহমদের ওপর ভর করেছিলেন। তাজউদ্দীন আহমদ ও বঙ্গবন্ধুর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টিকারীদের মধ্যে তিনিও একজন। মঈদুল হাসান, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম— এরাই মূল ভূমিকা পালন করেছেন। তাজউদ্দীন আহমদকে এরা বলেছেন, 'আপনিই সব।' এমন কি তাকে এইভাবে মটিভেট করা হয়েছে যে, 'শেখ মুজিব ধরা দিয়েছেন। শেখ মুজিব আত্মসমর্পণ করেছেন। শেখ মুজিব রাজাকার।' এই ধরনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথাবার্তা বলেছেন তারা। সেক্ষেত্রে এটা বোঝা যায় যে শেখ মুজিবের প্রতি তাদের যে অতীত আক্রোশ, এক সময় বিভ্রান্ত মার্কসবাদী হিসেবে যে রকমের অ্যাপ্রোচ (Approach) ছিল, পরবর্তীতে মার্কিনপন্থী লাইনেও ছিল সেই একই রকমের অ্যাপ্রোচ। সেটা হলো শেখ মুজিবকে খাটো করা, তার বিরুদ্ধাচরণ করা। বঙ্গবন্ধু এবং তাজউদ্দীন আহমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন খোন্দকার মোশতাক, চাষী মাহবুব আলম, তাহেরউদ্দীন ঠাকুর যতটা দায়ী—এরাও, এই আমিরুল ইসলাম, মঈদুল হাসান— এই ধরনের মার্কিনপন্থী কমিউনিস্টরাও ততটা দায়ী।

প্রশ্ন : তাজউদ্দীন আহমদকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়ছিল, মঈদুল হাসান তার 'মূলধারা '৭১'-এ কথা বলেছেন। এ কথা কতটুকু সত্য?

আবদুর রাজ্জাক : এটা আমাদের জানা নেই এবং এ তার একটি বানোয়াট, কল্পিত ষড়যন্ত্র। এসব তিনি করেছেন যাতে আমাদের সঙ্গে অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর অনুসারীদের সঙ্গে তাজউদ্দীন আহমদের দ্বন্দ্ব বাধে। তিনি যাতে আমাদের অবিশ্বাস করেন। বঙ্গবন্ধু এবং তাজউদ্দীন আহমদের ভেতরকার দ্বন্দ্ব এরাই সৃষ্টি করেছেন। তারা তাকে নিতে নিতে দক্ষিণপন্থী লবিতে নিয়ে গিয়েছিলেন। যেখানে আমরা সবাই বাকশাল পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করি, সেখানে তাজউদ্দীন আহমদ এলেন না।

---

৩. 'ইংরেজি সাপ্তাহিক *হলিডে* সম্পাদক, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাসনামলে মন্ত্রী। প্রেসিডেন্ট এরশাদ সরকারের রাষ্ট্রদূত।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : তানদুয়া গেরিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-প্রধান করা হয় হাসানুল হক ইনুকে। অথচ ইনু ওই সময় ছাত্রলীগের কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন না। কেন তাকে কেন্দ্র প্রধান করা হলো?

আবদুর রাজ্জাক : এটা করা হয়েছিল এই জন্য যে হাসানুল হক ইনু আমাদের স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের একজন ছিলেন এবং সেখানে যারা ছিলেন, তাদের মধ্যে সাংগঠনিক যোগ্যতা তার কমবেশি অধিক ছিল।

প্রশ্ন : আপনাদের চারজনের মধ্যে অর্থাৎ মুজিব বাহিনী নেতা চতুষ্টয়ের ভেতর কোন মর্তাদর্শগ বিরোধ ছিল কি?

আবদুর রাজ্জাক : তখনকার অবস্থায় আমাদের মধ্যে মতাদর্শগত বিরোধী ছিল না। হ্যাঁ, কিছুটা নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব ছিল এবং সেটা শেখ ফজলুল হক মণি ও সিরাজুল আলম খানের মধ্যে। আমি যতটা পারি সেই দ্বন্দ্ব নিরসনের চেষ্টা করেছি। আপনি জেনারেল উবানের বইতে দেখবেন যে তিনি বলেছেন, রাজ্জাক সব সময় চেষ্টা করেছেন দু'জনের মধ্যে সমঝোতা স্থাপনের।

প্রশ্ন : নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব না মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব?

আবদুর রাজ্জাক : খুব একটা মতাদর্শগত নয়— নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব।

প্রশ্ন : তানদুয়ায় ট্রেনিং ক্যাম্পের সদস্যরা এক পর্যায়ে ট্রেনিং বন্ধ করে দেন— এ সম্পর্কে কি জানেন?

আবদুর রাজ্জাক : ট্রেনিং বন্ধ হয়ে যায় অন্য কারণে। একবার হয়েছিল খাবার দাবার নিয়ে একটা গোলমালের কারণে।

প্রশ্ন : আমি যেটা শুনেছি, তা হলো রাজনৈতিক মটিভেশন দেয়ার প্রশ্নে,—সমাজতন্ত্রের ওপর প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখা নিয়ে।

আবদুর রাজ্জাক : পরবর্তীকালে এটা হয়েছিল। আমরা গিয়ে বলেছি, তোমাদের সঙ্গে আমাদের যে শর্ত— তোমাদের কাজ ট্রেনি দেয়া আর মটিভেশন কি হবে, সেটা আমাদের। মেজর মালহোত্রা সমাজতন্ত্রের ওপর বক্তব্য রাখতে নিষেধ করেছিলেন।

প্রশ্ন : নুরে আলম সিদ্দিকীকে মুজিব বাহিনীর নেতৃত্বে নিলেন না কেন?

আবদুল রাজ্জাক : ওটাতো একটা লস্ট কেস (Lost Case) ছিল।

প্রশ্ন : কলকাতার হিন্দুস্থান ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার এবং মুজিব বাহিনী নেতাদের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠক সম্পর্কে বলুন।

আবদুর রাজ্জাক : আমরা যখন দুই তিন ব্যাচের ট্রেনিং দিয়ে দিয়েছি, এই বৈঠকটি তখন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন : কোন মাসে?

আবদুর রাজ্জাক : বৈঠক দুটো হয়। একটা অগাস্ট '৭১-এ এবং আরেকটি সেপ্টেম্বর '৭১-এ। এর আগে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার কিছুই জানতেন না। তখন অস্থায়ী সরকারের সঙ্গে আপোষ করার জন্য ডি পি ধর মধ্যস্থতা করলেন। একটা পর্যায়ে এসে তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে বৈঠক করলেন। আমরা বললাম, ঠিক আছে।

www.pathagar.com

আমরা তো আগেই বলেছি সরকারকে আমরা মানি। কিন্তু সরকারের সব কার্যক্রম আমরা মানতে পারি না। আমরা আমাদের মতো আছি।

প্রশ্ন : এই বৈঠকেই কি শাহজাহান সিরাজকে মুজিব বাহিনী এবং অস্থায়ী সরকারের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য লিয়াঁজো অফিসার করা হয়?

আবদুর রাজ্জাক : না, লিয়াঁজো নয়। এসব সিরাজুল আলম খানের কার্যকলাপের একটি অংশ। তখন থেকে তার কিছু কিছু সন্দেহজনক কাজ শুরু হয়ে গেছে। তিনি তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে শাহজাহান সিরাজকে দিয়ে রেখেছিলেন। মুজিব বাহিনী নেতাদের সম্মতিতেই তিনি এটা করেছিলেন।

প্রশ্ন : কেন সিরাজুল আলম খান এটা করেছিলেন?

আবদুর রাজ্জাক : তিনি তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে একটা আলাদা লাইন রাখতে চেয়েছিলেন।

প্রশ্ন : স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন মুজিব বাহিনী সদস্যরা আওয়া লীগ বিরোধী এবং কমিউনিস্টদের হত্যা করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। আপনি কি বলেন?

আবদুর রাজ্জাক : এ অভিযোগ সঠিক নয়। আমরা কমিউনিস্টদের হত্যা করার নির্দেশ দেইনি। আমাদের চারজনের বৈঠকে এ ধরনের কোন প্রশ্নই ওঠেনি। কোন সিদ্ধান্ত নেবার প্রশ্ন আসলে আমাদের চারজনের বৈঠক হতো। হ্যাঁ, আমাদের সিদ্ধান্ত ছিল যদি অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের বাহিনী আমাদের ওপর আক্রমণ করে তাহলে প্রথমে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবো। এড়াতে না পারলে প্রতিরোধ করবো। কিন্তু কমিউনিস্ট বাহিনীর সঙ্গে কোন সংঘর্ষ হয়নি। আর কমিউনিস্ট বাহিনী তো ভেতরে ঢুকতে পারেনি। তখনতো তারা ট্রেনিং নিচ্ছে। কমিউনিস্ট বাহিনী আসলে যুদ্ধে যেতেই পারেনি। আমাদের বাহিনী ট্রেনিং নিয়ে ভেতরে ঢুকছে। কাজ কেবল শুরু করেছি। আমরা তো সর্বাত্মক যুদ্ধ করতে পারিনি। আমাদের পরিকল্পনা ছিল— মুজিব বাহিনী প্রথমে ভেতরে ঢুকবে। তারপর অস্ত্রশালা তৈরি করবে। এরপর আশ্রয় গড়ে তুলবে। তারপর সংগঠন গড়ে তুলবে,— মুজিব বাহিনীর সংগঠন। এরপর থানা কমান্ড করবে। থানা কমান্ড করার পর প্রথম কার্যক্রমটা হবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহযোগী অর্থাৎ রাজাকারদের ওপর হামলা চালাবে, তাদের সরবরাহ লাইনের ওপর হামলা চালাবে। গেরিলা কৌশলে ওদের দুর্বল করে দেবে। সর্বশেষ হলো, ওরা যখন দুর্বল হয়ে পড়বে, তখন পাকবাহিনীর ওপর আঘাত হানো। আমরা তখন এ কাজই করছি। প্রাথমিক কাজ আমাদের মোটামুটি হয়ে গিয়েছিল। সংগঠন আমাদের গড়ে ওঠেছিল। আমাদের রিক্রুটমেন্ট হয়ে গিয়েছিল। আমাদের ট্রেনিংপ্রাপ্ত সদস্যরা যেখানে যেতে পেরেছে, সেখানেই থানা কমান্ড হয়ে গেছে। আমরা জনগণের সাথে মিলে যুদ্ধ করছি। কিছু কিছু রাজাকারও খতম হচ্ছে। কিন্তু মূল জায়গাটা মানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সামনে না পড়লে, যুদ্ধ করিনি। দু'চার জায়গায় সামনে পড়ে গেছি, লড়াই হয়েছে। আমরা তো যুদ্ধ শুরুই করিনি। আমাদের তো পাঁচ বছরের পরিকল্পনা। প্রথম বছরে কী করব, তৃতীয় এবং চতুর্থ বছরে কী করবো। তারপর সরকার গঠন করবো। এই ছিল আমাদের সামগ্রিক পরিকল্পনা। আমরা যদি সফল হতাম তাহলে কোন ঘাস থাকতো না, আগাছা

www.pathagar.com

থাকতো না। সমাজদেহ থেকে আগাছা উপড়ে ফেলতাম। প্রতিবিপ্লবীদের থাকতে হতো না। হয় মটিভেট হয়ে এদিকে আসতো হতো, নচেৎ নিশ্চিহ্ন হতে হতো।

প্রশ্ন : জাসদের লোকজন অভিযোগ করে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন চট্টগ্রামের ছাত্রলীগ নেতা মুক্তিযোদ্ধা স্বপন চৌধুরীকে শেখ ফজলুল হক মণি গ্রুপের লোকজন হত্যা করেছে। এ অভিযোগ সম্পর্কে আপনি কী বলেন?

আবদুর রাজ্জাক : আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, এটার মধ্যে শেখ ফজলুল হক মণির কোন হাত ছিল না। আমার কাছে এ রকম একটি খবর আছে যে তাকে ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু পাল্টাটাও শোনা যায় যে ওখানকার রাজাকাররা ধরিয়ে দেয়। সেই ছেলেটা ছিল একটা ব্রিলিয়ান্ট ছেলে। সে আমার হাতের রিক্রুট ছিল। খুবই ভাল ছেলে ছিল।

প্রশ্ন : তাকে কি ধরিয়ে দেয়া হয়?

আবদুর রাজ্জাক : আমি এটা সঠিক বলতে পারবো না। একটা অভিযোগ আছে সে ধরিয়ে দেয়া হয়েছিল।

প্রশ্ন : এই অভিযোগটা কেন?

আবদুর রাজ্জাক : শেখ ফজলুল হক মণি ও সিরাজুল আলম খানের দ্বন্দ্বটা ততদিনে শুরু হয়ে গেছে— নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব।

প্রশ্ন : ১৯৭২ সালে শেখ মুজিবের কাছে মুজিব বাহিনী পুনরুজ্জীবিত স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে এই প্রস্তাব রাখে যে বাংলাদেশ সরকার ভেঙ্গে দিয়ে জাতীয় বিপ্লবী সরকার গঠন করা হোক এবং মুক্তিযুদ্ধে অংগ্রহণকারী সকল শক্তিকে জাতীয় বিপ্লবী সরকারে অন্তর্ভুক্ত করা হোক। শেখ মুজিব এ প্রস্তাব নাকচ করেছিলেন, সত্য কি?

আবদুর রাজ্জাক : আমরা জাতীয় বিপ্লবী সরকারের প্রস্তাব দিয়েছিলাম। এটা সিরাজুল আলম খান আর আমি মুজিব বাহিনীর পক্ষ থেকে দিয়েছিলাম। বঙ্গবন্ধু এ প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। কারণ, এ প্রস্তাব গৃহীত হবার অনুকূল অবস্থা তখন ছিল না। কেননা, আগেই ভারতের সঙ্গে আমাদের একটা চুক্তি হয়েছিল। দুর্বলতা ওখানেই ছিল। সেই চুক্তি পার্লামেন্টারি সরকারের চুক্তি।

প্রশ্ন : এরপর মুজিব বাহিনী শেখ মুজিবের কাছে ৬টি প্রস্তাব রাখে, সেগুলো কি?

আবদুর রাজ্জাক : এটা হলো যার যার বানান কথা। মুজিব বাহিনীর তরফ থেকে আর কোন প্রস্তাব যায়নি। ওটাই মানে ওই জাতীয় বিপ্লবী সরকারের প্রস্তাবটি ছিল মূল প্রস্তাব। যদি কেউ আর কোন প্রস্তাব দিয়ে থাকে তো ব্যক্তিগতভাবে দিয়েছে।

প্রশ্ন : সিরাজুল আলম খানের গ্রুপ থেকে একটা প্রস্তাব গিয়েছিল বলে কি মনে করেন?

আবদুর রাজ্জাক : যেতে পারে। আমি তা জানি না। যে কথা নিয়ে আমাদের ভেতর বিভেদ দেখা দিল তা হলো, তিনি বলেন, আমরা বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে নই। অথচ ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু হয়ে গেছে এবং তিনি কিছু তরুণকে দিয়ে করাচ্ছেন। সেটা টের পেয়ে আমি তাকে ধরলাম। বললাম, "ঘটনা কি? বসতে হয় আমাদের।" স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের হাই কমান্ড আমরা বসলাম, আমরা তিনজন— সিরাজুল আলম খান, কাজী আরেফ আর আমি। ঠিক করলাম আমরা বঙ্গবন্ধুর কাছে যাব। সিরাজুল

www.pathagar.com

আলম খান রাজি হলেন না। বললেন, 'তোমরা থাক। আমি গিয়ে বলে আসি।' আমরা বললাম, 'কেন? আগে যখন যেতাম, সে সময় আমি ছাড়া আমি যাননি। আমি ছাড়া কোন কথা বলেননি। আজকে আপনি একা একা কথা বলবেন কোন অধিকার বলে?' বললাম, 'আমিও থাকবো আজকে আমি শুধু নয়, আরেফও থাকবে। আরেফ আগে তো যেতো না। আজ তিনজনে যাব।' অবশেষে আমরা যেহেতু দুই ভোট একসঙ্গে, বাধ্য হয়ে মানতে হলো তাকে। আমরা তাকে প্রোগ্রাম করতে বললাম। প্রোগ্রাম করার দায়িত্ব নিয়ে তিনি পালিয়ে গেলেন খুলনায় কোথাও আর পাই না তাকে খুঁজে।

প্রশ্ন : তাহলে প্রস্তাবটা দেবার একটা চিন্তা-ভাবনা করা হয়েছিল? সেটা তিনি করেন নি।

আবদুর রাজ্জাক : করেন নি শুধু— তিনি পালিয়ে গেলেন এবং এটাই হলো ষড়যন্ত্রের মূল। সাতদিন হয়ে গেল তার খোঁজ নেই। তাকে খুঁজে না পাওয়া গেলে সিদ্ধান্ত তো আমাকে একটা নিতে হবে। কারণ, তখন তো ছাত্রলীগ ভাগ হয়ে গেছে। আমি কোন দিকে যাব? আমি দেখছি তিনি আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছেন। নিশ্চয়ই তিনি একটা মটিভ নিয়ে কাজ করছেন।

প্রশ্ন : তার উদ্দেশ্যটা কি ছিল বলে মনে করেন?

আবদুর রাজ্জাক : ইতোমধ্যে আমি খবর পেয়ে গেছি যে তিনি ট্রটস্কি লাইন অনুসরণ করছেন এবং ভারতে যতদিন ছিলেন, যুদ্ধে তিনি যান নি। কলকাতাতেই অধিকাংশ সময় ছিলেন। ওখানে তার যে ক্যাম্প ছিল— শিলিগুড়িরা পাংগা ক্যাম্প, সে ক্যাম্পের ইনচার্জ মনিরুল ইসলাম ওরফে মার্শাল মণি আর মান্নানকে দায়িত্ব দিয়ে তিনি এসে কলকাতাতেই থাকতেন। কলকাতায় কোথায় কি করতেন, কাউকে জানতে দিতেন না। পরবর্তীকালে খবর পাওয়া গেল তিনি নকশালদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। এসইউসি'র (সোসালিস্ট ইউনিটি সেন্টার) সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। জয়প্রকাশ নারায়ণ, (সোসালিস্ট নেতা) যিনি মুখে বলতেন সমাজতন্ত্রের কথা, আসলে দক্ষিণপন্থী লোক; তার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। এসব খবর পরবর্তীকালে পেয়েছি।

প্রশ্ন : তাহলে বলছেন যে, ১৯৭২ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের ভেতর ভারতে বসে জয়প্রকাশ নারায়ণ ও এসইউসি'র শিবদাস ঘোষ এবং বামপন্থী বলে পরিচিত অন্যদের সঙ্গে সিরাজুল আলম খানের যোগাযোগ ছিল। সেটা কখনো আপনাদের জানান নি তিনি।

আবদুর রাজ্জাক : জানান নি।

প্রশ্ন : ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে স্বাধীন বাংলাদেশে ছাত্রলীগের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রলীগ দুভাগ হয়ে যায়। এর কারণ কি?

আবদুর রাজ্জাক : ছাত্রলীগের বিভেদের কারণ হচ্ছে, আমরা সবাই তাড়াতাড়ি চলে এলাম কলকাতা থেকে কিন্তু সিরাজুল আলম খান এলেন বেশ কিছুদিন পর। তার আসার পরই হঠাৎ করেই কিছু কিছু কথা শুরু হয়ে গেল বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে, ... ছাত্রলীগের ছেলেদের মধ্যে। সেটা হলো, শেখ মুজিব সমাজতন্ত্র করতে পারবেন না। সুতরাং আমাদেরকে নিজস্বভাবে করতে হবে। আ স ম আবদুর রব চৌমুহনীতে গিয়ে বক্তৃতা করলেন। বললেন, "পরাধীন দেশ স্বাধীন হয়েছে। এবার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হবে। সে

www.pathagar.com

বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবেন একজন যুব নেতা। আপনারা তার অপেক্ষা করুন। তিনি আসবেন আপনাদের সামনে।" এ সব শুরু করলেন। আসলে তার নেতৃত্ব এবং ভাবমূর্তি তৈরিতে নেমে পড়লেন। আমি ধারণা করি, এর পেছনে একটা মটিভ আছে। সেই মটিভ ধরা পড়ে অনেক পরে। দেখলাম পিটার কাসটার্সের সঙ্গে তার সংযোগ, যখন দেখলাম পশ্চিম বাংলার অতি বামদের সঙ্গে তার যোগসূত্র। যাদের সঙ্গে ট্রটস্কিপন্থীদের যোগাযোগ, শেষ পর্যায়ে যোগসূত্র রয়েছে আন্তর্জাতিক সোসালিস্টদের সঙ্গে—যারা সিআইএ অরগানাইজড, তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই সবের সঙ্গে তার সম্পর্ক দেখা গেল পরবর্তীকালে। আমি তখন বুঝতে পারলাম তিনি একটা উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছেন। আমার কাছে খবর এল কমরুদ্দিন আহমদ বললেন, 'ও তো ট্রটস্কি লাইনের'। আর ট্রটস্কি লাইন সম্পর্কে আমার তো পরিষ্কার ধারণা আছে—এ তো সিআইএ-র' লাইন। তখন আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম। অবস্থা তখন এমন—যুদ্ধ ফেরত তরুণদের রক্ত টগবগ করছে। আর সেভাবে তো বিপ্লবী সরকার হয় নি। একটা সাধারণ পার্লামেন্টারি সরকার। সেখানেও কিছু গোলমাল শুরু হয়েছে। তখন ওই ছেলেদের বোঝান সহজ হয়েছে যে এদেরকে দিয়ে হবে না। ছেলেরা কিন্তু অত্যন্ত সাচ্চা মনে সমাজতন্ত্র করার জন্য সমাজ বিপ্লব করার জন্য তৈরি হয়েছিল। অথচ এই সিরাজুল আলম খান আর আমাকে ডেকেই বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "অস্ত্র জমা দিও না সব। যেগুলো রাখার দরকার সেগুলো রেখে দাও। কারণ, সমাজ বিপ্লব করতে হবে। প্রতিবিপ্লবীদের উৎখাত করতে হবে। সমাজতন্ত্রের দিকে যেতে হবে।" এটা আমাদের পরিষ্কারভাবে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন।

প্রশ্ন : আপনারা, চার যুবনেতা জেনারেল উবানকে বলেছিলেন যে একটি ভারতীয় বিলাসবহুল হোটেলে নকশালপন্থীদের সঙ্গে ভারতীয় অফিসারদের আলাপ-আলোচনা করতে দেখেছেন। সম্ভবত ওই হোটেলে তাদেরকে রাখা হয়েছিল। তাদেরকে ট্রেনিং ও অস্ত্র দেয়া হয়েছিল। ট্রেনিং প্রদানের জায়গার নামও আপনারা উল্লেখ করেছিলেন জেনারেল উবানের কাছে। এই নকশাল নেতারা কারা এবং ট্রেনিং প্রদানের জায়গাটা কোথায় ছিল? কেন হোটেলে ছিলেন তারা?

আবদুর রাজ্জাক : এ সম্পর্কে আমি কিছু জানি না। এই সময়টা হতে পারে যখন আমি ট্রেনিং ক্যাম্পে ছিলাম। আমি তো মূল ক্যাম্পে ছিলাম— যেখানে মুজিব বাহিনীর ট্রেনিং দেয়া হত। আমি তেইশ দিন প্রথম ব্যাচের সঙ্গে ক্যাম্পে ছিলাম। সেই সময় এ কথা হয়তো হতে পারে।

প্রশ্ন : আপনারা চার নেতা কি ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

আবদুর রাজ্জাক : আমি নিয়েছিলাম পুরো ট্রেনি। ওরা নিয়েছিলেন প্রাথমিক ট্রেনিং।

প্রশ্ন : মুজিব বাহিনীর তহবিল ভারত সরকার কিভাবে দিতেন? আলাদা আলাদাভাবে সেক্টরভিত্তিক চারজনের হাতে না একজনের হাতে?

আবদুর রাজ্জাক : না। যার যার সেক্টর তার তার হাতেই দিতেন।

টেপকৃত : ২ জুন, ১৯৮৯।

www.pathagar.com

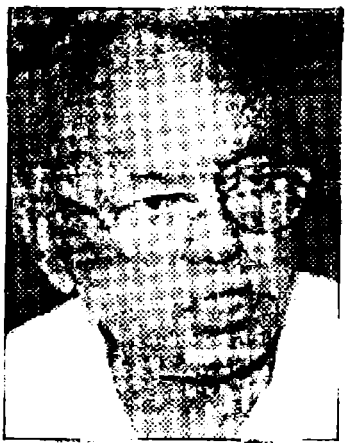

তোফায়েল আহমদ

সাংগঠনিক সম্পাদক, আওয়ামী লীগ, মুজিব বাহিনী নেতা চতুষ্টয়ের অন্যতম

প্রশ্ন : আপনি স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদে ছিলেন না কেন?

তোফায়েল আহমদ : এ প্রশ্নের উত্তর আমি কিভাবে দেব— বিপ্লবী পরিষদে আমি ছিলাম না, এ কথা তো ঠিক নয়। কারণ, আপনারা জানেন যে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদেরই চূড়ান্ত রূপ হল বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স—বিএলএফ। পরবর্তীকালে যার নাম হল মুজিব বাহিনী। আমরা চারজন—শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক এবং আমি—আমরা গঠন করি এই মুজিব বাহিনী। স্বাধীনতার জন্য যুব সমাজ এবং ছাত্র সমাজকে সংগঠিত করা, এসব দায়িত্ব জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আমাদের চারজনের ওপরই ন্যস্ত করেছিলেন। আজকে যারা এই বিপ্লবী পরিষদ সম্পর্কে ইন্টারভিউ দেন, বিভিন্ন খবরের কাগজে যাদের নাম দেখি তারা ওই সময় তো খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন না। কিন্তু তাদের ইন্টারভিউতে মনে হয় তারাই ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ এবং যারা গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন তাদের কোন ভূমিকাই ছিল না। এইভাবে আমাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস বিকৃত করা হচ্ছে। আসলে ১৯৬২ সালে আমরা যখন বরিশাল বিএম কলেজে পড়ি, তখন আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার একটি লিফলেট পাই এবং আমরা সেটা বিলি করি এবং তার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। কারণ, আপনারা জানেন যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বঙ্গবন্ধু কিন্তু পাকিস্তানকে মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেননি। যার জন্য ১৯৪৭ সালের পরেই তিনি তখনকার পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ গঠন করেন এবং ছাত্রলীগ গঠনের মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে তিনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু করেন। যার চূড়ান্ত রূপ নেয়া শুরু করে ১৯৬২ সালে এবং ১৯৬২ সালেই তিনি বাংলাদেশকে মুক্ত করার জন্য যেসব রাষ্ট্রের সাহায্য-সহযোগিতা গ্রহণের চেষ্টা করেছিলেন তার মধ্যে ভারতের নাম করা যায়। তখন তার নির্দেশে সারা বাংলাদেশে আমরা লিফলেট ছড়াই এবং যুব সমাজে তার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন শেখ ফজলুল হক মণি। আজকে শেখ ফজলুল হক মণির নাম নেই। আজ সেখানে কেউ কেউ বিবৃতিতে সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক এবং কাজী আরেফ আহমেদের নাম বলছেন। কাজী আরেফ আহমেদ তখন তো কলেজের ছাত্র ছিলেন। তারা দুই তিনজনে বসে কোন একটা আলাপ করলে সেটাই বিপ্লবী পরিষদ

www.pathagar.com

ছিল। আমার মনে হয় তারা—কাজী আরেফই এটা বলতে পারেন। অথচ ছাত্রলীগের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক যারাই হয়েছেন, তাদের ওপরেই বঙ্গবন্ধু ধাপে ধাপে দায়িত্ব দিয়েছেন। কাজী আরেফ ছাত্রলীগের সে ধরনের নেতা,—সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন না।

প্রশ্ন : তাহলে ১৯৬২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ডাক সম্বলিত একটি লিফলেট পেয়েছিলেন, এটা সত্য?

তোফায়েল আহমদ : হ্যাঁ সত্য। ১৯৬২ সালে আমরা সেই লিফলেট পাই। আমরা তখন বরিশাল বিএম কলেজের ছাত্র।

প্রশ্ন : স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ নামক কোন সংগঠনের অস্তিত্ব ছিল বলে কি আপনি জানতেন?

তোফালেল আহমদ : স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ নামে কোন কিছু গঠন করা হয়নি। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আমরা যে যেখানে ছিলাম সেখান থেকে স্বাধীনতার প্রক্রিয়া শুরু করি।

প্রশ্ন : যেখানে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য মুক্তিবাহিনী গঠন করেন, সেখানে আপনারা মুজিব বাহিনী গঠন করলেন কেন? ভারত সরকার আপনাদেরকে ট্রেনিং এবং অস্ত্র দিতে চাইলই বা কেন?

তোফায়েল আহমদ : এটাই মূল, অরিজিনাল। এটারই ট্রেনিং হবার কথা ছিল ১৯৬৯ সালে। বিষয়টি পরিষ্কার হওয়ার জন্যে এখানে পেছনের কথায় যেতে হয়। ১৯৬৯ সালে বঙ্গবন্ধু লন্ডন গিয়েছিলেন। সফরটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক। সেখানে বসে তিনি এই স্বাধীনতার পরিকল্পনা রচনা করেন। পরিকল্পনা অনুসারে কথা ছিল আমরা মাসে পঁচিশজন ছেলে রিক্রুট করবো এবং প্রতিবেশী বন্ধু রাষ্ট্রের একটি বিশেষ জায়গায় গেলে ট্রেনিং পাবো। আমরা চারজন রিক্রুটমেন্ট শুরু করি— সিরাজুল আলম খান, শেখ ফজলুল হক মণি, আবদুর রাজ্জাক এবং আমি।

প্রশ্ন : এটা ১৯৬৯ সালে?

তোফায়েল আহমদ : ১৯৬৯ সালে। বঙ্গবন্ধু লন্ডন থেকে ফিরে এলে আমরা ট্রেনিংয়ের জন্য, গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ করবো বলে মোটামুটি তৈরি হয়ে যাই। কিন্তু ইতোমধ্যে সত্তরের নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হয়ে যায়। তখন বঙ্গবন্ধু এই পরিকল্পনাটি স্থগিত রাখেন। বললেন, নির্বাচনে যাওয়ার প্রয়োজন এই কারণে যে, বাংলার নেতা কে সেটা প্রমাণিত হওয়া উচিত। এখন যদি ট্রেনিং নিতে কেউ যায় এবং ট্রেনিং শেষে অস্ত্র হাতে কেউ ধরা পড়ে তাহলে এর অজুহাতে নির্বাচন তারা বানচাল করবে। যে কারণে আমাদের সেই ট্রেনিং পরিকল্পনা স্থগিত থাকে এবং নির্বাচনের পর ক্ষমতা হস্তান্তরিত হচ্ছে না দেখে বঙ্গবন্ধু আমাদেরই এক সহকর্মীকে বন্ধু রাষ্ট্র ভারতে পাঠালেন।

প্রশ্ন : তিনি কে ?

তোফায়েল আহমদ : সত্তরের নির্বাচনের আগেও বঙ্গবন্ধু তার প্রতিনিধিকে ভারতে পাঠিয়েছিলেন। নির্বাচনের পর পাঠান ডাক্তার আবু হেনাকে। প্রাদেশিক আইন

www.pathagar.com

সভার সদস্য হয়েছিলেন সিরাজগঞ্জ থেকে। আর আগে যিনি গিয়েছিলেন তিনি আমাদের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। তো মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতায় গিয়ে আমরা সানি ভিলায় উঠি। একাত্তরের যুদ্ধ শুরু হবার আগেই এ বাড়িটি নেয়া ছিল। এছাড়া বনগাঁ, বসিরহাট এবং আগরতলা আমাদের জন্য সেন্টার ছিল। আর এই স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রশ্নে বঙ্গবন্ধু তাজউদ্দীন আহমদকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন আমাদের এই চারজনকে নিয়ে বসতে। সত্তরের নির্বাচনের পর যখন জাতীয় পরিষদ অধিবেশন বসছে না তখন আমরা তাজউদ্দীন আহমদকে নিয়ে বৈঠক করি। বৈঠকে আলোচনা হয়েছে যে আমাদের সংগঠনই ট্রেনিং প্রাপ্ত হবে। এটা হবে রাজনৈতিক লক্ষ্য প্রণোদিত একটি বাহিনী। এটা কিন্তু একাধিকবার বঙ্গবন্ধু বলেছেন এবং তাজউদ্দীন আহমদ জানতেন। গণহত্যা শুরু হলে আমরা ভারতে গেলাম। ভারতে গিয়ে আমাদের আশ্রয়, যেটার ঠিকানা বঙ্গবন্ধু আমাদের মুখস্থ করিয়ে দিয়েছিলেন, কাগজে লেখা ছিল, সেই ঠিকানায় শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক এবং আমি গিয়ে উঠি। তো এটা মুজিব বাহিনী, অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের বিকল্প কিছু ছিল না। কারণ, এটা তো আমাদের অরিজিনাল। আমি মুজিব বাহিনীর সদর দফতরে থাকতাম। কলকাতা ছিল সদর দফতর। সেখানে অস্ত্র এবং অর্থ আসতো আমার কাছে। আমি বিতরণ করতাম। আমি তাজউদ্দীন আহমদের সাথে থেকে সমন্বয় সাধন করেছি। কাজেই মুজিব বাহিনীকে যারা অন্যভাবে চিহ্নিত করতে চান বা অস্থায়ী সরকারের প্যারালেল বা সমান্তরাল কিছু বলতে চান, সেটা ঠিক নয়।

প্রশ্ন : মুজিব বাহিনী সংগঠক মেজর জেনারেল উবান তার বইতে বলেছেন, যুব নেতারা তাকে বলেছেন যে, ভারত সরকার নকশাল এবং মার্কসবাদীদের ট্রেনিং এবং অস্ত্র দিচ্ছে তাদের পঁচিশ বছরের অর্জিত সাফল্য নস্যাৎ করার জন্য। যুবনেতারা মানে আপনারা,—মুজিব বাহিনী নেতা চতুষ্টয়। আপনারা তাকে এ কথা বলেছিলেন?

তোফায়েল আহমদ : না। এ কথা ঠিক নয়। আমি জেনারেল উবানের বইটা পড়েছি। তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। খুব ভাল লোক। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। তার সঙ্গে আমরা ওৎপ্রোতভাবে জড়িত ছিলাম। তিনি তার বইতে আমাদের প্রশংসাও করেছেন। তথাপি বলতে হচ্ছে, তার বইয়ের সব তথ্যই সঠিক নয়। আর তাছাড়া, ভারত সরকার নকশাল ও মার্কসবাদীদের অস্ত্র দিতে পারে, এটা আমাদের কল্পনাতেও ছিল না। সুতরাং, তার সঙ্গে এ ধরনের আলোচনার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

প্রশ্ন : জেনারেল উবান আরো বলেছেন, যুব নেতারা তাকে জানিয়েছেন যে দেশ স্বাধীন হবার পর তাজউদ্দীন আহমদ ক্ষমতা কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে শেখ মুজিবকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। আপনারা তাকে কি এমন কথা বলেছিলেন?

তোফায়েল আহমদ : এ কথাটাও ঠিক নয়। আমি তো শুধু আপনার এই ইন্টারভিউতেই নয়, বইটা পড়ে অনেক জায়গায় আমি আমার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছি। বলেছি বইটায় ঘটনা বিকৃত করা হয়েছে। অনেক কথাই সঠিক নয়। তাজউদ্দীন আহমদ যেখানে সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ ছিলেন; যেখানে অত্যন্ত

www.pathagar.com

নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন, সেখানে তিনি তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চান— এটা কখনো তার কাজকর্মে আমরা লক্ষ্য করিনি। কাজেই তার কথা সঠিক নয়।

প্রশ্ন : আপনারা, চার নেতা জেনারেল উবানকে বলেছিলেন যে একটি ভারতীয় বিলাসবহুল হোটেলে নকশালপন্থী নেতাদের সঙ্গে ভারতীয় অফিসারদের আলাপ-আলোচনা করতে দেখেছেন। সম্ভবত তাদেরকে ওই হোটেলে রাখা হয়েছিল। আপনারা আরো জানিয়েছিলেন তাকে, নকশালদের ট্রেনিং ও অস্ত্র দেয়া হয়েছে। ট্রেনিং প্রদানের জায়গার নামও আপনারা উল্লেখ করেছিলেন জেনারেল উবানের কাছে। এই নেতারা কারা এবং কোন হোটেলে ছিলেন তারা? ট্রেনিংটা কোথায় হয়েছিল?

তোফায়েল আহমদ : এই ধরনের কোন কথা জেনারেল উবানকে বলেছি বলে মনে পড়ে না। আর ভারত সরকার নকশালদের ট্রেনিং দেবে এটা আমাদের চিন্তার মধ্যে ছিল না। এটা সঠিক নয়। সে কারণেই তো বলেছি জেনারেল উবানের বইয়ে এমন কিছু কথা আছে, যা সঠিক নয়।

প্রশ্ন : জেনারেল উবানের বই বাজারে এসেছে অনেকদিন আগে। তার অসত্য কথার প্রতিবাদ করেননি কেন? প্রতিবাদ করা উচিত ছিল।

তোফায়েল আহমদ : এটা আপনি ঠিকই বলেছেন। আমরা প্রতিবাদ করবো কীভাবে। এর প্রতিবাদে তো একটা বই লিখতে হয়। আমাদের বিরুদ্ধে তো অনেকেই অনেক কথা লিখেছেন। যেমন অধ্যাপক আবু সাঈদ লিখেছেন, *'ফ্যাক্টস এ্যান্ড ডকুমেন্টস'*— নামে একটি বই। আমাদের বিরুদ্ধে যিনি যেখানে যা বলেছেন, সেটাই তার *"ফ্যাক্টস অ্যান্ড ডকুমেন্টস"*— এ স্থান পেয়েছে; বইটা তার নিজস্ব মতামত নয় এবং তা সত্য কি মিথ্যা সেটা যাচাই করেননি। কেউ যাচাই করছেনও না। যেমন ধরুন, আমি একটি রাজনৈতিক দলের কর্মী। ভিন্ন রাজনৈতিক দলের যারা, আমাদের রাজনীতি তাদের অপছন্দ। তাদের একজন আমাদের সম্পর্কে কিছু লিখলেন এবং সেটাই ফ্যাক্ট হয়ে গেল, এটা তো ঠিক নয়। যেমন আপনি আজকে আমাকে কিছু প্রশ্ন করেছেন যাচাই করার জন্য, এই যাচাই তো কেউ করেন না। আমাদের দুর্ভাগ্য, বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে লেখালেখি হচ্ছে। এটা কি ঠিক? আজকে যাদের বয়স উনিশ, তারা তো বাংলাদেশের সত্যিকারের ইতিহাস জানলো না। কারণ, যে যা লেখেন সেখানে নিজেকে মুখ্য করেই লেখেন। এতে সত্যিকারের ইতিহাস হারিয়ে যায়।

প্রশ্ন : মঈদুল হাসান তার 'মূলধারা '৭১' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে "তাজউদ্দীন আহমদ অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী থাকলে দেশ স্বাধীন হবে না। তাজউদ্দীন আহমেদ শেখ মুজিবের গ্রেফতার হবার কারণ।" এ ধরনের প্রচারণা মুজিব বাহিনী নেতারা করেছিলেন। এ সত্য?

তোফায়েল আহমদ : এই মঈদুল হাসান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মস্কো) করতেন। সত্তরের নির্বাচনে তিনি পরাজিত হন। কিন্তু তিনি ব্যক্তিগতভাবে তাজউদ্দীন আহমদের বন্ধু ছিলেন। *মূলধারা '৭১* তিনি ভালই লিখেছেন। কিন্তু বইতে দু একটি কথা যেমন, এই কথাটি সঠিক নয়। সেই মুজিব নগরে ১৭ই এপ্রিল যখন অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়, আমরা সেখানে ছিলাম। আমরা চারজনেই গিয়েছিলাম। আমাদের

www.pathagar.com

সঙ্গে একাধিকবার আলোচনা করেছেন তাজউদ্দীন আহমদ। আমরা সেই থিয়েটার রোডে গিয়েছি। বৈঠক করেছি। সরকার গঠিত হয়েছে। তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গেই হেলিকপ্টারে করে, প্লেনে করে সীমান্ত এলাকায় অনেকবার ঘুরেছি। শিলিগুড়িতে শেখ ফজলুল হক মণি, তাজউদ্দীন আহমদ এবং আমি এক সঙ্গে ছিলাম। তিনি তখন প্রধানমন্ত্রী—যদিও তখনো ঘোষণা হয়নি কিন্তু ভাষণ টেপ করে এসেছিলেন। আমরা শিলিগুড়ি রেস্ট হাউজে বসেই রেডিওতে সেই ভাষণ শুনি। আমরা, আমি আর শেখ ফজলুল হক মণি জেনারেল ওসমানীর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলাম। আমি এবং আমরা মুজিব বাহিনীর জন্য সদস্য রিক্রুট করতাম। মনসুর আলীর চিঠি ছিল আমাদের কাছে যে আমরা মুজিব বাহিনীর জন্য সদস্য রিক্রুট করবো। কিন্তু এই মঈদুল হাসান এবং তার মতো আরো কিছু লোকের জন্য ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন যাতে বঙ্গবন্ধু ও তাজউদ্দীন আহমদের মধ্যে দুরত্ব তৈরি হয়ে যায় এবং যা থেকে তারা পরবর্তীকালে ফায়দা লুটতে পারেন, সে চেষ্টায় এরা ছিলেন। কিন্তু তারা সফল হননি।

প্রশ্ন : 'তাজউদ্দীন আহমদকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল,'– মঈদুল হাসান তার 'মূলধারা '৭১'- এ কথা বলেছেন। এ কতটুকু সত্য?

তোফায়েল আহমদ : এটা মঈদুল হাসানের বই না পড়লে কিন্তু আমরা জানতাম না। একটা মুক্তিযুদ্ধ চলছে এবং যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করছে বন্ধুরাষ্ট্রে গিয়ে, সেখানে তাজউদ্দীন আহমদকে তারাই হত্যার ষড়যন্ত্র করছে—এ ধরনের কল্পনা বা এই ধরনের চিন্তা-ভাবনা মঈদুল হাসানরাই করতে পারেন। মঈদুল হাসানের বইটার প্রশংসা অনেকেই করেছেন। আমিও করি। কিন্তু কিছু অসত্য কথা রয়েছে তার বইতে। সত্যকে বিকৃত করা হয়েছে। খেয়াল করলে দেখতে পাবেন বইটিতে তিনি প্রচ্ছন্নভাবে আমাদেরই নেতা তাজউদ্দীন আহমদকে বড় করে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। আর বঙ্গবন্ধুকে খাটো করার চেষ্টা রয়েছে। কারণ, রাজনৈতিকভাবে মঈদুল হাসান আর আমরা তো এক ছিলাম না।

প্রশ্ন : মুজিব বাহিনীর মটিভেশনটা কি ছিল?

তোফায়েল আহমদ : মুজিব বাহিনী ছিল আমাদের আদর্শিক বাহিনী। শুধু ভৌগোলিক স্বাধীনতা আসবে, পতাকা বদল হবে, দেশের নামে পরিবর্তন আসবে, সেজন্য আমরা যুদ্ধ করছি না অর্থাৎ স্বাধীন বাংলাদেশ হবে শোষণমুক্ত বাংলাদেশ। এই শোষণমুক্ত বাংলাদেশই একটা আদর্শ—যা ১৯৬৯ এর এগার দফায় ছিল। বঙ্গবন্ধুর ছয়দফা এর মধ্যেই ছিল। মটিভেশন ছাড়া হাতে অস্ত্র ভয়ঙ্কর ব্যাপার। তাই অস্ত্র নেব—সে অস্ত্রের উদ্দেশ্য কী, লক্ষ্য কী, কেনই বা দেশ স্বাধীন করবো এই মটিভেশন আমরা মুজিব বাহিনী সদস্যদের দিতাম। আমাদের ছেলেরা মুক্তি বাহিনীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছে এবং বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শন সেখানে মটিভেট করেছি আমরা।

প্রশ্ন : তানদুয়া মুজিব বাহিনী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রধান করা হয় হাসানুল হক ইনুকে। অথচ ইনু সে সময় ছাত্রলীগের কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন না। কেন তাকে কেন্দ্র-প্রধান করা হল?

তোফায়েল আহমদ : হাসানুল হক ইনুকে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রধান করা হয়, এটা একদমই সঠিক নয়। বাংলাদেশের নিয়ম হল, যিনি যখন ইন্টারভিউ দেন—এমনভাবে

www.pathagar.com

বলেন, মনে হয় তিনিই সব। যারা ভাল বক্তৃতা দিতে পারতেন, আমাদের আদর্শ বোঝাতে পারতেন, প্রথম ব্যাচের ট্রেনিং শেষে তাদের থেকে ত্রিশজনকে আমরা ইনস্ট্রাক্টর করি। হাসানুল হক ইনু ওই ত্রিশজন ইনস্ট্রাক্টরের একজন ছিলেন। সেখানে কাউকে প্রধান করা হয়নি। আমরা চারজন প্রত্যেক মাসে সেখানে যেতাম। প্রত্যেক ব্যাচকে মটিভেট করতাম, বক্তৃতা দিতাম।

প্রশ্ন : তাহলে তিনি প্রশিক্ষণ প্রধান ছিলেন না।

তোফায়েল আহমদ : না।

প্রশ্ন : আপনাদের ভেতর অর্থাৎ মুজিব বাহিনীর চার নেতার মধ্যে মতাদর্শগত কোন বিরোধ ছিল কি?

তোফায়েল আহমদ : যুদ্ধ চলাকালীন মুজিব বাহিনীর চার নেতার মধ্যে কোন মতাদর্শগত বিরোধ ছিল না।

প্রশ্ন : তানদুয়ায় মুজিব বাহিনীর সদস্যরা এক পর্যায়ে ট্রেনিং বন্ধ করে দেয়। এ সম্পর্কে কি জানেন?

তোফায়েল আহমদ : এ তথ্য সঠিক নয়। কোনদিনই ট্রেনিং বন্ধ হয়নি। কোথা থেকে যে এগুলো আপনারা পেয়েছেন, কে এসব বলেছে। কোনদিনই ট্রেনিং বন্ধ হয়নি। একদিনের জন্যেও নয়।

প্রশ্ন : নূরে আলম সিদ্দিকীকে মুজিব বাহিনীর নেতৃত্বে নেয়া হল না কেন?

তোফায়েল আহমদ : নূরে আলম সিদ্দিকীই বলুন আর শাহজাহান সিরাজ, এরা তখন ছাত্রলীগের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক। শাহজাহান সিরাজ মুজিব বাহিনীর সঙ্গে খানিকটা যুক্ত ছিলেন নূরে আলম সিদ্দিকী,—এ কোন উত্তর নেই। আসলে আমরা যারা স্বাধীনতার পক্ষে আগেই কাজ করতাম বিভিন্নভাবে, তখন ছাত্রদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র অংশ স্বাধীনতার প্রশ্নে কম চিন্তা করতো। নূরে আলম সিদ্দিকীকে আমি ঠিক সেভাবে বলতে চাচ্ছি না, মানে ছিলেন না আর কি। এটা হল বড় কথা।

প্রশ্ন : কলকাতার হিন্দুস্থান ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এবং মুজিব বাহিনী নেতাদের মধ্যে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠক সম্পর্কে কিছু বলুন।

তোফায়েল আহমদ : আদতে আমাদের সঙ্গে অস্থায়ী সরকারের কোন বৈঠক হয়নি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষ থেকে ডি পি ধর সমন্বয় সাধন করতেন। তো ডি পি ধরের সঙ্গে আমাদের এবং অস্থায়ী সরকারের আলাপ-আলোচনা হতো। এ রকম একাধিকবার ডি পি ধরের সঙ্গে আমরা আলাপ-আলোচনা করেছি, পরিকল্পনা তৈরি করেছি। তারপর আবার আমরা বিশেষ করে আমি অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে জেনারেল ওসমানীর সঙ্গে বসেছি। আর ভারত সরকারের পক্ষ থেকে ছিলেন জেনারেল সরকার। ডি পি ধর ছিলেন না। যেহেতু আমি সদর দফতরে ছিলাম সেহেতু সাধারণ সমন্বয় সাধনের জন্য আমাকে থাকতে হয়।

প্রশ্ন : বৈঠকটা কিসের ওপর ছিল?

তোফায়েল আহমদ : বৈঠকটা ছিল ইনডাকশনের ওপর। কারণ দু'এক জায়গায় আমাদের সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর গোলমাল হয়েছিল। আগরতলায় শেখ ফজলুল হক মণির

www.pathagar.com

সেক্টরে। গোলমাল হয়েছিল আমার সেক্টরেও। এটা যাতে না হয় অর্থাৎ মুজিববাহিনী মুক্তিবাহিনীর পরিপন্থী নয়—উভয়ে আমরা দেশ স্বাধীন করার জন্য ভেতরে যাচ্ছি, এটারই সমন্বয় বিধানের জন্য বৈঠক।

প্রশ্ন : তাহলে মুজিব বাহিনী ভেতরে প্রবেশের সময় গোলমাল দেখা দেয়।

তোফায়েল আহমদ : এক-আধটা।

প্রশ্ন : স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন মুজিব বাহিনী সদস্যরা আওয়ামী লীগ বিরোধী এবং কমিউনিস্টদের হত্যা করেছে বলে অভিযোগ আছে। আপনি কি বলেন?

তোফায়েল আহমদ : এটা একদম মিথ্যা। প্রশ্নই ওঠে না। আমরা কোন কমিউনিস্টকে হত্যা করিনি। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ভাল ছিল। আমরা যেমন মুজিব বাহিনী করেছি, সে রকম ছাত্র ইউনিয়নের ছেলেরা কমরেড ফরহাদের নেতৃত্বে একটা ব্রিগেড করেছে। তাদেরও ভিন্ন ট্রেনিং হয়। সুতরাং আওয়ামী লীগ বিরোধীদের হত্যা করেছে মুজিব বাহিনী, এ কথা ঠিক নয়। পরবর্তীকালে যারা আওয়ামী লীগ ছেড়ে চলে গেছে বা এখনো আওয়ামী লীগকে পছন্দ করে না, তারা ইতিহাসকে বিকৃত করার জন্য, স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়কে ব্যঙ্গ করার জন্য এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি মানুষকে বীতশ্রদ্ধ করে তোলার জন্যে অবাস্তব, কল্পনাপ্রসূত, অসত্য এবং বিকৃত সংবাদ দিয়ে ইন্টারভিউ করেছে।

প্রশ্ন : জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) লোকজন অভিযোগ করে যে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন চট্টগ্রামের ছাত্রলীগ নেতা মুক্তিযোদ্ধা স্বপন চৌধুরীকে মুজিব বাহিনীর শেখ ফজলুল হক মণি গ্রুপের লোকজন হত্যা করেছে। এ অভিযোগ সম্পর্কে আপনি কি বলেন?

তোফায়েল আহমদ : আমার জীবনে এই প্রথম আমি কথাটি শুনলাম। দেশ স্বাধীন হয়েছে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর। আর আজকে ১৯৮৯ সালের ১৪ই এপ্রিল, এই প্রথম শুনলাম। কারণ, সবাই জানে যে, পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে সম্মুখ সমরে জীবন দিয়েছেন স্বপন চৌধুরী। এবং এত বছর, এত দিন চলে গেল, এ কথা শুনিনি। যারা আওয়ামী লীগ থেকে চলে গেছে এবং পরবর্তীকালে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল করেছে— সেই জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে। সেই জাসদের এক নেতা নব্য রাজাকার হয়েছেন। সুতরাং জাসদের মুখ দিয়ে এ ধরনের অনেক কথা বেরুবে, এতে আমি বিস্মিত হই না। সত্যিকার ইতিহাস সত্যিকারই থাকবে। কারণ, শেখ ফজলুল হক মণি একজন উঁচুদরের নেতা ছিলেন। তিনি স্বপন চৌধুরী এবং অন্যদের প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। মুজিব বাহিনীর ছেলেদের মধ্যে এমন কোন ঘটনা মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ঘটেনি—যার কারণে শেখ ফজলুল হক মণির নির্দেশে স্বপন চৌধুরীকে জীবন দিতে হতে পারে। এটা সর্বৈব মিথ্যা। তাদের (জাসদ) কিছু পরিকল্পনা ছিল, বঙ্গবন্ধু (পাকিস্তান জেল থেকে মুক্ত হয়ে) আসার পর সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে যার প্রকাশ ঘটে। আজকে স্বাধীনতা বিরোধীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এই স্বাধীনতা বিরোধীরা সর্বপ্রথম জাসদের ছত্রছায়ায় পল্টন ময়দানে সমবেত হবার সুযোগ পেয়েছিল। সেদিন তারা নিজেদেরকে এক আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করে। কে সেই হল্যান্ডের নাগরিক পিটার কাসটার্স? তিনি নিজে

www.pathagar.com

বলেছেন যে 'আমি জাসদকে সাহায্য করেছি।' কে সেই পিটার কাসটার্স এসব আপনারা জানেন। কার সঙ্গে, কোন সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল, আপনারা জানেন। তারা গণবাহিনী করে থানা লুট করে। ব্যাংক লুট করে। বিভিন্নভাবে তারা কী অত্যাচারই না করে। এ ধরনের বানোয়াট, মিথ্যা উক্তি করাটা তাদের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়।

প্রশ্ন : ১৯৭২ সালে মুজিব বাহিনী পুনরুজ্জীবিত স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে শেখ মুজিবের কাছে প্রস্তাব রাখে যে, অস্থায়ী সরকার ভেঙ্গে দিয়ে জাতীয় বিপ্লবী সরকার গঠন করা হোক এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল শক্তিকে জাতীয় বিপ্লবী সরকারে অন্তর্ভুক্ত করা হোক। এ প্রস্তাব নাকচ করে দেন শেখ মুজিব। এরপর মুজিব বাহিনী আরো ছটি প্রস্তাব রাখে। সে প্রস্তাবগুলো কি?

তোফায়েল আহমদ : যারা জাসদ গঠন করেন, সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে, তারা ওই (জাতীয় বিপ্লবী সরকার) প্রস্তাব দেন বেশ পরে। যখন আমরা পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের জন্য নির্বাচিত সদস্যদের সমন্বয়ে গণপরিষদ করে তাড়াতাড়ি সংবিধান প্রণয়নের মধ্য দিয়ে তার ভিত্তিতে নির্বাচন দেয়া এবং সেই নির্বাচিত জনপ্রিতিনিধিরা দেশ শাসন করবেন—সেই কাজ করছিলাম। তাই এই কারণে বঙ্গবন্ধু ওই প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। এবং সেটা গ্রহণ করা সমীচীনও হতো না। এরপর আর কোন প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। কোন প্রস্তাবই নয়।

প্রশ্ন : ১৯৭২ সালে জুলাই মাসে স্বাধীন বাংলাদেশে ছাত্রলীগের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রলীগ দু'ভাগ হয়ে যায়। এর কারণ কি?

তোফায়েল আহমদ : ছাত্রলীগের যে নিয়ম-কানুন অনুসারে সম্মেলন হবার কথা, সেই নিয়ম-কানুন অনুযায়ী সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আমরা সম্মেলন করি। কিন্তু একটা অজুহাত তো খুঁজতে হবে ছাত্রলীগ ভাঙার। কারণ, ছাত্রলীগ ভেঙ্গে তারা তাদের মূল সংগঠন করবে। কেন ছাত্রলীগ দু'ভাগ হল, এই প্রশ্নের উত্তর আমরা জুঁজে পাব পরবর্তীকালে জাসদের জন্মের মধ্য দিয়ে। তখন তাদের কিছু কিছু পরিকল্পনা, যা ছিল অবাস্তব—তারা গ্রহণ করে তাদের ওই আদর্শগত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নামে। সেগুলো আমরা গ্রহণ করতে পারিনি বলে আমরা নিয়ম-কানুন মোতাবেক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সম্মেলন করি। তারা পাল্টা সম্মেলন করে পরবর্তীকালে জাসদ করেছে।

প্রশ্ন : তারা কি চেয়েছিল?

তোফায়েল আহমদ : এই আজকে যা করছে এটাই চেয়েছিল অর্থাৎ অরাজকতা, গোলযোগ সৃষ্টি করে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত সরকারকে ধ্বংস করা— যেটা আজকে তারা করছে।

প্রশ্ন : সিরাজুল আলম খান ক্ষমতায় আসতে চেয়েছিলেন, এটাই কি?

তোফায়েল আহমদ : সিরাজুল আলম খান ক্ষমতায় আসতে চেয়েছিলেন কী না, সেটা আলাদা কথা। তার মূল উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গবন্ধুকে অপ্রিয় করে তোলা। এটার মধ্যে অন্য যাদের হাত ছিল, আমি সেটা বলবো না, তবে আমি জানি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী না করে রক্ষী বাহিনী গঠন করা হল কেন? আপনি তো ওই সময় শেখ মুজিবের রাজনৈতিক সচিব ছিলেন। আপনার পক্ষে এ প্রশ্নের জবাব দেয়া সম্ভব।

তোফায়েল আহমদ : এটা ছিল একটা অধাসামরিক বাহিনী। যেমন, পুলিশ ব্যর্থ হলে তখন তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য আমরাই কিন্তু সেনাবাহিনীকে গড়ার চেষ্টা করেছিলাম। এবং সেনাবাহিনীর সঙ্গে এর কোন সংঘাত ছিল না। আমরা রক্ষী বাহিনী গঠন করি সেনাবাহিনীকে বাদ দিয়ে, এটা ঠিক নয়। সেনাবাহিনী সেনাবাহিনীই। রক্ষী বাহিনী রক্ষী বাহিনীই। এবং সেই রক্ষী বাহিনীর সকল সদস্যই আজকে সেনাবাহিনীতে আছে। একটা আরেকটার প্যারালেল ছিল না। আমরা সেনাবাহিনী করার চেষ্টা করেছি। সাথে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশে বিভিন্ন রকমের সমস্যা দেখা দেয়। সেই জন্য রক্ষী বাহিনী করি। এই ধরনের আধাসামরিক বাহিনী বিশ্বের সবদেশেই আছে। রক্ষী বাহিনী একটি আধাসামরিক বাহিনী ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

প্রশ্ন : রক্ষী বাহিনী কি শেখ মুজিবের ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাড়িতে প্রহরায় ছিল?

তোফায়েল আহমদ : না। বঙ্গবন্ধু যখন প্রেসিডেন্ট হলেন তখন সেনাবাহিনী ছিল। যতদিন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ততোদিন তিনি পুলিশ প্রহরায় ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর আত্মবিশ্বাস ছিল প্রবল। কোনদিন ভাবেননি তাকে এ দেশেরই লোকের হাতে প্রাণ দিতে হবে। সব সময় আমরা তাকে বলতাম কিন্তু তিনি সরকারি বাসভবনে যাননি। সেই অরক্ষিত ৩২ নম্বরেই তিনি থাকতেন। যখন প্রেসিডেন্ট, তখন সেনাবাহিনী ছিল তার প্রহরায়। রক্ষী বাহিনী যদি সেনাবাহিনীর বিকল্প হতো, তাহলে তাদের পাশাপাশি রক্ষী বাহিনীও তার প্রহরায় থাকতো। তাহলে এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারতো না। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর বিশ্বাস ছিল সেনাবাহিনীর ওপর। সে কারণে তাদেরকে তিনি মোতায়েন করেছিলেন। সুতরাং, যারা রক্ষী বাহিনী সম্পর্কে অপপ্রচার করে— এই যেমন, রক্ষী বাহিনী হাজার হাজার লোক মেরেছে, কথাটা সত্য নয়। অথচ এটা কেউ বলে না যে, গণবাহিনীর হাতে, সিরাজ শিকদারের সর্বহারা পার্টির লোকদের হাতে আমাদের পাঁচজন জাতীয় সংসদ সদস্যসহ হাজার হাজার লোককে জীবন দিতে হয়েছে। গ্রামকে গ্রাম ছারখার হয়েছে। একটা গ্রামে অস্ত্র হাতে নিয়ে কেউ কাউকে যদি হত্যা করে, স্বাভাবিকভাবে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সেখানে যায়। সেখানে বাড়াবাড়ি কিছুটা যে হয় না, তা নয়। কিন্তু রক্ষী বাহিনীর বিরুদ্ধে ঢালাওভাবে বলা হয়েছে।

টেপকৃত : ১৪ এপ্রিল, ১৯৮৯।

www.pathagar.com

হাসানুল হক ইনু

তানদুয়া বি এল এফ (মুজিব বাহিনী)
গেরিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রধান,
সাধারণ সম্পাদক,
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (ইনু)

প্রশ্ন : মোট কতজনকে তানদুয়া কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়?

হাসানুল হক ইনু : ১০ হাজার।

প্রশ্ন : তানদুয়ায় প্রশিক্ষণ দিতেন কারা এবং তাদের সংখ্যা কত : মটিভেশনের বিষয়বস্তু কি ছিল?

হাসানুল হক ইনু : প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণ দেন ভারতীয় সামরিক অফিসাররা। এই প্রথম ব্যাচ থেকে প্রশিক্ষক হিসেবে আটজনকে বেছে নেয়া হয়। এরা হলেন শরীফ নুরুল আম্বিয়া, আ. ফ. ম. মাহবুবুল হক, রফিকুজ্জামান, মাসুদ আহমদ রুমী, সৈয়দ আহমদ ফারুক, তৌফিক আহমদ, মোহনলাল সোম এবং আমি। আমাকে করা হয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রধান। পরে এ সংখ্যা বাহান্নতে উন্নীত করা হয়। আমার সরাসরি ওপরঅলা ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন কর্নেল। মেজর মালহোত্রাও ছিলেন কেন্দ্রের একজন ভারতীয় অফিসার। প্রশিক্ষণ কেন্দ্র একজন ভারতীয় ব্রিগেডিয়ারের পরিচালনাধীন ছিল।

মটিভেশনের বিষয়বস্তু ছিল স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র। আওয়ামী লীগের ঘোষণাপত্র সমাজতন্ত্রের পক্ষে বক্তব্য রাখতে প্রশিক্ষকদের জন্য সুবিধাজনক অবস্থার সৃষ্টি করে। আওয়ামী লীগের ঘোষণাপত্রে সমাজতন্ত্র অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রশ্ন : মটিভেশন প্রশ্নে প্রশিক্ষকদের ভেতর কোন মতবিরোধ ছিল কী?

হাসানুল হক ইনু : মতবিরোধ ছিল সমাজতন্ত্রের প্রশ্নে। সমাজতন্ত্রের বিপক্ষে ছিলেন শেখ ফজলুল হক মণির অনুসারীরা। অন্যদিকে আমরা ছিলাম সিরাজুল আলম খান ও আবদুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রের পক্ষে। আমরা যারা সমাজতন্ত্রের পক্ষে ছিলাম, তারাই ছিল শতকরা আশি ভাগ। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ সমাজতন্ত্রের পক্ষে ছিলেন না। এই প্রশ্নে তারা প্রায়শই বিরোধিতা করতেন। এক পর্যায়ে কেন্দ্রের সার্বক্ষণিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্নেল প্রশিক্ষকদের রাজনৈতিক বক্তৃতা বন্ধের আদেশ দেন। এ আদেশ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে। আমরা প্রশিক্ষকরা, ভারতীয় কর্নেলকে জানিয়ে দেই যে, দিল্লী থেকে নির্দেশ আসা না পর্যন্ত

www.pathagar.com

আমরা সামরিক প্রশিক্ষণদানের পাশাপাশি রাজনৈতিক বক্তৃতাও চালিয়ে যাব। কিন্তু কর্নেল বক্ততা বন্ধের চাপ দিয়ে যেতে থাকেন। এতে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কেন্দ্র প্রধান হিসেবে আমি জানিয়ে দেই যে দিল্লী থেকে রাজনৈতিক বক্তৃতা দেবার অনুমতি না দেয়া হলে ট্রেনিং প্রদান বন্ধ থাকবে এবং তিনদিন ট্রেনিং বন্ধ থাকে। ট্রেনিং বন্ধের খবর দিল্লীতে পৌছবার সঙ্গে সঙ্গে তানদুয়ায় ছুটে আসেন মেজর জেনারেল উবান। তার সঙ্গে আসেন মুজিব বাহিনীর চার নেতাও। মূল প্রশ্নটি ধামা-চাপা দেয়ার মত করে অচলাবস্থার নিরসন ঘটানো হয়। ট্রেনিং আবার আরম্ভ হয়ে যায়। রাজনৈতিক বক্তৃতাও চলতে থাকে।

সমাজতন্ত্রের প্রশ্নে এই যে মতবিরোধ, যুদ্ধ চলাকালে দেশের অভ্যন্তরেও এর প্রসার ঘটে এবং কোথাও কোথাও পারস্পরিক গোলাগুলি বিনিময়ও হয়। চট্টগ্রামের ছাত্রলীগ নেতা স্বপন চৌধুরী (১৯৭০ সালের ১২ আগস্ট ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপক) যুদ্ধের শেষদিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। আমাদের বিশ্বাস, শেখ ফজলুল হক মণি গ্রুপের লোকজনই তাকে পাক বাহিনীর হাতে ধরিয়ে দেয়। ধরা পড়ার সময় তিনি প্রতিরোধ করেন এবং আহত হন। পাকবাহিনী স্বপন চৌধুরীর পরিচয় পেয়ে তার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং গোপন খবরাখবর পাবার আশায় তাকে সুস্থ করে তোলার জন্য রাঙ্গামাটি হাসপাতালে নিয়ে রাখে। ১৬ই ডিসেম্বরের আগেই রাঙ্গামাটির পতন ঘটে। স্বপন চৌধুরী তখনও হাসপাতালেই ছিলেন। পরদিন তার আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। তাকে গোপনে সরিয়ে ফেলা হয়। আর তার খোঁজ পাওয়া যায়নি। যে নার্স তার চিকিৎসায় ছিলেন, তিনিও ১৯৭২ সালে গায়েব হয়ে যান। আমাদের ধারণা, এ কাজও শেখ ফজলুল হক মণি গ্রুপের। কেননা, স্বপন চৌধুরী নিখোঁজ হবার সাক্ষী ছিলেন ওই নার্স।

প্রশ্ন : তানদুয়ায় ট্রেনিং প্রদান বন্ধ হয় কবে?

হাসানুল হক ইনু : ২০শে নভেম্বর (১৯৭১) প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বন্ধ করে দেয়া হয়। কিন্তু আমরা বুঝতে পারিনি কি কারণে বন্ধ করে দেয়া হল। অথচ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে ১৬ই ডিসেম্বরের আগে আমাদের বেরুতে দেয়া হয় না। ওই সময় অনেকটা আটকাবস্থার মধ্যে ছিলাম। এর কারণ জানতে চাইলে ভারতীয় সেনা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোন জবাব মেলেনি।

(হাসানুল হক ইনু)
৮ মে, ১৯৮৯

www.pathagar.com

স্বাধীনতা সংগ্রামের সনদপত্র

মুক্তি বাহিনীর সনদপত্র

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

স্বাধীনতা সংগ্রামের সনদপত্র

.... পিতা ....

গ্রাম .... থানা .... জিলা .... বাংলাদেশের

স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর যোদ্ধা। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে তাঁর অবদান চির উজ্জ্বল হয়ে থাকবে

প্রধান সেনাপতি
মুক্তি বাহিনী

[illegible]

[illegible]
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সার্জেন্ট জহুরুল হকের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে '১৫ই ফেব্রুয়ারি বাহিনী'র মিছিল। মিছিলে শেখ হাসিনাকে দেখা যাচ্ছে (চতুর্থ)

শেখ মুজিবের পরিবারের সাথে জেনারেল উবান। বাম থেকে আবদুর রাজ্জাক, শেখ হাসিনা, বেগম মুজিব, শেখ রাসেল, শেখ ফজলুল হক মনি, জেনারেল উবান ও তোফায়েল আহমদ

www.pathagar.com

তানদুয়া মুজিব বাহিনী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষকরা শপথ নিচ্ছেন। বামে হাসানুল হক ইনু

জেনারেল উবানের সাথে মুজিব বাহিনী নেতা চতুষ্টয়। (বামে থেকে) সিরাজুল আলম খান, শেখ ফজলুল হক মনি, জেনারেল উবান, তোফায়েল আহমদ ও আবদুর রাজ্জাক

www.pathagar.com

শেখ মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন : আ.স.ম. আবদুর
াবের হাতে জয়বাংলা বাহিনীর পতাকা তুলে দেন

শিব নারায়ণ দাশ :
জয়বাংলা বাহিনীর পতাকার ডিজাইনার

আবদুল খালেক মোহাম্মদী ও মোহাম্মদ নাসিরউল্লাহ :
জয়বাংলা বাহিনীর পতাকা (পরবর্তীকালে স্বাধীন
বাংলাদেশের পতাকা) সেলাই করেন
ছবি : মীর মহীউদ্দিন সোহান

www.pathagar.com

সহায়ক গ্রন্থ

১. *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র* : প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ ও এয়োদশ খণ্ড, সম্পাদক : হাফিজুর রহমান ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২

২. *বাংলাদেশ ডকুমেন্টস*- প্রথম খণ্ড : সম্পাদকমণ্ডলী : শিলেন্দ্র কুমার সিং, শিশির গুপ্ত, সতীশ কুমার, হরিশচন্দ্র শুকলা, বসন্ত বিষ্ণু নিভরিকর ও দিলীপ কুমার বসু, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, মিনিস্ট্রি অব ইনফরমেশন অ্যান্ড ব্রডকাস্টিং, পাতিয়ালা হাউস, নয়াদিল্লী, ১৯৭২

৩. জি ডবলিউ চৌধুরী : *দ্যা লাস্ট ডেজ অব ইউনাইটেড পাকিস্তান*, ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি প্রেস, ব্লুমিংটন, ইউ. এস, এ, ১৯৭৪

৪. হেনরি কিসিঞ্জার : *হোয়াইট হাউস ইয়ারস*, লিটল ব্রাউন অ্যান্ড কোম্পানি, বষ্টন, টোরান্টো, ১৯৭৯

৫. মোহাম্মদ আইউব খান : *ফ্রেন্ডস নট মাস্টারস*, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, লাহোর করাচি, ঢাকা, ১৯৬৭।

৬. মোহাম্মদ আইউব এবং কে সুব্রামানিয়াম : *দ্যা লিবারেশন ওয়ার*, এস চান্দ এন্ড কোম্পানি, নয়াদিল্লী ১৯৭২

৭. মেজর জেনারেল সুখওয়ান্ত সিং : *দ্যা লিবারেশন অব বাংলাদেশ*, প্রথম খণ্ড, নওরোজ কিতাবস্তান, ঢাকা , ১৯৮০

৮. মেজর জেনারেল এস এস উবান : *ফ্যান্টমস অব চিটাগং 'ফিপথ আর্মী' ইন বাংলাদেশ*, অ্যালায়েড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, নয়াদিল্লী, ১৯৮৫

৯. জ্যোতি সেনগুপ্ত : *বাংলাদেশ ইন ব্লাড অ্যান্ড টিয়ারস*, নয়া প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৮১

১০. অ্যান্থনি মাসকারেনহাস : *বাংলাদেশ লাঞ্ছিতা*, অনুবাদ : ডক্টর মাযহারুল ইসলাম, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩

১১. জ্যাক এন্ডারসন এবং জর্জ ক্লিফোর্ড : *দ্যা এন্ডারসন পেপারস*, ব্যালানটাইন বুকস, নিউইয়র্ক, ১৯৭৩

১২. সিদ্দিক সালিক : *নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল*, ভাষান্তর : মাসুদুল হক, নভেল পাবলিকেশন্স, ঢাকা ১৯৮৮

১৩. ওরিয়ানা ফালাসি : *ইন্টারভিউ উইথ হিস্ট্রি*, হুটন মিফলিন কোম্পানি, বস্টন ১৯৭৬

১৪. মোহাম্মদ আসগর খান : *জেনারেলস ইন পলিটিক্স*, বিকাশ পাবলিশিং হাউস, নয়াদিল্লী, ১৯৮৩

১৫. মেজর জেনারেল সুখওয়ান্ত সিং : *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়*, ভাষান্তর : মাসুদুল হক, আনন্দ প্রকাশন, ঢাকা ১৯৮৮

১৬. রাও ফরমান আলী : *ভুট্টো, শেখ মুজিব বাংলাদেশ*, সৌখীন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৮

www.pathagar.com

১৭. তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) : নির্বাচিত ভাষণ ও নিবন্ধ, সম্পাদনা : আবদুল হাফিজ, বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল, ইত্তেফাক ভবন, ঢাকা, ১৯৮৮

১৮. সুখরঞ্জন দাসগুপ্ত : *মিডনাইট ম্যাসাকার ইন ঢাকা,* বিকাশ পাবলিশিং হাউস, নয়াদিল্লী, ১৯৭৮

১৯. *একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায় :* মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, ঢাকা ১৯৭৮

২০. চারু মজুমদার : চতুর্থ দলিল।

২১. সাক্ষাৎকার
হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী
রুহুল কুদ্দুস
আবদুর রাজ্জাক
তোফায়েল আহমদ
হাসানুল হক ইনু
মিজানুর রহমান চৌধুরী
ডক্টর এম এন হুদা
শামসুর রহমান
এ. বি. এস সফদার
খায়রুল কবির
মোতাহার হোসেন সিদ্দিকী
এ. এফ জহিরুন্নবী

ডকুমেন্টারি ফিল্ম : বাংলাদেশ স্টোরি
প্রযোজক : পি নাজারেথ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com